ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

Volume-VI, Issue-I, June 2024

Government Brajalal College
Khulna, Bangladesh

ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

Volume-VI, Issue-I, June 2024

Government Brajalal College

Khulna, Bangladesh

ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume-VI, Issue-I June 2024

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

A Bi-lingual (Bangla-English) Research Journal

Half-yearly Publication of Government Brajalal College

Editor

Professor Sharif Atiquzzaman Principal, Government Brajalal College

Review Committee

Professor Khandakar Hamidul Islam PhD	Head, Department of Islamic Histroy & Culture
Professor Khandakar Ahsanul Kabir PhD	Head, Department of Physics
Professor Md. Mizanur Rahman PhD	Head, Department of Social Work
Professor Hosne Ara PhD	Department of Zoology
Professor Shankar Kumar Mallick	Head, Department of Bangla Government Girls' College, Khulna
Roxana Khanam	Associate Professor, Department of English
Dr. Emanul Haque	Associate Professor, Department of Bangla Goenka College of Commerce & Business Administration, Kolkata, India
Amal Kumar Gain	Assistant Professor, Department of History
Rami Chakraborty	Assistant Professor, Department of Bangla Assam University, India
Dr. Md. Sarwar Hossain	Assistant Professor, Department of Mathematics Government Girls' College, Meherpur

Mailing Address

Government Brajalal College, Daulatpur, Khulna-9200, Bangladesh
Phone: 0088-02477702944 email: infoblcollege@gmail.com
Website: www.blcollege.edu.bd

Printed by

Rabi Printing Press
27, Samsur Rahman Road, Khulna-9100, Bangladesh

© **Government Brajalal College, Khulna, Bangladesh**

ISSN: 2664-228X (Print)
ISSN: 2710-3684 (Online)

ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume-VI, Issue-I June 2024

ISSN: 2664-228X (Print)
ISSN: 2710-3684 (Online)

Government Brajalal College
Khulna
Bangladesh

Contents

বাংলা অংশ

- এক বিজ্ঞান গবেষকের কল্পবিজ্ঞান সাধনা
  প্রিয়াংকা মিত্র 7-16
- ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের যাপিত জীবনে ধর্মচর্চা
  খ. ম. রেজাউল করিম ও এটিএম আনিসুর রহমান 17-28
- বঙ্গবন্ধুর ভাষণে নৈতিকতা: ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা
  মোঃ আমিনুর রহমান 29-45
- মানবী চেতনার ধারায় পশ্চিমবঙ্গের আটের দশকের মেয়েদের কবিতা
  রিয়া ঢোল 46-61
- সৌরভ পত্রিকা ও প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যচর্চা
  মিজানুর মণ্ডল 62-81
- বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রথম দশক: একটি ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ
  মোঃ ইব্রাহীম 82-98
- শুধু অভিশাপ নয়, গোপনীয়তাই নাট্যকৌশল
  প্রসঙ্গ কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'
  পারুল রানী বিশ্বাস 99-108

English Section

- Characterizations of Correlation Coefficient
  Anwar H. Joarder & Md Forhad Hossain 111-127
- Human-Nature Connection: Eco-ethical Reading of Louise Gluck's *The Wild Iris*
  Toya Nath Upadhyay & Janak Paudyal 128-141
- Romanticizing Sufism: Tracing Spiritual Echoes of the Divine between Sufism and Romanticism
  Roxana Khanom 142-152
- Crisis of Humanism, Failure of American Dream, and Quest for Global Harmony in Fitzgerald's *The Great Gatsby*
  Raj Kumar Gurung, Ph.D. 153-165
- The Folk Performing Arts Containing Four Art Forms of Assam and Its Present Status
  Dr. Sudarshana Baruah 166-176
- Mythical Realities in Nepali Writings Mahabharata Mythic in Krishna Dharabasi's Radha
  Mani Bhadra Gautam, Ph. D 177-188
- An Exploratory Study on Status, Prospects and Challenges of Tourism Industry in Telangana State, India
  Dr. Sukanta Sarkar 189-202

ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume-VI, Issue-I June 2024

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

A Bi-lingual (Bangla-English) Research Journal
Half-yearly Publication of Government Brajalal College
June 2024

Published by

Government Brajalal College, Khulna, Bangladesh

Disclaimer

The opinions expressed in the articles published in this journal are the opinions of the authors. The members of the review committee, the editor or the publisher of the *BL College Journal* are in no way responsible for the opinions expressed by the authors or the conclusions deduced by them.

ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume-VI, Issue-I June 2024

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

ISSN: 2664-228X (Print)
ISSN: 2710-3684 (Online)

Contents

বাংলা অংশ

- এক বিজ্ঞান গবেষকের কল্পবিজ্ঞান সাধনা
  প্রিয়াংকা মিত্র 7-16
- ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের যাপিত জীবনে ধর্মচর্চা
  খ. ম. রেজাউল করিম ও এটিএম আনিসুর রহমান 17-28
- বঙ্গবন্ধুর ভাষণে নৈতিকতা: ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা
  মোঃ আমিনুর রহমান 29-45
- মানবী চেতনার ধারায় পশ্চিমবঙ্গের আটের দশকের মেয়েদের কবিতা
  রিয়া ঢোল 46-61
- সৌরভ পত্রিকা ও প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যচর্চা
  মিজানুর মণ্ডল 62-81
- বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রথম দশক: একটি ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ
  মোঃ ইব্রাহীম 82-98
- শুধু অভিশাপ নয়, গোপনীয়তাই নাট্যকৌশল
  প্রসঙ্গ কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'
  পারুল রানী বিশ্বাস 99-108

Government
Brajalal College
Khulna
Bangladesh

Volume -VI, Issue-I, June 2024

BL College Journal
https://doi.org/10.62106/blc2024v6i1b1
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -VI, Issue-I, June 2024
Pp. 07-16

এক বিজ্ঞান গবেষকের কল্পবিজ্ঞান সাধনা

প্রিয়াংকা মিত্র

সারসংক্ষেপ

বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্য জগতে ক্ষণকালের অতিথি ড. দিলীপ রায়চৌধুরী। বিজ্ঞানে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং ভাষার মুনশিয়ানা তাঁর কল্পবিজ্ঞান গল্পগুলিকে চিরকালীন করে তুলেছে। বিজ্ঞান ও সাহিত্য যে একে অপরের হাত ধরে অনায়াসেই চলতে পারে সে ছাপ তাঁর প্রতিটি গল্পে সুস্পষ্ট। সমকালের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার সম্বন্ধে তিনি কতটা ওয়াকিবহাল ছিলেন তা তাঁর গল্পগুলি পাঠ করলেই বোঝা যায়। কীভাবে তিনি সেই বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে তাঁর গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন এই প্রবন্ধে তারই সন্ধান করা হয়েছে। এছাড়াও তাঁর সাহিত্যপ্রীতি, কতটা সার্থকভাবে ইতিহাসবোধকে বিজ্ঞানসাধনার সঙ্গী করে তুলেছিলেন তারও ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

প্রিয়াংকা মিত্র
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা, ভারত
e-mail : priyankam527@gmail.com

মূলশব্দ

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, কল্পবিজ্ঞান, বাংলা কল্পবিজ্ঞান, দিলীপ রায়চৌধুরী

ভূমিকা

বাংলাসাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান কাহিনির প্রসঙ্গ উঠলেই অবধারিতভাবে সত্যজিৎ রায়ের প্রোফেসর শঙ্কুর নাম এসে পড়ে। এরপর বড়জোর প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা, তারপর আর আলোচনা বিশেষ এগোয় না। কিন্তু এছাড়াও যে বঙ্গভাণ্ডারে কল্পবিজ্ঞানের বিবিধ রতন রয়েছেন তাঁদের নিয়ে তেমনভাবে আলোচনা হয় না। ১৮১৮ সালে মেরি শেলির হাত ধরে বিশ্বসাহিত্যে কল্পবিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হয়। তার কয়েক দশক পরে ১৮৯৬ সালে জগদীশচন্দ্র বসু লেখেন বাংলার প্রথম কল্পবিজ্ঞান 'নিরুদ্দেশের কাহিনি', পঁচিশ বছর পরে 'অব্যক্ত' গ্রন্থ প্রকাশের সময় তিনি এই গল্পটিকে পরিমার্জনা করে নাম দেন 'পলাতক তুফান'। এরপর প্রেমেন্দ্র মিত্র, অদ্রীশ বর্ধন, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী, লীলা মজুমদার, সত্যজিৎ রায়, গুরনেক সিং, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, সিদ্ধার্থ ঘোষ, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, অনীশ দেব প্রমুখ সাহিত্যিকরা এই ধারাকে সমৃদ্ধ করে তোলেন।

বাংলায় কল্পবিজ্ঞানের ধারাটিকে দৃঢ় করতে এগিয়ে এসেছিলেন ক্ষণকালের অতিথি ডঃ দিলীপ রায়চৌধুরী। আটত্রিশ বছরের জীবনকালে তাঁর লেখক জীবন ছিল মাত্র তিন বছরের। ১৯২৮ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর দিলীপ রায়চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। বহরমপুর থেকে স্কুল শেষে কলেজে রসায়ন নিয়ে স্নাতক হয়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে স্নাতকোত্তর করেন। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত খড়গপুর আই আই টি-তে লেকচারার ছিলেন। এরপর ১৯৫৩ সালে তিনি আমেরিকার আইওয়া স্টেটের এমসে, আইওয়া স্টেট কলেজে (এখন আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়) সর্পগন্ধার শিকড় থেকে অ্যালকালয়েড নিষ্কাশনের প্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করতে যান এবং ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। ১৯৫৭ সালের মাঝামাঝি আমেরিকা থেকে ফিরে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি আই সি আই-তে টেকনিক্যাল অফিসার পদে যোগদান করে পরে কমার্শিয়াল ম্যানেজারের পদে উন্নীত হন। ১৯৫৯ সালে তিনি অরুন্ধতী ঘোষকে বিবাহ করেন। লেখালেখির চর্চাও পাশাপাশি চলতে থাকে। প্রতি বছরই বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতের বাইরে যেতেন। এসবের মধ্যেই তিনি 'তরুণতীর্থ' নামে একটি সমাজসেবী সংগঠন গড়ে তোলেন, আবার ওই একই নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। আবার এই সময়ই অর্থাৎ ১৯৬৩ সালের জানুয়ারি থেকে অদ্রীশ বর্ধন 'আকাশ সেন' ছদ্মনামে, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের উৎসাহে, 'আশ্চর্য!' পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন যেটি ভারতে প্রকাশিত প্রথম কল্পবিজ্ঞান পত্রিকা। দিলীপের বাবা লক্ষ্মীনারায়ণ রায়চৌধুরীর বাল্যবন্ধু ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। দুজনের বাড়িও ছিল দক্ষিণ কলকাতায় বেশ কাছাকাছি, ফলে দুই পরিবারের মধ্যেও হৃদ্যতা ছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্নেহ ও আশীর্বাদধন্য ছিলেন দিলীপ। মূলত প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অদ্রীশ বর্ধনের উৎসাহেই দিলীপ রায়চৌধুরী কল্পবিজ্ঞান কাহিনি লিখতে শুরু করেন। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে তিনি ৮ টি কল্পবিজ্ঞানের গল্প এবং ১টি কল্পবৈজ্ঞানিক উপন্যাস লেখেন। এছাড়াও তাঁর লেখা ৩টি বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা (চলো যাই জাদুঘর, মহাশূন্যে জন গেন, টেলস্টার), ১টি ভ্রমণকাহিনি (দূরের মাটির ধুলো), ১টি রম্যরচনা (নিউ ইয়র্ক-রাত্তিরে যারা কাজ করে) এবং ১টি নাটিকা (হিদারামগলির রূপকথা) 'তরুণতীর্থ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আর ১টি বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা (মঙ্গল গ্রহে জীবনের সন্ধান) ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে 'আশ্চর্য!' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১টি অপ্রকাশিত স্বাধীনতা সংগ্রামবিষয়ক বড়গল্প (চিত্ত ভাবনাহীন) ২০১৭ সালে 'দিলীপ রায়চৌধুরী রচনাসমগ্র'-তে তাঁর অন্যান্য রচনাগুলির সঙ্গে প্রকাশ পায়। এছাড়া 'মহাকাশযাত্রী বাঙালি' নামে একটি গল্প প্রথমে 'আশ্চর্য!' পত্রিকায় প্রকাশ পায় যেটি প্রেমেন্দ্র মিত্র, অদ্রীশ বর্ধন ও দিলীপ রায়চৌধুরী একসঙ্গে লেখেন। গল্পটি ১৯৬৫ সালের ৩রা মার্চ আকাশবাণী কলকাতার সাহিত্যবাসর অনুষ্ঠানে লেখকদের নিজের কণ্ঠে প্রচারিত হয়েছিল। গল্পপাঠটি এমনই জনপ্রিয় হয় যে আরও একটি গল্প 'সবুজ মানুষ' প্রেমেন্দ্র মিত্র, অদ্রীশ বর্ধন, দিলীপ রায়চৌধুরী ও সত্যজিৎ রায় একসঙ্গে লেখেন, যেটি ১৯৬৬ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি রাত ৮টার সময় আকাশবাণী থেকে লেখকদের কণ্ঠে প্রচারিত হয়, পরে 'বেতার জগৎ' থেকে গল্পটি প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে 'আশ্চর্য!' ও 'ফ্যান্টাসটিক' পত্রিকাতেও গল্পটি পুনর্মুদ্রিত হয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ১৯৬৬ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর এনকেফেলাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে দিলীপ রায়চৌধুরীর মৃত্যু হয়।

কল্পবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এডমান্ড ক্রিসপিন তাঁর 'বেস্ট এস এফ স্টোরিজ'-এর ভূমিকায় বলেছেন, সায়েন্স ফিকশন কাহিনিতে কল্পনা করে নেওয়া হয় একটি প্রকৌশলকে, বা একটি প্রকৌশলের প্রভাবকে, বা

প্রাকৃতিক পারম্পর্যের একটি বিশৃঙ্খলাকে, যার অভিজ্ঞতা মানুষ এই রচনাটির পূর্বে লাভ করেনি।[১] কিংসলি অ্যামিস তাঁর 'নিউ ম্যাপস অফ হেল'-এ বলেছেন, সায়েন্স ফিকশন সেই শ্রেণির আখ্যান যেখানে এমন একটি পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয় যার উদ্ভব আমাদের পরিচিত জগতে সম্ভব নয়, কিন্তু প্রকল্পটির উৎস মানবিকই হোক বা অপার্থিব, সেটি গড়ে ওঠে বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের কোনও উদ্ভাবনকে বা ছদ্ম-প্রকৌশলকে ভিত্তি করে।[২] থিওডোর স্টার্জন বলেছেন, সায়েন্স ফিকশন গড়ে ওঠে মানুষকে ঘিরে, যা একটি মানবিক সমস্যা এবং একটি মানবিক সমাধান সম্পন্ন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক মর্মবস্তু ভিন্ন এই কাহিনি কখনোই রচিত হতে পারত না।[৩] আবার স্যাম মসকোউইৎজ 'সিকার্স অফ টুমরো' গ্রন্থে জানিয়েছেন, সায়েন্স ফিকশন ফ্যান্টাসিরই একটি স্বতন্ত্র ধারা যেখানে পাঠকের পক্ষে 'অবিশ্বাসকে ইচ্ছাকৃতভাবে সংহত রাখার' প্রক্রিয়াটি অনেক সহজবোধ্য। কারণ, ভৌত বিজ্ঞান, স্থান, কাল, সমাজবিজ্ঞান এবং দর্শনকে ঘিরে তার কাল্পনিক পূর্বাভাসগুলি লালিত হয় এক বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনার আবহাওয়ায়।[৪] এই সংজ্ঞাগুলি থেকে আমরা যে ধারণা পাই তা হল, কল্পবিজ্ঞান কাহিনিতে বিজ্ঞানের একটা যোগ থাকবে। যে সময় গল্পটি লেখা হচ্ছে সেই দিন পর্যন্ত যা যা বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কার ও প্রমাণিত হয়ে গেছে সেগুলির কোনও বিকৃতি করা যাবেনা। তবে যা এখনও বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করতে পারেননি অথবা বিজ্ঞানের যেসব অজানা দিকগুলি রয়েছে সেই ফাঁকগুলি কল্পবিজ্ঞান লেখক তার কল্পনা দিয়ে পূরণ করতে পারেন। ডঃ রায়চৌধুরী পারদর্শিতার সঙ্গে ঠিক সেই কাজটিই করেছেন। কোনও কাহিনিকে আকর্ষক ও রোমাঞ্চকর করে তোলার জন্য যে বিজ্ঞান বিরোধী কোনও বিষয় অবতারণার প্রয়োজন হয় না তা এই কৃতবিদ্য রসায়নবিদ ভালোই জানতেন। ভাষার উপর সবিশেষ দক্ষতা এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে সম্বল করে ডঃ দিলীপ রায়চৌধুরী যে কল্পবিজ্ঞান কাহিনিগুলি রচনা করে গেছেন এবার সেইগুলির উপর আলোকপাত করা যাক।

রসায়ন থেকে জীববিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে ভূবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান থেকে মহাকাশবিজ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের বিবিধ বিষয় দিলীপের কল্পবিজ্ঞান গল্পে উঠে এসেছে। প্রতিটি গল্পে আছে কথক 'আমি' চরিত্রটি, যার নাম সঞ্জয় চৌধুরী, বেশিরভাগ গল্পে তিনি রসায়নবিদ, রবার টেকনোলজিতে দক্ষ (দিলীপ নিজেও একজন রসায়নবিদ ও রবার টেকনোলজিতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং বিভিন্ন কেমিক্যাল সোসাইটির সদস্য ছিলেন), একটি গল্পে তিনি সওদাগরী অফিসের চাকুরে। আর থাকেন সঞ্জয়ের কলেজ সেন্ট জেমসের অ্যাস্ট্রোনমি ও বায়োলজির অধ্যাপক স্যার সুশোভন রায়। সঞ্জয়ের কলেজের এক সহপাঠী অমরেশ চরিত্রটিও ঘুরে ফিরে আসে, যে সুশোভন স্যারের সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র।

'ধূসর চাঁদ' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে 'তরুণতীর্থ' পত্রিকায়। এই গল্পে লেখক জানাচ্ছেন রাশিয়ানরা কিছুদিন আগেই চাঁদে গেছে, আর চাঁদের অদেখা অংশের ছবি তুলে পাঠিয়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, ১৯৫৯ সালে রাশিয়ার বাইকানুর কসমোড্রোম থেকে পাঠানো নাসার লুনা ২ স্পেসক্র্যাফট চাঁদে পৌঁছলেও সফট ল্যান্ড করতে পারেনি।[৫] তবে ১৯৬৬ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি তাদের পাঠানো লুনা ৯ স্পেসক্র্যাফট চাঁদের বুকে অবতীর্ণ হয় এবং সেখান থেকে ফটোগ্রাফিক তথ্য পৃথিবীতে পাঠায়।[৬] আজকের কল্পবিজ্ঞান যে আগামীর বাস্তব এটি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়া এই গল্পে সুশোভনবাবু ও অমরেশকে হোভারক্র্যাফটে চড়ে চাঁদের পৃষ্ঠে ভ্রমণ করতে দেখা যায়। ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার ও উদ্ভাবক ক্রিস্টোফার সিডনি ককেরেল ১৯৫৫ সালে

এই না নৌকা-না পেন একটি সংকরজাতীয় যান তৈরি করেন[৭], যাকে দিলীপ তাঁর গল্পে ব্যবহার করেন।

'শিলাকান্থ' গল্পটি 'প্রথম প্রয়াস' পত্রিকায় সম্ভবত ১৯৬৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। আবার 'আশ্চর্য!' পত্রিকার ১৯৬৪ সালের অগাস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র এই গল্পের পাণ্ডুলিপি অদ্রীশ বর্ধনের হাতে তুলে দিয়ে বলেন, "হাত ভালো। এঁকে দিয়ে তোমরা লেখাও"।[৮] এই গল্পে সঞ্জয় কফি ও রবার প্যান্টেশানের কর্মী এবং সুশোভনবাবু একজন উচ্চশিক্ষিত মেরিন বায়োলজিস্ট। সঞ্জয়দের কলেজে পড়ানোর পর তিনি সরকারি সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানের দপ্তরে যোগ দেন, এরপর আমেরিকার ম্যাসাচুসেটসের উডসহোল ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন। এখন আন্তর্জাতিক সংস্থার চেষ্টায় সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কিত যে গবেষণা চলছে, সুশোভনবাবু তার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। অমরেশ তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট। সমুদ্র থেকে জেলেদের তোলা জালে একটি শিলাকান্থ মাছ ধরা পড়ে, ছ'কোটি বছর আগে যারা পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। কৌতূহলী হয়ে সুশোভনবাবু একটি দল নিয়ে ব্যাথিস্ফিয়ারে করে সমুদ্রের তলদেশে নামেন। সেখানে তাঁরা শিলাকান্থ ছাড়াও ইকথাইওসর, পেসিওসর প্রভৃতি প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের দেখা পান। সুশোভনবাবুর ব্যাখ্যায়, "সমুদ্রতলে অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত ও নিম্নচাপের একটা এলাকা অনেকদিন ধরে বজায় রয়ে গিয়েছে, যেসব সামুদ্রিক প্রাণী সেই আদিম প্রভাতে তার সন্ধান পেয়েছিল, তারা সেখানে গিয়ে বংশপরম্পরায় টিকে থাকতে পারে"।[৯] লক্ষ করার বিষয়, লেখক গল্পের চাহিদার কথা মাথায় রেখে সমুদ্রতলে ব্যবহার্য উন্নত ক্যামেরা, প্রতিধ্বনি যন্ত্র, অ্যাসকানিয়াগ্রাফ- সমুদ্রের গ্যাভিমিটার, ব্যাথিস্ফিয়ার প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিসের উল্লেখ করেছেন। ব্যাথিস্ফিয়ার হল নৌকা থেকে একটি তারের সাহায্যে ঝুলন্ত গোলাকার ইস্পাতনির্মিত জাহাজ, যেটি সমুদ্রের তলদেশ পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত হয়। এটি প্রথম তৈরি করেন আমেরিকান প্রাণীবিদ উইলিয়াম বিবে এবং আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার ওটিস বার্টন।[১০] ১৯৩০ সালে এটি প্রথম ব্যবহার করা হয় এবং ১৯৬৩ সালে দিলীপবাবু তাঁর কল্পবিজ্ঞান কাহিনিতে এটির ব্যবহার দেখাচ্ছেন। শিলাকান্থ মাছের জীবাশ্ম রেকর্ড থেকে জানা যায় তারা ৩৪০ মিলিয়ন বছর আগে ডাইনোসরের সময় পৃথিবীতে ছিল। ১৯৩৮ সালের আগে এদের জীবাশ্ম দেখে মনে করা হত এরা ৮০ মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। ১৯৩৮ সালে আফ্রিকা ও মাদাগাস্কারের মাঝে কসমস দ্বীপ থেকে একটি জীবন্ত শিলাকান্থ মাছ পাওয়া যায়। এই 'জীবন্ত ফসিল'-এর আবিষ্কারকে শতাব্দীর সেরা প্রাণীবিদ্যার আবিষ্কার বলে মনে করা হয়।[১১] সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ডঃ দিলীপ রায়চৌধুরী এই বিষয়টিকেই তাঁর কল্পবিজ্ঞান গল্পের পট হিসেবে ব্যবহার করেন।

'নেরগাল' গল্পটি ১৯৬৪ সালে 'আশ্চর্য!' পত্রিকার নভেম্বর সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। আবার ১৯৭৩ সালে 'তরুণতীর্থ' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। এই গল্পে সঞ্জয় শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, তার কলেজের অ্যাস্ট্রোনমি ও বায়োলজির অধ্যাপক সুশোভনবাবু মঙ্গলগ্রহে একটি অনুসন্ধানকারী মহাকাশযান পাঠানোর বিজ্ঞানী দলে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন শিকাগোতে। দিলীপবাবু গল্পটি লিখছেন ১৯৬৪ সালে, আর ১৯৬০ সাল থেকে রাশিয়া ও আমেরিকা রকেট পাঠালেও সেগুলি মঙ্গল গ্রহে পৌঁছোতে পারছিল না। অবশেষে ১৯৬৪ সালের ২৮শে নভেম্বর নাসা ম্যারিনার-৪ নামক রকেট মঙ্গলগ্রহের উদ্দেশে পাঠায়, যেটি ১৯৬৫ সালের ১৪ই জুলাই মঙ্গলে পৌঁছায় এবং পৃথিবীতে ২১টি ছবি পাঠায়।[১২] এ থেকে বোঝা যায় সমসাময়িক বিজ্ঞানের হাল হকিকত সম্বন্ধে কতটা ওয়াকিবহাল ছিলেন তিনি। এই গল্পে সুশোভনবাবু এবং অন্য কয়েকজন বিজ্ঞানী

মঙ্গলগ্রহে প্রাণের সম্ভাবনা আছে বলে মনে করেন। মঙ্গলের দুটি উপগ্রহের মধ্যে 'ফোবোস'-কে কৃত্রিম উপগ্রহ বলে প্রমাণ করেন সুশোভনবাবু। ক্যালিফোর্নিয়ার মরুভূমির পরিবেশ অনেকটা মঙ্গলগ্রহের পরিবেশের মতো বলে তাঁরা ওই মরুভূমিতে ব্যাকটেরিয়া সংগ্রহের কিছু কাজ করতে যান, ঠিক যেভাবে তাঁরা মঙ্গলে গিয়ে ওই কাজটি সম্পাদন করবেন। ইতিমধ্যে একদিন রাতে সঞ্জয় আকাশে উড়ন্ত আগুনের পিণ্ড দেখতে পায়, তার পরদিনই তাদের দলের প্রফেসর স্টার্কের জ্বর আসে। তিনি জ্বরের ঘোরে বলতে থাকেন, "আপনার (দলের আর একজন প্রফেসর গ্রীনবার্গ) কি ব্যান্ড লাইফ ডিটেক্টারটার আর কোনও দরকার নেই! হা! হা! আপনি ভেবেছিলেন মঙ্গলগ্রহে ব্যাকটেরিয়া সংগ্রহ করবেন। আপনাকে আর ৭ কোটি কিলোমিটার দৌড়ে যেতে হবে না!"[১৩] তারপর তিনি লিউকিমিয়ায় মারা যান। সুশোভনবাবু এবং দলের অন্য সদস্যরা আবার মরুভূমিতে যান এবং বালির স্যাম্পেল পরীক্ষা করে অদ্ভুত অদেখা এক ভাইরাসের সন্ধান পান। আকাশে পাঁচ-ছয়টি বৈদ্যুতিক আলোর পিণ্ড দেখা যায়, যেগুলি মহাশূন্যে মিলিয়ে যায়। সুশোভনবাবু বলেন পৃথিবীবাসী যেমন মঙ্গলে যান পাঠিয়ে সেখানে অনুসন্ধান করতে চাইছে, মঙ্গলেও যদি শক্তিশালী সভ্য কোনও জাতি থাকে তারাও একইভাবে পৃথিবীর ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে চাইছে। আমেরিকান যে কয়জন বিজ্ঞানী এ ব্যাপারে অনুমান করেছিল তাদের মধ্যে প্রফেসর স্টার্ক ছিলেন অন্যতম। তাই তাঁর শরীরে ভাইরাস সংক্রমণ ঘটিয়ে তাকে মেরে ফেলা হল। সুশোভনবাবু বলেন, "ফোবোস কথার মানে জানো, সঞ্জয়? ফোবোস মানে ভয়। মনে হচ্ছে এতদিনে আমরা যুদ্ধদেবতা মাসের সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছি"।[১৪] গল্পটির নামটি বড়ই আকর্ষণীয়। 'নেরগাল' মেসোপটেমিয়ার একজন দেবতা ছিলেন। মনে করা হয়, মেসোপটেমিয়ার ইতিহাসের প্রথম থেকে নিও-ব্যাবিলনীয় সময় পর্যন্ত, তারপর প্রথম পার্সিয়ান সাম্রাজ্য আসেকিনির আধিপত্যকাল অবধি তাঁর পূজার প্রচলন ছিল। তিনি প্রাথমিকভাবে যুদ্ধ, মৃত্যু ও রোগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁকে 'মৃত্যুর দেবতা' বলা হত। গল্পের মধ্যেই এক জায়গায় লেখক সুশোভনবাবুর মুখ দিয়ে এই ইতিহাস পাঠকদের জানিয়ে বলেছেন চ্যালডিয়ানরা এই গ্রহের নাম দেয় নেরগাল। পরে রোমানদের দেওয়া মার্স নামটাই প্রচলিত হয়। এই গল্পের ঘটনার সঙ্গে অদ্ভুত দক্ষতায় লেখক মিশিয়ে দিয়েছেন তাঁর ইতিহাসবোধকে।

১৯৬৪ সালে দিলীপের আরও একটি গল্প 'প্লুটোর অভিশাপ', 'তরুণতীর্থ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৩০ সালে আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনমার ক্লাইড উইলিয়াম টমবাও নবম গ্রহ হিসেবে প্লুটো আবিষ্কার করেন। লেখক এই ঘটনাকে এই কল্পবিজ্ঞান গল্পের পটের মধ্যে সুন্দরভাবে অন্তর্ভুক্ত করেন। সুশোভনবাবু তাঁর ছাত্রদের নিয়ে রূপশীলায় এনসিসি ক্যাম্পে যান। সেখানে তিনি, অমরেশ ও সঞ্জয় একটি নীলাভ স্ফটিকের ছ-কোনা বিচিত্র চ্যাপ্টা উড়োজাহাজ দেখতে পায় এবং সেই জাহাজে বন্দি হয়। জানা যায়, সেটি প্লুটোনিয়ানদের এবং তারা ক্লাইড টমবাওয়ের উপর রেগে আছে তাদের গ্রহকে ছোট্ট আলোর বিন্দুর মতো দেখানোর জন্য। তারা ক্লাইডের পাপের শাস্তি দিতে একই গ্রহবাসী হিসেবে এই তিনজনকে প্লুটোতে নিয়ে গিয়ে দেখাতে চায় তাদের গ্রহ কত সুন্দর। অধ্যাপকের বইয়ে পড়া কল্পনায় প্লুটো যেমন শীতল, মৃত, নিঃসঙ্গ, নিস্তব্ধ আসলে তা তেমন নয়। সুশোভনবাবুর বুদ্ধিমত্তায় তারা সে যাত্রায় রক্ষা পেলেও তিনি বলেন, 'ওরা আসবে, ওরা আবার আসবে সমরেশ!"[১৫] ২০০৬ সালে আবার প্লুটোকে 'বামন গ্রহ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

'টিথোনাস' গল্পটি ১৯৬৬ সালের শারদীয়া 'আশ্চর্য!' পত্রিকায় প্রকাশ পায়। এই দশকেই জীববিজ্ঞান গবেষণায়

'Genetic Code'-এর ব্যাখ্যা এবং সার্থক DNA Cloning বাস্তবায়িত হয়েছিল। ১৯৬১ সালে ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্রিক ও তাঁর সহকর্মীরা প্রথম কোডনের (জেনেটিক কোড হল নিওক্লিওটাইডের তিন অক্ষরের সমন্বয়ের একটি সেট যাকে কোডন বলা হয়) ধারণা দেন।[১৬] ১৯৬২ সালে ফিজিওলজি বা মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার জেমস ওয়াটসন, ফ্রান্সিস ক্রিক এবং মরিস উইলকিন্সকে ডিএনএর আণবিক গঠন আবিষ্কারের জন্য দেওয়া হয়েছিল, যা সমস্ত জৈবিক ধাঁধার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমাধান করতে সাহায্য করেছিল।[১৭] দিলীপ এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং এই বিষয়গুলি তাঁর কল্পবিজ্ঞানের গল্পে খুব স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। এই গল্পে মানুষের অঙ্গ প্রতিস্থাপনের প্রসঙ্গও এসেছে। ১৯৫৩ সালে প্যারিসে জিন হ্যামবার্গার প্রথম অস্থায়ীভাবে মানব কিডনি প্রতিস্থাপন করেন। তারপর ১৯৫৪ সালে জোসেফ মারে প্রথম দীর্ঘমেয়াদি সফল কিডনি প্রতিস্থাপনের মধ্যে দিয়ে একটি মাইলফলক তৈরি করেন।[১৮] তবে ক্রিস্টিয়ান বার্নাড ও তাঁর সহকারীরা প্রথম হার্ট প্রতিস্থাপন করেন ১৯৬৭ সালের ৩রা ডিসেম্বর।[১৯] বোঝাই যায় ডঃ রায়চৌধুরীর অধীত বিদ্যা রসায়ন হলেও জীববিজ্ঞান বা চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণাগুলিও তাঁকে সমানভাবে উত্তেজিত করেছিল, তাই সেই বিষয়গুলিকে বারবার নিজের কল্পবিজ্ঞান গল্পের পটরূপে বেছে নিতে তাঁর কোনও অসুবিধা হয়নি। এই গল্পে ডঃ সুশোভন রায় ইন্সটিটিউট অফ মলিকুলার বায়োলজিতে কর্মরত। সঞ্জয় বোস একটি বেসরকারি কলেজে কেমিস্ট্রি পড়ায়। সুশোভনবাবু কোপেনহেগেনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পরিচয় হওয়া টিথোনাস দম্পতিকে সঞ্জয়ের বাড়ি ভাড়া নিতে পাঠান। এই দম্পতি শরীরের টিস্যু নিয়ে গবেষণারত। পরে জানা যায়, তারা মারক্যাপটোফুলমিন নামক একটি ওষুধ আবিষ্কার করেছেন যা রক্তের কোলাজেনকে জরাগ্রস্ত হয়ে পড়তে বাধা দেয়, ফলে বার্ধক্য এসে মানুষকে গ্রাস করতে পারবে না। কিন্তু হার্ট, লাংস, কিডনি প্রভৃতি অপরিহার্য অঙ্গের ক্ষয়ক্ষতি রোধ হবে কীভাবে, সঞ্জয়ের এই প্রশ্নের উত্তরে মিসেস টিথোনাস অঙ্গ প্রতিস্থাপনের কথা বলেন। সেখানে আরও দুজন ভারতীয়কে দেখা যায় যাদের চেহারা বিবর্ণ, চোখমুখের ভাব জীবিত মানুষের মতো নয়। এরপর সঞ্জয়কে অজ্ঞান করে তার থেকে রক্ত নিয়ে একটি মৃত মেয়ের দেহে রক্ত দেওয়ার অভিসন্ধি করে তারা। সঞ্জয়ের জ্ঞান ফিরলে সে দেখে মৃত মেয়েটির হৃৎপিণ্ড নৈপুণ্যের সঙ্গে বের করে মিসেস টিথোনাস সেখানে একটি নকল প্লাস্টিকের পাম্পের মতো জিনিস লাগিয়ে দেন। এরপর সুশোভনবাবু এসে সঞ্জয়কে রক্ষা করেন। তাঁর ও পুলিশের ফোনে কথোপকথন থেকে জানা যায় সঞ্জয়ের দেখা দুই ভারতীয় আসলে বেশ কিছুদিন আগে মারা গেছে এবং টিথোনাস দম্পতি পালিয়ে যায়। ১৯৬৬ সালে লেখক নকল হার্ট প্রতিস্থাপনের কথা তাঁর কল্পবিজ্ঞান গল্পে লিখেছিলেন, আর ১৯৮২ সালের ২রা ডিসেম্বর কার্ডিওথোরাসিক সার্জন উইলিয়াম ডিভরিস বিশ্বের প্রথম নকল স্থায়ী হৃৎপিণ্ড, যার নাম জার্ভিক-৭, দিয়ে ড. বার্নি ক্লার্কের বিধ্বস্ত হৃৎপিণ্ডটি প্রতিস্থাপন করেন।[২০] শুধু সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক গবেষণাই নয়, তার সঙ্গে লেখক পরিচয় দিয়েছেন নিজের সাহিত্যপ্রীতিরও। ভিক্টোরিয়ান কবি টেনিসনের 'টিথোনাস' নামক কবিতাটির প্রথম চারটি পংক্তি তিনি গল্পের মধ্যে উদ্ধৃত করে কবিতাটির মধ্যে গ্রীক পুরাণের যে গল্প আছে তা জানিয়েছেন। "টেনিসনের কবিতায় টিথোনাস স্বর্গের দেবী ইওসকে বিয়ে করে অমরত্ব লাভ করেছিল বটে, কিন্তু অজর যৌবন চাইতে ভুলে গিয়েছিল। জরাগ্রস্ত মৃত্যুহীন জীবনের ভার তার কাছে দুঃসহ হয়ে পড়েছে। বার বার সে কবরের শীতলতা ও শান্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করেছে"।[২১] গল্পের গবেষক দম্পতি যেহেতু জরাহীন অমরত্ব চেয়েছিল, তাই এখানে ওই দম্পতির নাম টিথোনাস দিয়ে লেখক যেন গ্রীক পুরাণের 'টিথোনাস' নামক চরিত্রটির জীবনের সেরা

ভুলটিকে সংশোধন করতে চেয়েছেন কল্পবিজ্ঞানের মোড়কে।

'তরুণতীর্থ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'শুক-সমুদ্র' গল্পে বৈজ্ঞানিক সুশোভন রায় টিম্বালুর রকেট ঘাঁটি থেকে কলকাতায় ফিরেছেন। খবরের কাগজে এই খবর পড়ে সঞ্জয় আর অমরেশ বকুল বাগানের কাছে তাঁর বাড়িতে দেখা করতে যায়। লেখক এখানেও তাঁর বৈজ্ঞানিক ইতিহাসচেতনার পরিচয় দেন-দুশো বছর আগে রুশ বিজ্ঞানী লমনোসৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্রে শুক্র গ্রহকে পর্যবেক্ষণ করে বলেছিলেন সেখানে বায়ুমণ্ডল নিশ্চয়ই আছে[২২]- এই তথ্যটি সুশোভনবাবুকে দিয়ে বলিয়ে জানান, আমেরিকানরা তাদের ভেনাস প্যান নিয়ে অনেকদূর অগ্রসর হলেও তাদের দলে কোনও অ্যাস্ট্রোনমার না থাকায় টিম্বালুরে তাঁকে আহ্বান করেছিল। এইখানে আমেরিকানদের ভারতীয়দের বৈজ্ঞানিক হিসেবে যথার্থ সম্মান না দেওয়ার কথাও কিঞ্চিৎ বিরক্তির স্বরে বলেছেন, "কিন্তু এত সহজে কি ওরা একজন ভারতীয়কে মহাকাশযানে সহযাত্রী করবে? ওদের রেকর্ডে আমি হয়ে রইলাম 'রয় সুশো। বাড়ি শিকাগো, ইলিনয়"।[২৩] শুক্র গ্রহে গিয়ে তারা সমুদ্র দেখতে পায়। সাবমেরিন পোশাক পরে নেমে জলের তলায় একটা ডুবোজাহাজ দেখতে পায়, যার গায়ে অসংখ্য বর্শার মতো ফলা। অন্য এক বিজ্ঞানী গোয়েবল সেদিকে পারমাণবিক গ্রেনেড ছোড়েন এবং মহাকাশযান চালিয়ে সবাইকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনেন। বর্তমানে ভারতের বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের সাফল্য ডঃ দিলীপ রায়চৌধুরী দেখে যেতে পারেননি, যা নিয়ে তিনি তাঁর গল্পে ঈষৎ ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, আজ যখন সারা বিশ্ব ভারতকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকে উন্নতির জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছে- সেটা স্বচক্ষে দেখলে তিনি যে আনন্দে আপ্লুত হতেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

'ক্যুগেলব্লিৎস' গল্পটি ১৯৬৬ সালে 'আশ্চর্য!' পত্রিকার ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ব্যাকহোল তত্ত্বের অন্যতম পথিকৃৎ জন হুইলার তাঁর ১৯৫৫ সালের গবেষণাপত্র Geons-এ 'কুগেলব্লিৎস' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন, যার প্রকৃত অর্থ হল 'Ball Lighting'[২৪]। গল্পটি লেখার এগারো বছর আগের একটি গবেষণাপত্রের একটি নতুন শব্দও তাঁর সজাগ দৃষ্টি এড়ায়নি। নতুন আবিষ্কৃত বস্তুটিকে নিয়েই রচিত হল তাঁর এই কল্পবিজ্ঞান গল্পের পট। দিলীপবাবুর গল্পটি প্রকাশের চোদ্দ বছর পর ১৯৮০ সালে সত্যজিৎ রায় তাঁর প্রোফেসর শঙ্কু সিরিজের 'নকুড়বাবু ও এল ডোরাডো' গল্পে এই 'Ball Lighting'-কে ব্যবহার করবেন নকুড়বাবুর অদ্ভুত ক্ষমতার উদ্ভবের কারণ হিসেবে। যদিও তার কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তিনি দেননি। দিলীপ তাঁর গল্পে 'ক্যুগেলব্লিৎস' কী এবং কীভাবে তা তৈরি হয়- সেটা খুব সহজ ভাষায় তাঁর পাঠকদের বুঝিয়ে দিয়েছেন গল্পের খাতিরেই। নাহলে পাজমা (যা ক্যুগেলব্লিৎসের উৎপত্তির কারণ) কেন ঊর্ধ্বাকাশে ছাড়া পৃথিবীর চৌহদ্দিতে দেখা যায় না, তা পাঠক বুঝবে না। আর তা না বুঝলে সুশোভনবাবু কীভাবে উড়োজাহাজে করে আকাশে উড়ে এই ক্যুগেলবিৎসের মোকাবিলা করেন তাও তাদের বোধগম্য হবেনা। এই গল্পে সঞ্জয় সওদাগরী অফিসে চাকরির সূত্রে বোম্বে যাচ্ছিল। ট্রেনে তার কলেজের প্রফেসর সুশোভনবাবুর সঙ্গে দেখা হয় এবং ঘটনা পরম্পরায় সেও তার মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে এই অ্যাডভেঞ্চারে জড়িয়ে পড়ে।

দিলীপের অকালমৃত্যুর সাত বছর পর তাঁর শেষ গল্প 'সৌর-ঝঞ্ঝা' প্রকাশিত হয় শারদীয়া 'তরুণতীর্থ' পত্রিকায় ১৯৭৩ সালে। এই গল্পে অমরেশ একটি হিলস্টেশনে সরকারি অবজারভেটরিতে কাজ করে, তার আমন্ত্রণে সঞ্জয় সেখানে বেড়াতে যায়। লেখক সেখানে পাঠকদের অবজারভেটরির রেডিও-টেলিস্কোপের সামনে নিয়ে গিয়ে কখনও বেতার তরঙ্গের ভাষা শেখাচ্ছেন, ক্রাব-নেবুলার সিগন্যাল চেনাচ্ছেন বা জুপিটার গ্রহের গঠন ও

বায়ুমণ্ডলের বর্ণনা দিচ্ছেন, আবার কখনও রেডিও অ্যাস্ট্রোনমির জার্নাল রিপোর্টের সারাৎসার বোঝাচ্ছেন। অথচ কোথাও সেসব বোধগম্যতার সীমানা ছাড়িয়ে পাঠককে বিরক্ত করছে না, এমনই অসাধারণ তাঁর পরিমিতিবোধ। গল্পে তিনি যে জুপিটারের রেডিও টেলিস্কোপিক গবেষণাকে নিয়ে অসামান্য পটটি তৈরি করেছেন, সেটি ১৯৫৫ সালের ৬ই এপ্রিল আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনমিকাল সোসাইটির একটি মিটিংয়ে, ওয়াশিংটন ডিসির কানাগি ইন্সটিটিউশনের বার্নড বার্ক এবং কেনিথ ফ্র্যাঙ্কলিন জুপিটার থেকে রেডিও তরঙ্গ নির্গমণ-সংক্রান্ত তাঁদের আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন।[২৫]

১৯৬৫ সালে দিলীপ লেখেন তাঁর কল্পবিজ্ঞান বিষয়ক উপন্যাস 'অগ্নির দেবতা হেফেস্টাস'। ওই বছরই 'আশ্চর্য!' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। তার পরের বছর ১৯৬৬ সালে অদ্রীশ বর্ধনের উদ্যোগে অ্যালফা-বিটা প্রকাশনী থেকে 'রকেট সিরিজ'-এর একটি বই হিসেবে এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। ভারতের মাটিতে পারমাণবিক গবেষণার পটভূমিকায় প্রাপ্তমনস্কদের জন্য লেখা কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসটি একটি চমৎকার স্পাই থ্রিলারও বটে। প্রসঙ্গত, ভারতের তথা এশিয়ার প্রথম গবেষণা রিঅ্যাক্টর 'অপ্সরা' ১৯৫৬ সালের অগাস্ট মাসে ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের ট্রম্বে ক্যাম্পাসে চালু হয়।[২৬] উপন্যাসটি সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধে এই চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। 'সকাল'-এ উপন্যাসটির পটভূমি (World Building) তৈরি করা হয়েছে। সঞ্জয় অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের একটি বিশেষ প্রোজেক্টের কাজে প্রতাপগড়ে এসেছে। এখানে সুশোভনবাবু ও অমরেশ ছাড়াও সুশোভনবাবুর মা, প্রোজেক্টের প্রধান নীরেন দাশগুপ্ত, তার স্ত্রী শম্পা আছেন, তাদের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় হচ্ছে। 'নেরগাল' গল্পে সঞ্জয়ের সঙ্গে প্রফেসর সুশোভনের যে আমেরিকার ইউনিভার্সিটিতে দেখা হয়েছিল সে প্রসঙ্গও আছে এই অধ্যায়ে। 'দুপুর'-এ অ্যাটমিক গবেষণাকেন্দ্রের কিছু ঘটনা গল্পকে ক্লাইম্যাক্সের দিকে নিয়ে যায়। সুশোভনবাবু সঞ্জয়কে জানান এই গবেষণাকেন্দ্র থেকে কেউ তথ্য মহাকাশের দিকে পাঠাচ্ছে, নির্দিষ্ট গন্তব্য যদিও জানা যাচ্ছেনা। 'বিকেল'-এ গল্প চূড়ান্ত ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছায়। গবেষণা সফল হয় না। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে দুটি মৃতদেহ থেকে রক্ত-মাংস-স্নায়ু-মজ্জার জায়গায় কতগুলো জড়ানো তার, ছোট ছোট ট্রানজিস্টার ও ঘড়ির হুইলের মতো চাকা বেরিয়ে আসে। এরপর অপহৃত অমরেশকে ফেরাতে সঞ্জয় কায়রো যায়। সেখানে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে আরেকটি তার-ট্রানজিস্টার-চাকা নির্মিত অমরেশের হাত থেকে আসল অমরেশকে উদ্ধার করা হয়। 'সন্ধে' অর্থাৎ শেষ অধ্যায়ে নীরেনবাবুর ডায়রি থেকে সমস্ত রহস্যের উদ্‌ঘাটন হয়। জানা যায়, কিছু প্লুটোনিয়ান বিজ্ঞানী চায় না পৃথিবীবাসী পারমাণবিক শক্তিকে আয়ত্ত করুক। তারা নীরেনের মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করে কিছু যন্ত্র লাগিয়ে তাকে নিজেদের বশবর্তী করেছিল। আর অন্য কয়েকজন বিজ্ঞানীর মতো অবিকল একরকম দেখতে কিছু রোবটকে এখানে রেখেছিল যাতে এই গবেষণা কিছুতেই সফল না হয়। গ্রীক পুরাণের ভলোকিয়ান দেবতা হেফেস্টাস অগ্নির দেবতা হলেও যেমন দেবরাজ জিউসের রোষে তাঁকে স্বর্গ থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয় এবং তিনি পঙ্গু হয়ে যান, তেমনই প্লুটোনিয়ানদের ষড়যন্ত্রে বৈজ্ঞানিক নীরেনের মস্তিষ্ক পঙ্গু হয়ে যায়, প্লুটোনিয়ানদের কথামতো কাজ করতে বাধ্য হন। শেষে নিজের অনিচ্ছাকৃত কর্মের গ্লানির ভার বহন করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন। লেখকের ঝরঝরে ভাষা, টান টান উত্তেজনা তৈরির ক্ষমতা এবং বর্ণনার দক্ষতায় পাঠক শুধু উপন্যাসটি পড়েন না, যেন চোখের সামনে সম্পূর্ণ ঘটনাবলী চাক্ষুষ করেন।

দিলীপের কল্পবিজ্ঞান কাহিনিগুলিতে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারের কথা বারে বারেই এসেছে। কিন্তু বিজ্ঞানের পাশাপাশি তাঁর ভাষাসাহিত্যেও অসাধারণ মুনশিয়ানার কারণে সেসব পাঠকের অস্বস্তির কারণ না হয়ে বরং তাদের কৌতূহলকেই আরও উস্কে দিয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অদ্রীশ বর্ধন বলেছেন, "নিজে পণ্ডিত বলেই গল্পের তত্ত্বে ফাঁকি নেই, অথচ তথ্যভারাক্রান্ত নয়"।[২৭] বিজ্ঞানের সঙ্গে সঠিক পরিমাণে কল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি সার্থক কল্পবিজ্ঞান কাহিনি রচনা করেছেন। তাঁর কোনও গল্পেই কোনও অদ্ভুত যন্ত্রপাতির উল্লেখ নেই, এমন কোনও পৃথিবীর ছবিও তিনি আঁকেননি যেখানে উড়ন্ত গাড়ি চলাচল করে, ঘরে ঘরে রোবট কাজ করে, এমনকি সরাসরি কোনও এলিয়েন বা ভিনগ্রহীদেরও দেখাননি যাদের সবুজ গায়ের রঙ, বড় বড় চোখ, মাথায় শুঁড় বা ওইজাতীয় কোনও বিকটাকৃতি চেহারা। আমাদের চেনা জগতেই ঘুরেফিরে বেড়ানোর মাঝে কখনও আকাশে দেখা দিয়েছে উড়ন্ত কয়েকটি আলোর বিন্দু, জল থেকে উঠে এসেছে প্রাগৈতিহাসিক মাছ, সহসা দেখা গেছে গাছের আড়ালে একটি নীলাভ ছ-কোনা উড়ন্ত মহাকাশযান, পাহাড়ি অবজারভেটরির বেতারে ভেসে এসেছে বহু দূর গ্রহের কিছু তরঙ্গ-তাই তাঁর গল্পগুলি সহজেই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে, জানার মাঝে অজানার সন্ধানে মন ধাবিত হয়। বিজ্ঞানের পাশাপাশি তাঁর সাহিত্যপ্রীতির পরিচয়ও রয়েছে তাঁর বিভিন্ন গল্পে, গল্পের নামকরণে। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা যশোধরা রায়চৌধুরীর বয়ানে "আলোকপ্রাপ্ত দিলীপের ভেতর কাজ করছে অনেকগুলো সত্তা, কবিতার প্রতি তাঁর ভালবাসা, জীবনানন্দের পাশাপাশি টি এস এলিয়ট, অন্যদিকে বার্নালের বিজ্ঞান ইতিহাসের পাশাপাশি আমেরিকার লোকসংগীত, আবার অ্যাস্ট্রো ফিজিক্সের শেষতম আইডিয়া বা জীববিজ্ঞানের আবিষ্কার নিজের জৈবরসায়নের পাশাপাশি রীতিমত অনুশীলন, চর্চা চলছে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির"।[২৮] এ থেকে তাঁর জ্ঞানের পরিধির একটা ধারণা পাওয়া যায়। হয়তো এই কারণেই তিনি কল্পবিজ্ঞানের প্রচলিত লক্ষণগুলির বাইরে বেরিয়ে বাস্তব বিজ্ঞানের খুব কাছাকাছি তাঁর কল্পবিজ্ঞানের কাহিনিগুলিকে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। তাঁর জীবন যদি এত স্বল্প না হত, বাংলা সাহিত্য শুধু পরিমাণে নয়, গুণমানেও আরও উৎকৃষ্ট কল্পবিজ্ঞান কাহিনির সম্ভার লাভ করতো, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

তথ্যপঞ্জি :

১. Crispin, Edmund, Best S.F Stories, Faber & Faber, ১৯৭২
২. Amis, Kingsley, New Maps of Hell: A Survey of Science Fiction, Penguin Books UK, ১৯৬০
৩. Blish, James, Some Propositions, The Issue at Hand, Hachette UK, ১৯৭৩, p.5
৪. Moskowitz, Sam, Seekers of Tomorrow, World Publishing Company, ১৯৬৫
৫. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1959-014A
৬. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1966-006A
৭. https://www.britannica.com/technology/Hovercraft
৮. https://www.kalpabiswa.in/article/y5i3_ba4/
৯. রায়চৌধুরী, দিলীপ, *শিলাকান্থ*, দিলীপ রায়চৌধুরী রচনাসমগ্র, হযবরল, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৩৪
১০. https://www.britannica.com/technology/bathysphere

১১. https://australian.museum/learn/animals/fishes/coelacanth-latimeria-chalumnae-smith-1939/

১২. https://www.space.com/13558-hisrtoric-mars-missions.html

১৩. রায়চৌধুরী, দিলীপ, *নেরগাল*, দিলীপ রায়চৌধুরী রচনাসমগ্র, হযবরল, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৫১

১৪. রায়চৌধুরী, দিলীপ, *নেরগাল*, দিলীপ রায়চৌধুরী রচনাসমগ্র, হযবরল, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৫৪

১৫. রায়চৌধুরী, দিলীপ, *প্লুটোর অভিশাপ*, দিলীপ রায়চৌধুরী রচনাসমগ্র, হযবরল, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৭২

১৬. https://www.nature.com/scitable/definition/genetic-code-13

১৭. https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1962/speedread/

১৮. [The history of kidney transplantation] - PubMed (nih.gov)

১৯. The first human heart transplant and further advances in cardiac transplantation at Groote Schuur Hospital and the University of Cape Town - PMC (nih.gov)

২০. https://healthcare.utah.edu/healthfeed/2012/12/first-artificial-heart-30-years-later

২১. রায়চৌধুরী, দিলীপ, *টিথোনাস*, দিলীপ রায়চৌধুরী রচনাসমগ্র, হযবরল, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৭৬

২২. https://doi.org/10.1017/S1743921305001390

২৩. রায়চৌধুরী, দিলীপ, *শুক-সমুদ্র*, দিলীপ রায়চৌধুরী রচনাসমগ্র, হযবরল, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৮৫

২৪. https://www.space.com/24306-interstellar-flight-black-hole-power.html

২৫. https://radiojove.gsfc.nasa.gov/library/sci_briefs/discovery.htm

২৬. Apsara – U Reactor Becomes Operational at Bhabha Atomic Research Centre, Trombay (pib.gov.in)

২৭. https://www.kalpabiswa.in/article/y5i3_ba4/

২৮. রায়চৌধুরী, যশোধরা, *কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের ক্ষণিকের অতিথি*, দিলীপ রায়চৌধুরী রচনাসমগ্র, হযবরল, কলকাতা, ২০১৭

BL College Journal
https://doi.org/10.62106/blc2024v6i1b2
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -VI, Issue-I, June 2024
Pp. 17-28

ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের যাপিত জীবনে ধর্মচর্চা

খ. ম. রেজাউল করিম

এটিএম আনিসুর রহমান

খ. ম. রেজাউল করিম
সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
সরকারি মাইকেল মধুসূদন কলেজ
যশোর, বাংলাদেশ
e-mail : rezakarim.km@gmail.com

এটিএম আনিসুর রহমান
অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা
বাংলাদেশ
e-mail : abutahermdblc@gmail.com

সারসংক্ষেপ

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসকারী ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের সমন্বিত ধর্ম কর্তাভজা। এ সম্প্রদায়ের সদস্যরা একই সঙ্গে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি সমন্বিতভাবে লালন করে থাকে। তাদের মধ্যে কোনো জাতি-বর্ণ-গোষ্ঠীভেদ দেখা যায় না। একাগ্রতা ও ভক্তি সহকারে ঈশ্বরজ্ঞানে গুরু সেবাই এ সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্য। গুরুধর্মী এ মতবাদের অনুসারীরা যাপিত জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে নানা নিয়ম-কানুন মেলে চলে, যার বেশিরভাগই স্বাস্থ্য সম্পর্কিত। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উৎকর্ষের যুগেও এ সম্প্রদায়ের সদস্যরা ধর্মীয় এবং সনাতন ধ্যানধারণার প্রতি তাদের বিশ্বাস অটুট রেখেছে। তাদের শাস্ত্রমতে, ব্যক্তির কর্মফলই রোগব্যাধির কারণ। ধর্মীয় অনুশাসন থেকে বিচ্যুতি ঘটলেই ব্যক্তি নানা রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। ধর্মীয় গুরুগণ তাদের লোকায়ত চিকিৎসার চর্চা করে থাকেন। তারা সাধারণত নিরামিষভোজী। তারা বারো মাসে বারো ধরনের আচার-অনুষ্ঠানাদি পালন করে থাকে। ভগবানিয়া সম্প্রদায় মূলত গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক হলেও বর্তমানে তারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নানা পেশা ও কর্মের সঙ্গে জড়িত। তারপরেও তাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধি নিষেধ কঠোরভাবে মেনে চলার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। বক্ষ্যমান প্রবন্ধটি সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার চরগ্রামের নির্বাচিত ৬০ জন উত্তরদাতার কাছে থেকে মুখ্য তথ্য ও বিভিন্ন গৌণ উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত। প্রবন্ধে ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের যাপিত জীবনে ধর্মচর্চার স্বরূপ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

মূলশব্দ

ভগবানিয়া, কর্তাভজা, ধর্ম, হিন্দু, মুসলমান

১. ভূমিকা

বাঙালি সমাজে যুগে যুগে কিছু মানুষ বিদ্যমান ধর্মীয় বৃত্তের বাইরে ভিন্ন ধারার জীবন ও দর্শন নির্মাণ করে চলেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব মানুষের তেমন কোনো ঘরানা ও গ্রন্থ থাকে না। তারা জীবন ও জগতের সব বিষয়ে লাগাতার প্রশ্ন করে একটি নিরপেক্ষ উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে প্রশ্ন থাকে তার গৎবাঁধা উত্তর থেকে তার যে মোহভঙ্গ হয় সেখান থেকে জন্ম নেয় লোকধর্ম। পৃথিবীতে প্রধান প্রধান ধর্মের বাইরে বেশ কিছু সমন্বিত লোকধর্মের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। তাদের মধ্যে ব্রাজিলের সান্টো ডাইম[১], ইরানের মানিকিয়াজম[২] এবং ভারতের শিখ ধর্ম[৩] অন্যতম। তেমনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে রয়েছে এক সমন্বিত মতবাদ বা ধর্ম, যার নাম কর্তাভজা। কর্তাভজা হচ্ছে আঠারো শতকে বৈষ্ণববাদ ও সুফিবাদ থেকে উদ্ভূত একটি সমন্বিত ধর্মীয় মতবাদ। এ মতবাদের অনুসারীদেরকে বলা হয় ভগবানিয়া। স্থানীয়ভাবে সম্প্রদায়টি ভগমেনে ও ভগবেনে নামে পরিচিত।[৪] এ ধর্মীয় মতবাদ অনুযায়ী মানুষই তার ঈশ্বর। মানুষের সুখের চেষ্টাতেই তার ঈশ্বর সাধনা সফল হয়। এভাবে কর্তাভজা মহৎ মানবধর্ম হিসেবে লোকসমাজে পরিচিতি পায়। ধর্মীয় নীতির পাশাপাশি এ ধর্মের অনুসারীদেরকে আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে নানা ধরনের নিয়ম-কানুন মেলে চলতে দেখা যায়, যা অনেকটাই স্বাস্থ্য পরিচর্যার সঙ্গে সম্পর্কিত। জীবন যাপনে এই জনগোষ্ঠির বড় বেশিষ্ট্য হলো আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা। এ সম্প্রদায়ের সদস্যরা নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ধর্মের নিয়মনীতি যথারীতি পালন করে যাচ্ছে। একই সঙ্গে তারা হিন্দু ও মুসলিম ধর্মীয় সংস্কৃতিকে লালন করে চলেছে। জাতি-বর্ণ-গোষ্ঠী ভেদাভেদ তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। এক কথায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের সন্ধান পাওয়া যায় এ সম্প্রদায়ের মধ্যে। এ প্রসঙ্গে কবি নবীন চন্দ্র সেন বলেন– "ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের কোনো জাতিভেদ নাই। সকলেই এক রন্ধনশালার পাক গ্রহণ করে। স্পর্শ দোষ এদের কাছে মুখ্য নয়। মানুষ হয়ে বর্বরতার ভূমিকায় থাকা যাবে না এটিই এদের কাছে মুখ্য বিবেচ্য বিষয়।"[৫]

২. উদ্দেশ্য

ক) ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের জীবনপ্রণালী সম্পর্কে ধারণা; এবং
খ) তাদের যাপিত জীবনে ধর্মচর্চার প্রভাব অনুসন্ধান

৩. ব্যবহৃত পদ্ধতি

বক্ষ্যমান গবেষণার জন্য ২০২৪ সালের মে মাসে অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন ও কেসস্টাডি পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে মাঠ পর্যায় থেকে মুখ্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন ওয়েবসাইট, পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, জার্নাল, প্রতিবেদন ও গ্রন্থ থেকে গৌণ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার জন্য সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার মাগুরা ইউনিয়নের চরগ্রামকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। গ্রামটিতে হিন্দু. মুসলিম ও ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ বসবাস। গ্রামের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৩০০০জন। এর মধ্যে ২৫০০জন মুসলিম, ২৫০জন হিন্দু ও ৩৫-৪০টি পরিবারে আনুমানিক ২৫০জন ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের বসবাস।[৬] তাদের মধ্য থেকে দৈবচয়িত নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচিত ৬০জন (৪৮জন

পুরুষ ও ১২জন নারী) উত্তরদাতার নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে নারী উত্তরদাতা কম হওয়ার কারণ হলো এখনো এ সম্প্রদায়ের খুব কম সংখ্যক নারীই ধর্মীয় বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা রাখেন। এই গ্রামের কর্তাভজা মতবাদের প্রথম অনুসারী ছিলেন আশা মাহমুদ। কথিত আছে, তিনি এক সময় গুরুতর রোগে আক্রান্ত হলে কালিপ্রসন্ন কপত নামের এক হিন্দু ভদ্রলোকের পরামর্শে যশোরের জগনান্দকাটি গ্রামের শিবরাম মোহন্তের শরণাপন্ন হন। সেখানে বিশেষ এক প্রকার ঝালের তরকারি খেয়ে তিনি সুস্থ হয়ে ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের ভক্ত হয়ে গ্রামে ফিরে আসেন। মূলত তার সংস্পর্শেই এ গ্রামের মানুষেরা কর্তভজা মতবাদে দীক্ষিত হন। গ্রামে ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাদ্রাসা, ৫টি মসজিদ[৭], ১টি সর্বজনীন দুর্গা মন্দির ও ১টি অস্থায়ী কালি মন্দির আছে।

৪. সমস্যার বিবৃতি

জানা যায় ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। ফলে রক্ষণশীল হিন্দু ধর্মের বর্ণবাদী অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেতে অন্ত্যজ গোষ্ঠীর (নিম্নবর্ণের হিন্দু) সদস্যরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। এ অবস্থায় রক্ষণশীল ও প্রভাবশালী হিন্দু সমাজ তা মেনে নেয়নি।[৮] এ অবস্থা থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে সুফি চেতনায় প্রভাবিত হয়ে শ্রী চৈতন্য বৈষ্ণব আন্দোলনের সূত্রপাত করলেও ব্রাহ্মণ্যবাদ থেকে বেরিয়ে আসতে ব্যর্থ হওয়ায় সেটি আর আলোর মুখ দেখেনি। জাতিবর্ণ ব্যবস্থার স্বপক্ষে ব্রাহ্মণ সমাজের জোরালো অবস্থান এজন্য দায়ী বলে অনেকে মনে করেন। এহেন পরিস্থিতিতে কর্তাভজার মতো বেশ কিছু সমন্বয়বাদী লোকধর্ম আত্মপ্রকাশ করে। এক কালে অবিভক্ত বাংলার বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের মধ্যে এই মতাদর্শের প্রবল জনপ্রিয়তা ছিল।[৯]

মৌলিক অর্থে সমন্বিত ধর্মবিশ্বাস হলো যখন বিভিন্ন ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক বিশ্বদর্শনের ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সঙ্গে ঐতিহ্য একত্রিত হয়। আঠারো শতকে ভারতীয় উপমহাদেশে যতগুলো উপধর্ম সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রায় সবই সমন্বয়বাদী সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। পার্থক্য কেবল বহিরাঙ্গে। মানসিকতায় তারা প্রায় এক।[১০] জানা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কল্যাণী ঘোষপাড়ায় কর্তাভজা ধর্মের আবির্ভাব। এই ধর্মের প্রবর্তক আউল চাঁদ ফকির (১৬৮৬-১৭৬৯)। ভক্তরা তাকে গোরাচাঁদ হিসেবে জানেন, যিনি শ্রী চৈতন্যের অবতার। তাদের বিশ্বাস শৈশবে শ্রীক্ষেত্রপুরীতে গোপীনাথের মন্দির থেকে গোরাচাঁদ হারিয়ে যায়। শোনা যায় ১৬৯৪ সালে নদীয়া জেলার শান্তিপুরের কাছে উলা বীরনগর গ্রামের জনৈক মহাদেব বারুই পানের বরজে এক শিশুপুত্রকে কুড়িয়ে পান। মহাদেব বারুই ভগবানের আশীর্বাদ ভেবে তাকে লালন-পালন শুরু করেন। দিনটি পূর্ণিমা থাকায় শিশুটির নাম রাখা হয় পূর্ণচন্দ্র। প্রথমে তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন, পরে বৈষ্ণব হন। তখন তার নাম হয় আউল চাঁদ। এরপর তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। ঘুরতে ঘুরতে আসেন কল্যাণীর ঘোষপাড়ায়। সেখানকার বাসিন্দা রামসারণ পালের দ্বিতীয় স্ত্রী সরস্বতী তখন মরণাপন্ন। আউল চাঁদ হিমসাগর (পুকুর) থেকে কাদামাটি এনে ডালিম গাছতলায় শুয়ে রাখা সরস্বতীর সারা গায়ে লেপে দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুস্থ হয়ে ওঠেন সরস্বতী। ফলে রামসারন ও তার স্ত্রী আউল চাঁদের ভক্ত হয়ে ওঠেন। রামসারণের মৃত্যুর পর স্বরসতী সতীমা নামে পরিচিতি লাভ করেন। আসলে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুদের কাছে যা গুরু পুজা আউলচাঁদ পন্থীদের কাছে তা কর্তাভজা। কোনো প্রকার মূর্তি পুজা নয়, শুধু গুরু পূজা হচ্ছে এ সম্প্রদায়ের সাধনপথ।

জানা যায়, আউল চাঁদের নেতৃত্বে কামার, কুমার, তাঁতী, জেলে, কৃষক, মুচি, হিন্দু, মুসলমান, মগ, ফিরিঙ্গী, ওলন্দাজ, ব্রাহ্মণসহ সর্বস্তরের মানুষ কর্তাভজা মতবাদে দীক্ষিত হয়।[১১] জানা যায় ২২জন প্রধান শিষ্য ছাড়াও আউল চাঁদের অনেক অনুসারী ছিল যারা হিন্দু, প্রধানত সদগোপ, রাজু, মুচি সম্প্রদায়ের এবং মুসলমান। আউল চাঁদের মৃত্যুর পর তার অনুসারীরা প্রধান দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। রামসারণ পালের নেতৃত্বে তাঁর প্রধান ৮ শিষ্য ঘোষপাড়ায় ধর্মচর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। অন্য দলটি চাকদহের কাছে পারারি[১২] গ্রামে তাদের কেন্দ্র স্থাপন করে। রামসারণ পালের মৃত্যুর পর গোষ্ঠীর নেতৃত্ব বংশগত হয়ে ওঠে এবং তাঁর বংশধরদের শ্রীযুত হিসেবে উল্লেখ করা হয়। মূলত রামসারণ পাল কর্তভজা মতবাদের প্রথম গুরুদেব এবং তার স্ত্রী সতীমা প্রথম গুরুমাতা। সতীমায়ের অলৌকিক ক্ষমতা চারদিকে প্রচারিত হলে সতীমা সাধ্বী রূপে সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পায়। তারা সতীমাকে কর্তা মা জ্ঞানে পূজা ও সম্মান করতে থাকে। সতীমার মৃত্যুর পর তার পুত্র দুলাল চাঁদ পাল (১৭৭৬-১৮৩৩) ওরফে লালশাস্ত্রীর দায়িত্বে আসে ভগবানিয়া গোষ্ঠীর নেতৃত্ব।[১৩] মূলত দুলাল চাঁদই এ সম্প্রদায়ের সাংগঠনিক রূপ দেন। সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি, ফারসি জানা মানুষ ছিলেন দুলাল চাঁদ। তার রচিত বহু পদ বা গান এ ধর্মমতকে একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত করে।[১৪] গানগুলোর সমন্বিত রূপই হলো ভাবের গীত যা ভগবানিয়াদের কাছে ধর্মপুস্তক। এটিকে তারা আইন পুস্তকও বলে থাকে।[১৫] দুলাল চাঁদ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণের চারকন্যাকে বিয়ে করেন। উদ্দেশ্য এ সম্প্রদায়ে সব জাতের মিলনক্ষেত্রে পরিণত করা। বাংলাদেশে এ সম্প্রদায়ের প্রথম অনুসারী শিবরাম মোহন্ত বা ফকির মতান্তরে নফর বিশ্বাস। জানা যায় শিবরাম মোহন্ত দুলাল চাঁদের ভক্ত ছিলেন।

বাংলাদেশের সাতক্ষীরা, খুলনা ও যশোর জেলার বেশ কিছু গ্রামে ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের বসবাস। এছাড়াও বিক্ষিপ্তভাবে দেশের অন্যান্য জেলাগুলোতে কিছু ভগবানিয়া পরিবার বাস করে। বাংলাদেশে এ সম্প্রদায়ের প্রকৃত জনসংখ্যা কত তা নির্ণয় করা কঠিন। জনশুমারির প্রতিবেদনে ভগবানিয়ারা কেউ হিন্দু পরিচয়ে সনাক্ত হয়েছেন, কেউ বা মুসলিম পরিচয়ে। তাছাড়া তারা যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট জাতি গোষ্ঠীও নন তাই জনশুমারির প্রতিবেদনে তাদের সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা যায় না। দেশের সাতক্ষীরা, খুলনা ও যশোর জেলার ৮টি উপজেলার ৩০টি গ্রামে আনুমানিক ৫ হাজার ভগবানিয়া জনগোষ্ঠীর বসবাস।[১৬] নিচের সারণিতে দেশে ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের জেলাভিত্তিক জনসংখ্যাগত পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো।

সারণি-১ বাংলাদেশে ভগবানিয়া জনগোষ্ঠী জনসংখ্যাগত পরিসংখ্যান

জেলা	উপজেলা	গ্রাম	পরিবার সংখ্যা
খুলনা	ডুমুরিয়া	তেলিখালি	৭টি
		ঘুষরা	১২টি
		মাগুরাঘোনা	৩০/৩৫টি
		বেতাগা	১৫টি
	বটিয়াঘাটা	গজেন্দ্রপুর, গড়িয়াডাঙ্গা	৮/১০টি

সাতক্ষীরা	কলারোয়া	রায়পুর ও কুশোডাঙ্গা	২৫০/২৬০টি
		বোয়ালিয়া	২০০ টি
		লাউতাড়া, বারইপাড়া, হেলাতলা, দৌলুইপুর	৫০০টি
	তালা	চরগ্রাম	১০০/১২০টি
	পাটকেলঘাটা	কাশিয়াডাঙ্গা ও বোয়ালিয়া	৫০/৬০টি
যশোর	ঝিকরগাছা	জগদানন্দকাটি, বাউসো	১০০/১৫০টি
	কেশবপুর	বিদ্যানন্দকাঠি, মঙ্গলকোট, প্রতাবপুর, শ্রীকোলা, বাইশোন, জানপুর, সাতবাড়িয়া, হরিশপুর, বেগমপুর	
	মণিরামপুর	সদর, তাহেরপুর, হেলি	১০/১২ টি

সূত্র: রহমান, ২০১৯, ইসলাম, ২০২২ ও বিশ্বাস, ২০১৯

জানা যায়, নামের মধ্যেই ভগবান শব্দটি লুকিয়ে আছে। অথচ এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ সদস্য মুসলমান ছিল। ইতিহাসের কোনো এক পর্যায়ে এরা কর্তাভজা ধর্ম গ্রহণ করে। অন্যদিকে এ সম্প্রদায় ঐতিহাসিকভাবে হিন্দুভাবাপন্ন। মূলত ভগবানিয়া জনগোষ্ঠী এক সময় ইসলাম ও হিন্দুধর্মের অনুসারী ছিল। কিছু সামাজিক আচার-আচরণ, রীতিনীতি ও লোকজ চিকিৎসা পদ্ধতি অনুশীলনের ফলে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের আদর্শ ও মতবাদ থেকে বিচ্যুত হতে শুরু করে। পরবর্তীকালে সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুত হয়ে নতুন সমন্বিত ধর্মের পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। এ মতবাদে সকল ধর্ম সত্য, সকল আচার সত্য, সকল ধর্মগ্রন্থ সত্য। প্রত্যেকজনকে তারা একজনের সৃষ্টি মনে করে। মানুষ সৃষ্টিকর্তার আশ্রয়। তাই মানুষকে জানতে না পারলে স্রষ্টাকে পাওয়া যাবে না। তবে যে মানুষের অন্তরে স্রষ্টা বিরাজ করে, সেই মানুষকে জানা এত সহজ না। স্রষ্টাকে পেতে মানুষের আরাধনা করাকেই তারা শ্রেয় মনে করে। এ ধর্ম মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ বা বৈষম্য তৈরি করে না। তাই তাদের নির্দিষ্ট কোনো পোশাক-পরিচ্ছদ বা চিহ্ন নেই। তারা লোভ-মোহ-কাম-ক্রোধকে নৈতিক পাপ বলে মনে করে। সৎ পথে থেকে এবং মিথ্যা কথা পরিহার করে নৈতিকভাবে ধর্মকর্ম পালন করাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

কর্তাভজা ধর্মের মূলকথা হলো গুরু সত্য।[১৭] গুরুকে তারা সাধারণত মহাশয় এবং শিষ্যকে বরাতি বলে সম্বোধন করে। এ সম্প্রদায়ের সাধন ভজন সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখেন এমন ব্যক্তিই গুরু হবার যোগ্য। তাদের মধ্যে নারী নেতৃত্ব নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা হয় না।[১৮] এ কারণে গুরুর ভূমিকায় নারী পুরুষ উভয়কেই দেখা যায়। গুরুর ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল হলেও তারা বাউলদের মতো একবারেই গুরুসর্বস্ব নন বরং গুরুকে আশ্রয় করে তারা সৃষ্টিকর্তাকেই ডাকেন। গুরুবাদে 'আপন সাধন ভজন কথা না কহিবে যথা তথা' এ নিয়ম পালন করা হয়। এই মতবাদ অনুসারে প্রত্যেক গ্রামে একজন গুরু বা ঠাকুর রয়েছে। কেবল মালিক শব্দ দিয়েই তারা সৃষ্টিকর্তাকে জপ করেন, প্রার্থনা করেন। ধর্মমত অনুসারে গুরুই পৃথিবীতে স্রষ্টার একমাত্র প্রতিনিধি। নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে স্রষ্টাজ্ঞানে গুরু সেবাই এ সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য। গুরুদেবকে রাজি বা খুশি করতে পারলে স্রষ্টা খুশি হন বলে তাদের বিশ্বাস।

ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের কিছু মূলমন্ত্র রয়েছে, যেগুলোকে আজ্ঞা বা আদেশ হিসেবে তারা পালন করে থাকে। এর প্রথম ছয়টিকে বলা হয় কৈট বা কোট বা নিষেধাজ্ঞা। এগুলো হলো: মিথ্যা থেকে বিরত থাকা, চুরি না করা, ব্যাভিচার না করা, মাদকাসক্ত না হওয়া ও এটো খাবার গ্রহণ না করা এবং মাংশ ও ডিম না খাওয়া। বাকী ৯টি নিষেধাজ্ঞাকে কর্ম বলে। এই কর্ম আবার তিন প্রকার, যথা:

বাক্যকর্ম: কটু কথা না বলা, অনাবশ্যক কথা না বলা, প্রণাম ভাষণ না দেয়া।
কায় কর্ম: পরস্ত্রী গমন না করা, পরদ্রব্য হরণ না করা এবং নরহত্যা না করা।
মন কর্ম: পরস্ত্রী হরণের ইচ্ছা না করা, পরদ্রব্য হরণের ইচ্ছা না করা ও নরহত্যার ইচ্ছা না করা।[১৯]

এদের কোনো উপাস্য দেবতা নেই। নেই কোনো ধর্মগ্রন্থও। তবে এ সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ দুলাল চন্দ্র পালের ভাবেরগীত-এর সন্ধান পাওয়া যায়। গানের মধ্যেই তারা ধর্মের দর্শন-নীতি ও জীবন যাপন প্রাণালী খুঁজে পায়। এই গানকে তারা বলে ভবের গীত বা পদের গান। কিন্তু যা-ই করুক না কেন গুরুকে নিবেদন না করে তাদের কোনো ধর্মীয় বা সামাজিক কাজ শুরু করা নিষেধ।[২০] ভগবানিয়া গ্রামগুলোতে এক বা একাধিক গুরু দ্বারা সামাজিক সমস্যাদি সমাধান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা, সামাজিক অনুষ্ঠান তারা গুরুর নেতৃত্বে সম্পন্ন করে থাকে। এ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব নির্ধারণে জেন্ডার বৈষম্যের ভূমিকা সক্রিয় নয়। এ কারণে গুরুর ভূমিকায় নারী-পুরুষ উভয়কেই দেখা যায়। একইভাবে এরা বাউল সম্প্রদায়ের মতো জাতভেদ প্রথা মানে না। ভাবের গীতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের সাধন ভজন সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখেন এমন ব্যক্তিই গুরু হবার যোগ্য। তবে তাদের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে গুরুর পদ লাভের নজিরও আছে। সাধারণত তাদের আরাধনার স্থান কাছারী গৃহ বা বৈঠকঘর নামে পরিচিত। গুরুর বাড়িকে অনেক গ্রামে ঠাকুরবাড়ি বলা হয়। সেখানে তারা নারী-পুরুষ একসাথে বসে ঠাকুরকে প্রণামসহ প্রার্থনা সংগীত গেয়ে থাকে। গুরুকে মান্য করা এবং বড়দের সম্মান করা তাদের ধর্মের অনন্য বৈশিষ্ট্য। এছাড়া তারা গুরুনিন্দাকে মহাপাপ মনে করে। এ প্রসঙ্গে ৭৩ বছর বয়সী আরশ শেখ বলেন- 'গুরুনিন্দা অধঃগতি অর্থাৎ গুরুনিন্দা করা যেমন পাপ, তেমনি শোনাও পাপ।'

৫. আচার-অনুষ্ঠান

ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে নদীয়া জেলার ঘোষপাড়া গ্রাম[২১] তাদের কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং পরে তা পীঠস্থান হয়ে ওঠে। সতী মায়ের সম্মানে ঘোষপাড়ায় সতীমার দোলমেলা প্রতি বছর চৈত্র মাসে দোল পূর্ণিমার দিনে অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলায় দেশ-বিদেশের ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের অনুসারীরা সমবেত হয়। বাংলাদেশেও ভগবানিয়াদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দোল পূর্ণিমায় যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার জগদ্দলকাঠি গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে গুরুরা আসেন এবং আলোচনার অংশ নেন। এছাড়া তারা বারো মাসে বারো ধরনের অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। যেমন-বৈশাখ মাসে ভগবতী পূজা, জৈষ্ঠ্য মাসে জামাইষষ্ঠী, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, শ্রাবণে মনসা, পূর্ণিমা, ভাদ্রে নতুনি/নবা, আশ্বিনে ডাকসারিন্দ, কার্তিকে কালিমাস/রাসপূর্ণিমা, অগ্রহায়ণে পাততি বা নবান্ন, পৌষে পৌষ সারান্দি, মাঘে

মাঘী পূর্ণিমা/ ৫মী সরস্বতী, ফাল্গুনে গো-ফাল্গুনি/গোসারান্দি অনুষ্ঠানাদি পালন করে থাকে। পাশাপাশি তারা প্রতিদিন তিনবেলা কাচারিঘর বা ঠাকুরঘরে গিয়ে গুরু বা ঠাকুরকে প্রণাম করে থাকে। এছাড়া প্রতি মাসে একবার তারা ঠাকুর ঘরে সম্মিলিত প্রার্থনায় মিলিত হন। তারা অন্য ধর্মের মতো রোজা বা উপবাস পালন করে না। তারা মূর্তিপূজা এবং সকল প্রকার আনুষ্ঠানিক যাগযজ্ঞের বিরোধী। মানবসেবাই তাদের কাছে মুখ্য। এ প্রসঙ্গে ভাবের গীতে বলা হয়েছে– "আছে মানুষে মানুষে যার ভেদাভেদ জ্ঞান, সে রাজ্য গমনে তার মিলবে না সন্ধান।" উক্ত বাণী থেকে বোঝা যায় এ সম্প্রদায়ের সাধন ভজনে মানবসেবার বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে ভাবের গীতে আরও বলা হয়েছে– "মানুষ ভজ, মানুষ চিন, মানুষ কর সার, সকলি মানুষের খেলা মানুষ বই নাই আর"। একইভাবে এরা বাউল সম্প্রদায়ের মতো জাতিভেদ প্রথা মানে না। দুলাল চন্দ্র পালের ভাবের গীতে তাই আরও বলা হচ্ছে– "ভেদ নাই মানুষে মানুষে, খেদ কেন ভাই এদেশে।"

৬. বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবন

মানব সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার। আর পরিবার গঠনের অন্যতম শর্ত হলো বিবাহ। ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের পুরুষদের বিয়ে হয় কনের বাড়িতে। এদের বিয়ে ঠাকুর দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে ও বর্ণহিন্দুর নিয়মে ঠিক হয়। তথাপিও বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার ক্ষেত্রে নিজস্ব ঐতিহ্য, আচার অনুষ্ঠান, লৌকিক বিশ্বাস নিজেদের সামাজিক বাধা নিষেধ মানা হয়। বিয়ের দিন সাধারণত কনেকে লালশাড়ি, শাখা-সিঁদুর আর বরকে সাদা ধুতি ও মাথায় টোপর পরতে হয়। ঠাকুরের উপস্থিতিতে সম্প্রদায়ের ২-৩ জন ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখে বর কনের মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দেয় এবং ঠাকুরের কিছু উপদেশের মাধ্যমে বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়। এরপর বর কনেকে সম্পত্তি হিসেবে এক টাকা প্রদান করে থাকে।[২২] হিন্দুদের মতো তাদের বিয়ে তিথি বা লগ্ন মেনে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। তারা বিবাহে কাবিন, নিবন্ধন প্রয়োজন মনে করে না। তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাকের কোনো রেওয়াজ নেই। এছাড়া তাদের মধ্যে দ্বিতীয় বিবাহে বাঁধা না থাকলেও বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ। কেউ বিধবা নারীকে বিয়ে করলে তাকে সমাজচ্যুত করা হয়। তাদের মধ্যে অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহ প্রচলিত। তাই নিজ সম্প্রদায়ের বাইরে বিয়ে করলে তাকে একঘরে করা হয়। গ্রামের হিন্দু ও মুসলিম বিয়ের মতো এদের বিয়েতেও যৌতুকের[২৩] প্রচলন রয়েছে।

ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের বিবাহ পরবর্তী দাম্পত্য ও যৌনজীবন নানা নিয়ম কানুনে বাধা। সন্তান নেওয়ার উদ্দেশ্যে এমনকি সাধারণভাবেও অমাবস্যার ১৫দিন স্বামী-স্ত্রীর যৌনমিলন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এছাড়া শুক্র, শনি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার যৌনমিলন গ্রহণযোগ্য নয় বলে এ সম্প্রদায়ের অনুসারীরা মনে করে। ভরাপেটে দিনের বেলা, সংকীর্ণ জায়গায় অথবা স্বল্প আলোয় যৌনমিলন নিষিদ্ধ। আবার নারীদের গর্ভবতী হওয়ার প্রথম তিন মাস ও সন্তান প্রসবের পরবর্তী তিন মাস যৌনমিলন নিষিদ্ধ। এ সম্প্রদায়ে দাইমা বা অভিজ্ঞ বয়স্ক নারীরা সন্তান প্রসব করান। এছাড়া মাসিক চলাকালীন নারীদের গোয়ালঘরে প্রবেশ, ধানের গোলা ও সন্ধ্যাপ্রদীপ স্পর্শ, বৃক্ষরোপণ ও রান্না করা নিষিদ্ধ। নারীরা প্রথম গর্ভবতী হয়ে সাত মাসে পদার্পণ করলে, শুভদিন দেখে 'সাতাসা' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে গর্ভবতীকে সাত রকম শাক ও মিষ্টি জাতীয় খাবার খাওয়ানো হয়। সন্তান জন্মের মোটামুটি এক বছরের মধ্যে ঠাকুরের উপস্থিতিতে 'গালেভাত' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদের মধ্যে

মুসলিমদের মতো পুত্র সন্তানদের খৎনা দেয়ার রীতি নেই। কৃষি প্রধান পরিবার হওয়ায় আগে তারা যৌথ পরিবারে বসবাস করলেও বর্তমানে বেশিরভাগই সদস্যই একক পরিবারে বাস করে। এদের পরিবার প্রতি গড় জনসংখ্যা ৫-৭ জন।

৭. খাদ্যাভ্যাস

কর্তাভজা ধর্মমত অনুসারে মাংস ছাড়াও শোল মাছ, ডিম, বোয়াল মাছ, গজার মাছ ও মসুরির ডাল খাওয়া নিষিদ্ধ। তবে তারা দুধ ও ঘি খেতে পছন্দ করে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে তারা সাধারণত নিরামিষ (রুটি ও ফল) খেয়ে থাকে। রান্নাঘর তাদের কাছে মন্দিরের মতো পবিত্র স্থান। তাদের স্নানান্তে রান্নাঘরে প্রবেশ করতে হয়। জুতা পায়ে রান্নাঘরে প্রবেশ ও খাবার পরিবেশন করা নিষিদ্ধ। ঠাকুরকে প্রদান না করে তারা কোনো ঋতুভিত্তিক ফল বা শস্য গ্রহণ করে না। বিধবাদের আমিষযুক্ত খাবার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এদের মধ্যে কেউ মারা গেলে মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা তিন দিন আমিষ জাতীয় খাবার গ্রহণ করে না। এছাড়া এরা অন্য সম্প্রদায়ের রান্না খাবার গ্রহণ করে না। তবে সামাজিকতা রক্ষার্থে বা বিশেষ অনুরোধে তাদের মিষ্টি ও ফল খেতে দেখা যায়। তারা অতিথি আপ্যায়নে দুধ, কলা ও মিষ্টি-মিঠাই দিয়ে আপ্যায়িত করে থাকেন। তাদের পরিবারের প্রত্যেক সদস্যদের জন্য পৃথক থালা, বাটি, গ্লাস ও ব্যবহার্য জিনিসপত্র থাকে। যদি কোনো অনুষ্ঠানে ৫০০ ব্যক্তি উপস্থিত থাকে তাহলে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য। এছাড়া তারা প্রাণির শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে তৈরি পণ্য যেমন-চামড়ার জুতা, বেল্ট, ওয়ালেট, ব্যাগ, ওয়ালেট, চিরুনি ইত্যাদি ব্যবহার করে না। তাদের ধারণা, চামড়ার পণ্য ব্যবহার করলে তারা রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এমনকি নলকূপের সিটবল চামড়া দিয়ে তৈরি বলে তারা দীর্ঘকাল নলকূপের পানি পান করত না। পরবর্তী সময়ে প্লাস্টিকের সিটবল তৈরির পর নলকূপের পানি পান শুরু করে। খাবার পানিকে এরা পানিই বলে থাকে। পবিত্রতা রক্ষায় তারা গোবর ব্যবহার করে থাকে। মাটির ঘর, ঘরের বেড়া লেপনের কাজে তারা গোবর ব্যবহার করে।

৮. চিকিৎসা সেবা

কর্তাভজা ধর্মের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো লোকায়ত চিকিৎসা পদ্ধতির অনুশীলন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উৎকর্ষের যুগেও এ সম্প্রদায়ের সদস্যরা ধর্মীয় এবং সনাতন ধ্যানধারণার প্রতি তাদের বিশ্বাস অটুট রেখেছে। তাদের বিশ্বাস ব্যক্তির কর্মফলই রোগব্যাধির কারণ। মানুষ ধর্মীয় বিধিবিধান থেকে বিচ্যুত হলে নানা ধরনের রোগ শোকে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে কেউ রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে সাধারণত আধুনিক চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করে না। সাধারণত ঠাকুর এ চিকিৎসা প্রদান করে থাকেন। তবে শুধু মানুষকে নয় তাদের একমাত্র গৃহপালিত প্রাণি গরুর চিকিৎসাও তিনি দিয়ে থাকেন। ঠাকুর সাধারণত ঝাড়ফুক বা পানিপড়া দেন, যা খেয়ে তারা সুস্থ হয়ে ওঠে। ভক্তদের বিশ্বাস সতীমার দোহাই দিলে যে কোনো রোগবালাই দূর হয়ে যায়। রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে তারা প্রকৃতির বিভিন্ন গাছ-গাছড়া ও উপাদান এবং কঠোর নিয়মনীতির ওপর নির্ভরশীল। বিধি নিষেধ অমান্য করে কেউ আধুনিক চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করলে তাকে 'একঘরে' করা হয়। এমনকি নারীরা প্রকাশ্যে পরিবার পরিকল্পনা মাঠকর্মীদের কোনো পরামর্শ গ্রহণ করেন না। এছাড়া তাদের শিশুদের

টিকা দেয় না, ভিটামিন ক্যাপসুল খাওয়ায় না। বর্তমানে এ অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে বলে জানান উত্তরদাতা তাসলিমা খাতুন (৩৫)। তিনি বলেন যে, "তার সন্তানের (ধ্রুবরাজ) জন্ম হয়েছে তালা সদর হাসপাতালে সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে। কিন্তু তার শ্বশুর আরশ শেখ দীর্ঘদিন যক্ষা রোগে ভুগলেও আধুনিক চিকিৎসা নিতে রাজি নন।"[২৪]

৯. অন্তেষ্টিক্রিয়া

ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের সদস্যরা হিন্দুদের মতো পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি ইহজগতে ভালো কাজ না করে মৃত্যুবরণ করলে তাকে পুনর্জন্ম নিতে হয়। স্বজাতির কেউ মারা গেলে ঘনিষ্ঠ স্বজনরাই মুসলিম রীতি অনুযায়ী মরদেহ গরম পানি দিয়ে পরিচ্ছন্নভাবে ধৌত করে থাকে। ধৌত করার পর সাদা কাফনের কাপড় পরিয়ে কবর দেয়া হয়। মরদেহ ধোয়ানোর স্থানটি অনেকদিন পাকপবিত্র রাখা হয়। এরপর অনেকটা জানাজার মতো সমবেত সদস্যরা গামছা গলায় পেঁচিয়ে আঁচল ধরে জোড়হাতে মালিকের (সৃষ্টিকর্তার) কাছে প্রার্থনা করে। তাদের সমাহিত করা জন্য নির্ধারিত কবরস্থান আছে। শুধু ঠাকুরের কবর আলাদাভাবে বাঁধাই করা হয়। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে নারীর অংশগ্রহণ থাকে না। ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের প্রথম দিন চুল-দাড়ি ছাঁটা, মাথায় তেল ব্যবহার ও আমিষ খাওয়া নিষিদ্ধ। চতুর্থ দিনে চুল-দাড়ি ছেঁটে গোসল করে পরিচ্ছন্ন হতে হয়। ঐদিন মাটি দিয়ে ঘর এবং গোবর দিয়ে উঠান লেপন করা হয়। পাশাপাশি ঘরের সমস্ত কাপড় চোপড় ও বিছানাপত্র ধুয়ে ফেলা হয় এবং মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিসপত্র ফেলে দেওয়া হয়। চতুর্থ দিনে মৃত ব্যক্তির শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতিতে ধর্মীয় সংগীত গাওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ দেবার জন্য মৃত ব্যক্তির পরিবারের কোনো সদস্য গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে খালি পায়ে হাতজোড় ও মাথা নত করে দাওয়াত দিয়ে থাকে। দশম দিনে ঠাকুরের উদ্যোগে মৃত ব্যক্তির জন্য 'দশদশা'র আয়োজন করা হয় এবং বারতম দিনে মৃত ব্যক্তির পাপমুক্তির জন্য 'বিসা'র আয়োজন করা হয়। এরপর ঠাকুরকে ডেকে সকলে গলায় গামছা পেচিয়ে নতমস্তকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে মন্ত্রযপের মাধ্যমে শেষকৃত্য করা হয়।[২৫]

১০. সামাজিক জীবনাচার

ভগবানিয়ারা একই সঙ্গে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি পালন করে থাকে। তাদের নামকরণে উভয় ধর্মের প্রভাব লক্ষ করা যায় যেমন- শ্রী করিম মোড়ল, সন্তোষ খাঁ, হরিদাসী, রাধা রানী, মিনতি, শ্রীমতী রাহেলা বানু, রিনা রানী, শিখা রানী, কাকলী রানী, নিস্তারি বালা, পারমিতা, অরুনা সানা, নাসিমা শেখ, কিনুলাল গাইন, কাদের মোড়ল, অজিত খাঁ, আরিজুল্লাহ শেখ, বজলু শেখ, পরেশ শেখ, নয়ন শেখ, রিংকু শেখ, পরিতোষ দফাদার, কবির দফাদার প্রভৃতি। তারা নামের শেষে শেখ, বিশ্বাস, গাজী, খাঁ, গাইন, বালা, সানা, মোড়ল, দফাদার ইত্যাদি পদবি ব্যবহার করে থাকে। মূলত নাম নিয়ে এদের বিশেষ মাতামাতি নেই। এ ধর্ম তাদেরকে দান করেছে সংযম। তারা তাই দাস্যভাবে গুরুসেবা করে। মানুষের সেবা করে। গুরুবাদী ধর্ম হিসেবে ভগবানিয়া ধর্মের যেটুকু মাহাত্ম তারচেয়ে অনেক বেশি এক মহিমা দান করেছে নারীকে গুরুর মর্যাদা দানের বিষয়টি।[২৬] এদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন নানা নিয়মকানুন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ

হওয়ায় পার্শ্ববর্তী অন্যান্য সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক সবসময় ভালো যায় না। তাছাড়া, আধুনিক চিকিৎসার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে বেশ সমস্যায় পড়তে হয়। তারা পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত রাখার জন্য বাড়ির চারপাশে নিমগাছ এবং বাড়ির সামনে তুলসী গাছ রোপণ করে থাকে। ঘরের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার জন্য তারা সপ্তাহে অন্তত দু-তিন দিন গোবর দিয়ে মেঝে লেপন করে। এছাড়া বাড়ির পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার স্বার্থে তারা হাঁস-মুরগি ও ছাগল পালন করে না। তাই অনেক সময় প্রতিবেশীদের হাঁস-মুরগি ও ছাগল তাদের বাড়ির আঙিনায় প্রবেশ করলে তারা খুব বিরক্ত হয়। যে কারণে প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সর্বদা ভালো যায় না। তবে লোকায়ত চিকিৎসা পদ্ধতি চর্চার কারণে গ্রামের অনেকে রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে। ফলে সাধারণ গ্রামবাসীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বেশ ভালো। ইদানিং তাদের মধ্যে শিক্ষার হার (৬০ শতাংশ) বেশ ভালো। তাদের ছেলে-মেয়েদের অনেকে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। নির্বাচিত গ্রামের অজিত খান ও শিখা রাণী দম্পতির বড় ছেলে অন্ত খান বর্তমানে ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোল বিষয়ে পড়াশোনা করছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে তাদের ৪০ শতাংশ হিন্দু এবং ৬০ শতাংশ ইসলাম ধর্ম পড়ে থাকে। বর্তমানে তারা নানা পেশায় যুক্ত হচ্ছে। তারা সরকারি চাকরি, শিক্ষকতা[২৭], পুলিশ, উকিল, বিমান বাহিনী, বিআরডিবি, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায়[২৮] চাকরি করে থাকে। তাই ধর্মের বিধি-নিষেধ তথা গুরুর আদেশ-নিষেধ মেলে চলা তাদের মানসিক কষ্টের কারণ।

উপসংহার

ইদানিং শিক্ষিত হবার ফলে ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস, প্রথা ও চিকিৎসা সেবায় পরিবর্তন এসেছে। তারা মালিকের উপর ভরসা ও গুরুর দেখানো পথেই অগ্রসর হন। তারা তুলনামূলকভাবে শান্তিপ্রিয় ও সংযমী। ফলে এখন পর্যন্ত প্রায় ৪০০ বছরের ইতিহাসে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো সহিংস ঘটনা ঘটেনি। তবে শুধু ধর্ম দিয়ে সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করা যায় না। ধর্মের থেকেও সেখানে বড় হয়ে ওঠে মানুষে মানুষে সম্পর্ক। তারা অন্যান্য বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মতো সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেয়ে থোকে। তবে আধুনিক জীবনযাপন ও চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে তাদের বেশ সমস্যায় পড়তে হয়। এটিও সত্য যে দেশজ চিকিৎসা পদ্ধতি প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। সেখানে ভগবানিয়ারা চর্চার মাধ্যমে তা টিকিয়ে রেখেছে। আমাদের পার্শ্ববতী দেশ ভারত ও শ্রীলঙ্কায় ভেষজ চিকিৎসাকে উৎসাহিত করতে সরকারি পর্যায়ে প্রণোদনা দেয়া হয়। তাই এই চিকিৎসা পদ্ধতি সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা থাকা দরকার। পাশাপাশি তারা যেন তাদের ধর্মকর্ম নির্বিঘ্নে চর্চা করতে পারে তার জন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন আরো জোরালো করা দরকার।

তথ্যনির্দেশ

১. সান্টো ডাইম হলো ব্রাজিলে প্রতিষ্ঠিত একটি সমন্বিত ধর্ম যা ফোক ক্যাথলিকবাদ, কারদেসিস্ট স্পিরিটিজম, আফ্রিকান অ্যানিমিজম এবং আদিবাসী দক্ষিণ আমেরিকান শামানিজম, ভেজিটালিজমসহ বেশ কিছু ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের উপাদানকে অন্তর্ভুক্ত করে।

২. একটি দ্বৈতবাদী ধর্ম যা তৃতীয় শতাব্দীর পারস্যের নবী মানি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যিনি খ্রিস্টধর্ম, জরথুস্ট্রিয়ান এবং বৌদ্ধধর্মের উপাদানগুলিকে একত্রিত করেছিলেন।

৩. ১৫-১৬ শতকের ভারতীয় সংস্কারক গুরু নানক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি ধর্ম, যিনি ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের উপাদানগুলিকে একত্রিত করেছিলেন।

৪. ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ার কল্যাণীর কেনো কোনো স্থানে তাদেরকে কর্তাভজা সম্প্রদায় বলা হয়।

৫. মনজুরুল আলম মুকুল, *ধর্মের নাম কর্তাভজা*, রাইজিংবিডি.কম (ঢাকা), ২৮ জানুয়ারি, ২০১৫

৬. সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার মাগুরা ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য চরগ্রাম নিবাসী তোকিম (০১৭১৯৫০৬৭৮২) এ তথ্য প্রদান করেছেন।

৭. ৩টি জামে মসজিদ ও ২টি পাঞ্জেখানা মসজিদ।

৮. আজাদুর রহমান, *ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের জীবন*, দেশ রূপান্তর (ঢাকা), ০৯ এপ্রিল, ২০১৯

৯. সত্যব্রত দে (সম্পাদিত), *কর্তাভজা ধর্মের ইতিবৃত্ত*, কলিকাতা: জিজ্ঞাসা এজেন্সিস লিমিটেড, মে, ১৯৫০, পৃ. ৬৭

১০. রঞ্জনা বিশ্বাস, পাগলচাঁদ, *মানবতায় বিশ্বাসী লোকধর্ম*, সাম্প্রতিক দেশকাল (ঢাকা), ১১ মে, ২০২৪

১১. কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ফকির আউল চাঁদ ১১০১ বঙ্গাব্দে বা ১৬১৬ শকে (১৬৯৪-১৬৯৫) উলা বীর গ্রামে ৮ম বর্ষীয় বালক রূপে আবির্ভূত হয়। এই দিক থেকে আউল চাঁদ জন্মগ্রহণ করেন ১০৯৩ বঙ্গাব্দে বা ১৬০৮ শকাব্দে বা ১৬৮৬/৮৭ খ্রিস্টাব্দে। প্রচলিত তথ্যানুযায়ী তাঁর মৃত্যু হয় ১১৭৬ বঙ্গাব্দে বা ১৭৬৯ খ্রিঃ বা ১৬৯১ শকাব্দে। রামসরণ পালের সাথে কোন সময় দেখা হয় সেটি সঠিকভাবে জানা না গেলেও বলা হয় ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দের কোনো এক সময় রামসরণ পালের সাথে আউল চাঁদ ফকিরের সাক্ষাৎ ঘটে এবং কর্তাভজা সম্প্রদায়ের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট রচিত হয়।

১২. সেখানে আউলচাঁদের মৃতদেহ দাহ করে।

১৩. জানা যায় আউল চাঁদেই রামশারন পাল ও সরস্বতী দেবীর সন্তান হয়ে পরবর্তীতে জন্ম নেন দুলাল চাঁদ নামে।

১৪. দীলিপ রায়, *কল্যাণীর সতীমার দোলমেলা ও কর্তাভজা সম্প্রদায়: একটি পর্যালোচনা*, মনমানষ, ২০১৩

১৫. জানা যায় দুলাল চাঁদ এই গানগুলো চাঁদ মুখে মুখে বলে দিতেন। আর লিখতেন ভেলরের এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী রামচরণ চট্টোপাধ্যায়।

১৬. খুলনা জেলার ডুমুরিয়া, বটিয়াঘাটা, সাতক্ষীরার কলারোয়া ও তালা উপজেলা, যশোরের ঝিকরগাছা, কেশবপুর ও মনিরামপুর উপজেলায় ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে।

১৭. গুরু ধরা যেমন ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের অবশ্য কর্তব্য, তেমনি সত্য বলাটাও আবশ্যিক। এ জন্য এ ধর্মকে সত্য ধর্মও বলে, গুরু ধর্মও বলে।

১৮. গুরুর গৃহই ভক্তের মন্দির। এইগুরু আবার একটি পরিবারে একাধিক হতে পারে। মেয়েরা বিয়ের আগে বাবার গুরুর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে, বিয়ের পরে স্বামীর গুরুই তার গুরু হয়ে যায়। কখনো কখনো এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়।

১৯. রঞ্জনা বিশ্বাস, *ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের ধর্ম ও দর্শন*, চিন্তাসূত্র, ১৬ আগস্ট, ২০১৯

২০. প্রাগুক্ত

২১. বর্তমানে, কল্যাণী শহরের একটি পাশ্ববর্তী একটি গ্রাম।

২২. অনেকটা মুসলিম বিবাহে প্রচলিত দেনমোহরের মতো।

২৩. আর্থ-সামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে যৌতুকের বিষয় ও মান নির্ধারিত হয়। সাধারণত এদের বিয়েতে স্বর্ণের আংটি, গলার চেইন, কানের দুল, ঘড়ি, সাইকেল, মোটর সাইকেল, টেলিভিশন, ফ্রিজ, ল্যাপটপ, খাট ইত্যাদি।

২৪. তাসলিমা, চরগ্রাম, তালা, সাতক্ষীরা-০১৭৮৮১৩৩৩৬২

২৫. রফিকুল ইসলাম, *ঝিকরগাছার বৈচিত্র্যময় জীবনধারার ভগমেনে সম্প্রদায়*, দৈনিক ভোরের পাতা, ১ মার্চ, ২০২২

২৬. এটি তারা গ্রহণ করেছে বৌদ্ধ সহজিয়া তত্ত্ব থেকে। বৈষ্ণব সহজিয়ারা নারীকে রাধার অংশ মনে করে থাকে।

২৭. মানিক খান মাগুরা প্রগতি উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক এবং রমা মোড়ল চরগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত। (তথ্যসূত্র: তাসলিমা-০১৭৮৮১৩৩৩৬২)

২৮. রিনা রানী যশোর নিউমার্কেট ও রাজিব কেশবপুরে বেসরকারি সংস্থা টিএমএসএস-এ কর্মরত। পারমিতা বিমানবাহিনী (যশোর), কাকলী রানী একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পে চাকরি করেন। দুলাল গাইন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে চাকরি করেন। তার সহোদর ভূট্টো গাইন অ্যাডভোকেট।

BL College Journal
https://doi.org/10.62106/blc2024v6i1b3
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -VI, Issue-I, June 2024
Pp. 29-45

বঙ্গবন্ধুর ভাষণে নৈতিকতা: ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা

মোঃ আমিনুর রহমান

সারসংক্ষেপ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নীতি-নৈতিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নৈতিকতার ব্যাপারে তিনি ছিলেন আপসহীন। ইসলামের নৈতিক দিকগুলো তার বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্গবন্ধুর মতে, অযোগ্য নেতৃত্ব, নীতিহীন নেতা এবং ভীরু রাজনীতিবিদদের সঙ্গে কখনোই একত্রে কাজ করা উচিত নয়। এরা দেশের সেবা না করে দেশ ও জনগণকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ক্ষমতায় এসে তিনি মদ, জুয়াসহ ইসলামের দৃষ্টিতে অনৈতিক কাজ বন্ধ করে দেন। স্বদেশে ফিরেই তিনি সর্বপ্রথম দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তিনি সুদখোর, ঘুষ, চোরাচালান, মজুদদারিসহ যাবতীয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি নিজেও দুর্নীতি হতে বিরত থেকে মানুষকে দুর্নীতিমুক্ত রাখার চেষ্টা করেছেন। এ প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধুর উল্লিখিত বক্তৃতা থেকে তাঁর ইসলামী আকীদা সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে।

মোঃ আমিনুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামী শিক্ষা বিভাগ
বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ
বরিশাল, বাংলাদেশ

পিএইচ.ডি. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
e-mail : 2aminur@gmail.com

মূলশব্দ

বঙ্গবন্ধু, মুজিব, নৈতিকতা, বাংলাদেশ, ভাষণ

ভূমিকা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি নাম, একজন ব্যক্তি এবং একটি প্রতিষ্ঠান। তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী বক্তা। তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সম্পাদক, বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং পরবর্তীতে এদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ৫৫ বছরের জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি কারাগার ও আন্দোলনে অতিবাহিত করেন। বাংলাদেশকে স্বাধীন ও শত্রুমুক্ত করার পর এদেশকে একটি 'সোনার বাংলাদেশ' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজেকে সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত করেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সংগ্রহ করা একটি কঠিন কাজ। কিছুদিন আগেও আমরা প্রায় ৭০ বছর আগের দলিলপত্র পেয়েছি, যা এতদিন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ছিলো। এগুলো পাওয়ার পর আমার ধারণা আরও বহু বক্তৃতা রয়েছে জানা-অজানার মাঝে। ভাষণের সত্যতা যাচাই-বাছাই করে নৈতিকতা ও ইসলামি ভাবধারার কিছু

ভাষণ এখানে একত্রিত করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যা থেকে মানুষ ব্যাপকভাবে জানতে পারবে আল্লাহর প্রতি বঙ্গবন্ধুর আস্থা ও বিশ্বাস সম্পর্কে এবং নৈতিকতার ব্যাপারে তাঁর কঠোর অবস্থান সম্পর্কে। তিনি মুখে যা বলতেন অন্তরে সেটাই লালন করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, নৈতিকতা বিবর্জিত মানুষের চরিত্র বলতে কিছুই থাকে না। তাই দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, সুদখোর, চোর, ডাকাত, মুনাফাখোর, চোরাকারবারীদের মতো অনৈতিক লোকদেরকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

পদ্ধতি

প্রবন্ধটিতে বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থ, জার্নাল, ম্যাগাজিন, ভিডিও এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয়েছে।

নৈতিকতার পরিচয়

'নীতি' শব্দ থেকেই 'নৈতিকতা' শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে।[১] ইংরেজিতে Morality শব্দটির একাধিক প্রতিশব্দগুলো হলো, Character, nature, mental or moral nature, substance, temperament, desposition ইত্যাদি।

দার্শনিকদের ভাষায় সততা, সত্যবাদিতা, অঙ্গিকার করা, আমানতদারী, ন্যায়বিচার, আইনের অনুসরণ, রাষ্ট্রের নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলার নামই নৈতিকতা।[২] নৈতিকতা ও নীতিবিদ্যার ইংরেজী প্রতিশব্দ Ethics, শব্দটির উৎস গ্রিক শব্দ Ethos থেকে। যার বাংলা অর্থ আচার-ব্যবহার, চরিত্র, রীতিনীতি, অভ্যাস।

নৈতিকতার অপর ইংরেজি প্রতিশব্দ Morals; এটি ল্যাটিন Moralis শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হলো আচার-ব্যবহার, রাতিনীতি বা প্রথা।[৩]

মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন তুসী বলেন, "ইংরেজীতে আমরা যাকে Ethic (এথিক্স) ও Moral Philosophy (মোরাল ফিলসফি) বলি, তার উৎপত্তি যথাক্রমে Ethos (ইথস) ও Mos (মস) এ দু'টি ল্যাটিন শব্দমূল থেকে। দুটি শব্দেরই অর্থ প্রথা বা প্রচলিত রীতিনীতি।[৪]

Dictionary of Islam এ বলা হয়েছে, Based on one's sense of what is right and just not on legal rights and obligations.[৫]

'কোনো মৌলিক নীতি এবং বাধ্যগত নীতিমালা দিয়ে নয়, কারো বিবেক বা চেতনার উপর ভিত্তি করে যা সঠিক এবং বিশুদ্ধ তাই মোরালিটি।'

Encyclopedia of Religion এ বলা হয়েছে, 'Morality is thought to pertain to the conduct of human affairs and relations between persons, while religion primarily involves the relationship between human beings and a transcendent reality.'[৬]

Stamford Encyclopedia of Philosophy তে বলা হয়েছে, The term 'Morality' can be used either descriptively to refer to certain codes of conduct put forward by a society or

a group (such as a religion), or accepted by an individual for her own behavior, or normatively to refer to a code of conduct that, given specified conditions, would be put forward by all rational persons.[৭]

'মোরালিটি পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয় বর্ণনামূলকভাবে, যা নির্দেশ করে পরিচালনার কিছু নির্দিষ্ট নীতি যা একটি সমাজ বা একটি গ্রুপ নির্ধারণ করে। যেমন একটি ধর্ম। অথবা স্বতন্ত্রভাবে সে ধর্মের আচরণের মাধ্যমে গৃহীত হয়। আর আদর্শগতভাবে এটা নির্দেশ করে পরিচালনার নীতি, যা বিশেষ শর্ত প্রদান করে, যা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কর্তৃক রাখা হয়।'

Merriam-Webster তে বলা হয়েছে, The discipline dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation.[৮]

বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম ও জন্মস্থান

বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তদানীন্তন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ[৯] মহকুমার (বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার) অন্তর্গত কোটালিপাড়া উপজেলার পাটগাতি ইউনিয়নের টুঙ্গিপাড়া[১০] গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ মোতাবেক ২০ চৈত্র ১৩২৭ বঙ্গাব্দ মঙ্গলবার রাত ৮ ঘটিকায় জন্মগ্রহণ করেন।[১১]

এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলেন, আমার জন্ম হয় ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। আমার ইউনিয়ন হলো ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের সর্বশেষ ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের পাশেই মধুমতী নদী। মধুমতি খুলনা ও ফরিদপুর জেলাকে ভাগ করে রেখেছে। নিজ জন্মতারিখ সম্পর্কে তিনি বলেন, আমার জন্ম হয় ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ তারিখে।[১২] ভবেশ রায় বলেন, ২০ চৈত্র ১৩২৭ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ রোজ মঙ্গলবার রাত ৮.০০ টার সময় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে বাঙালি জাতির মুক্তির আলোকবর্তিকা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন।[১৩] বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত নাম শেখ মুজিবুর রহমান। উপাধি হলো বঙ্গবন্ধু[১৪] জাতির পিতা বা জাতির জনক। তবে তিনি বঙ্গবন্ধু নামেই বেশি পরিচিতি লাভ করেন। পিতা-মাতা আদর করে তাঁকে 'খোকা' বলে ডাকতেন।[১৫] জন্মের পর নানা শেখ আব্দুল মজিদ আল-কুরআনুল কারীমের সূরা হুদ-এর একটি আয়াত থেকে বাছাই করে খোকার নাম রাখেন মুজিবুর রহমান। যার অর্থ দয়ালুর(আল্লাহ) ডাকে সাড়াদানকারী বা উত্তর দানকারী। নাতির নাম রাখার সময় তিনি বলেন, "মা সায়েরা তোর ছেলের নাম এমন রাখলাম, যে নাম জগৎজোড়া খ্যাতি হবে।[১৬] বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও মাতার নাম সায়েরা খাতুন। তাঁর মা ছিলেন তাঁর পিতার চাচাতো বোন, বড় চাচা শেখ আব্দুল মজিদের মেয়ে। তাঁরা উভয়ে ছিলেন আদর্শবান ও ধার্মিক।[১৭] বঙ্গবন্ধুর বংশ পরিক্রমা হলো, শেখ মুজিবুর রহমান ইবন শেখ লুৎফর রহমান ইবন শেখ আব্দুল হামিদ ইব্ন শেখ মুহাম্মদ জাকির ইবন শেখ একরামউল্লাহ্ ইবন শেখ বোরহানউদ্দিন ইবন শেখ জান মাহমুদ ইবন শেখ জহিরউদ্দিন ইবন শেখ আব্দুল আউয়াল (রহ)।[১৮]

সম্মানজনক উপাধি ও পুরস্কার লাভ

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদানের পর মার্কিন সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নিউজউইক'-এর সংবাদদাতা লোরেন জেনকিন্স তাঁর প্রতিবেদনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'Poet of Politics' তথা 'রাজনীতির কবি' বলে উল্লেখ করেন।[১৯]

ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামকে বিশ্বমানবতার ইতিহাসে চির অম্লান করে রাখার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের ১০ অক্টোবর 'বিশ্বশান্তি পরিষদ' (World Peace Council)-এর পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরি' পদকে ভূষিত করা হয়। এটি ছিল বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর অবদানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং দেশের জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মাননা।[২০] ২০০৪ সালে লন্ডনস্থ বিবিসি কর্তৃক শ্রেষ্ঠ বাঙালিদের একটি সমীক্ষা পরিচালনা কর হয়। উক্ত জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে নির্বাচিত হন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।[২১]

শাহাদতবরণ

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ফজরের আজানের সময় মেজর ফারুক, মেজর খন্দকার আব্দুর রশীদ, মেজর নূর চৌধুরী, মেজর বজলুল হুদা, মেজর মহিউদ্দিন ল্যান্সার ও আর্টিলারির একদল সৈন্য ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে আক্রমণ করে। শেখ কামাল নিচতলায় নেমে আসার সময় মেজর বজলুল হুদার গুলিতে লুটিয়ে পড়েন। বঙ্গবন্ধু শেখ কামালের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে মেজরদের ধমক দিলে তারা পিছিয়ে যায়। এ মুহূর্তে মেজর নূর চৌধুরী বঙ্গবন্ধুকে স্টেনগান দিয়ে পরপর অনেকগুলো গুলি করে। গুলি বুকের ভিতর দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যায়।[২২] বঙ্গবন্ধুর গায়ে ১৮টি গুলি লেগেছিল, তবে মুখে কোনো গুলি লাগেনি। দু'পায়ের গোড়ালীর দুটি রগই ছিল কাটা। মৃত্যুর পরেও গায়ের পাঞ্জাবির বুক পকেটে চশমা, সাইড পকেটে তার প্রিয় পাইপ এবং গায়ে সাধারণ তোয়ালে জড়ানো ছিল। বঙ্গবন্ধুকে ৫৭০ সাবান দিয়ে গোসল করিয়ে রেডক্রসের ৪ খানা সাদা পাড়ওয়ালা শাড়ি দিয়ে দাফন করানো হয়। পেটের নিচে পিছন দিক হতে একটি গুলি ঢুকে সামনের দিকে তলপেট দিয়ে বেরিয়ে গেছে। ৯টা গুলি বুকের বামপাশের নিচ দিয়ে চক্রাকারে ঢুকেছে তবে বের হয়নি। বাম হাতের তর্জনীতে একটি গুলি লেগেছে এবং আঙ্গুলটি প্রায় ছিন্ন ও থেতলানো। দুই বাহুর উপরিভাগে আছে দুইটা ও আরেকটি সম্ভবত ডান হাতের তালুতে। দুই পায়ে ৪টি, দুটি হাটুর এবং ওপরে নিচে দুটি অর্থাৎ ১৮টি গুলি বঙ্গবন্ধুর শরীরে লাগে। মুখে বা বুকে কোনো গুলির চিহ্ন ছিলো না। বঙ্গবন্ধুর মরদেহ তাঁর জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়ায় হেলিকপ্টারে বহন করে সামরিক তত্ত্বাবধানে দাফন করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণে নৈতিকতা

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা

প্রকৃত মুসলমান সর্বক্ষণিক আল্লাহকে স্মরণ করেন। প্রতিটি কাজে আল্লাহর উপরে ভরসা করেন। নিজের শক্তি-সামর্থের অহংকার দেখায় না, বরং কোনো কাজ করার সময় আল্লাহর উপর ভরসা রেখে কাজ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন সময় মানুষের নিকট বলতেন আপনারা আমাকে দোয়া করবেন, আল্লাহ্

যেন আমাকে ঈমানের সঙ্গে রাখে। এটা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাঁর ভাষণে দেখা যায় তিনি লোকদেরকে বলতেন চলুন 'বিসমিল্লাহ' বলে আল্লাহর নামে অগ্রসর হই। ইনশাল্লাহ আমরা কামিয়াব হবো। তাছাড়া তাঁর বক্তৃতা ও ভাষণে তিনি অসংখ্যবার 'ইনশাল্লাহ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। কথা ও কাজে ইনশাল্লাহ শব্দের ব্যবহার ইসলাম ও মুসলমানদের সংস্কৃতি। যা আল্লাহ কুরআনে শিখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহতায়ালা আল কুরআনে এরশাদ করেন, তুমি কখনো কোনো বিষয়ে এ কথা বলো না যে আমি এটি আগামীকাল করব 'ইনশাল্লাহ' কথাটি না বলে।[২৩] এ সংক্রান্ত বঙ্গবন্ধুর কয়েকটি ভাষণ উল্লেখ করা হলো :

প্রথম জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশনের বঙ্গবন্ধু বলেন, আল্লাহর নামে, চলুন, আমরা অগ্রসর হই। 'বিসমিল্লাহ' বলে আল্লাহর নামে অগ্রসর হই। ইনশাল্লাহ আমরা কামিয়াব হবই। খোদা আমাদের সহায় আছেন। যদি সকলে মিলে আপনারা নতুন প্রাণে নতুন মন নিয়ে খোদাকে হাজির-নাজির করে, নিজের আত্মসংশোধন করে, আত্মশুদ্ধি করে, 'ইনশাল্লাহ্' বলে কাজে অগ্রসর হন; তাহলে জানবেন, বাংলার জনগণ আপনাদের সাথে আছে, বাংলার জনগণ আপনাদের পাশে আছে। জনগণকে আপনারা যা বলবেন, তারা তাই করবে। আপনাদের অগ্রসর হতে হবে। ইনশাল্লাহ্ আমরা কামিয়াব হবই।[২৪]

২৬ মার্চ ১৯৭৫ সালে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বলেন, ইনশাল্লাহ্ বেঁচে থাকলে আবার আসবো। আপনারা আমাকে দোয়া করবেন, আল্লাহ্ যেন ঈমানের সঙ্গে রাখে। আর একটা কথা বলি মনে রাখবেন যে, বাংলার মানুষকে আমি ভালোবাসি। আমি যেন আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে মরতে পারি। এর চেয়ে আমার কিছুই প্রাপ্য নাই, এর চেয়ে আমি আর কিছুই চাই না।[২৫] ৭ মার্চ ১৯৭১ সালে রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে তিনি বলেন, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল। এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।[২৬] যারা মুখে ইসলাম ও ঈমানের দাবি করে, কিন্তু অন্তরে ইসলামকে ঘৃণা করে এবং আল্লাহ ও রাসূলকে বিশ্বাস করে না তারা মোনাফেক। এরা মিথ্যাবাদী, প্রতারক, ভণ্ড ও দ্বিমুখী নীতি অবলম্বনকারী। এরা নিকৃষ্ট, জঘন্য, কপট, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। আল-কুরআনুল কারীমের বহুসংখ্যক আয়াত মোনাফেকদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। মুনাফিকের স্বভাব চারটি। ১. আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে; ২. কথা বললে মিথ্যা বলে; ৩. অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে; এবং ৪. বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল গালি দেয়।

মোনাফেকরা সমাজে বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। তারা মিথ্যার আশ্রয় নেয়। স্বার্থ অর্জনের জন্য তারা যেকোনো ধরনের মিথ্যা বলতে দ্বিধা করে না। আল্লাহ্তায়ালা বলেন, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. "নিশ্চয়ই মোনাফেকরা মিথ্যাবাদী।[২৭] আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনে তাদের শাস্তি ও অবস্থান সম্পর্কে বলেন,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ هُمْ نَصِيرًا.

নিশ্চয়ই মোনাফেকরা জাহান্নামের নিকৃষ্ট স্তরে অবস্থান করবে। আর তোমরা তাদের জন্য সাহায্যকারী কখনও পাবে না।[২৮] মোনাফেকদের সম্পর্কে অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أَخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا.

অভিশপ্ত অবস্থায় তাদের যেখানেই পাওয়া যাবে ধরা হবে এবং হত্যা করা হবে।[২৯] মোনাফেকরা ইসলামের প্রধান শত্রু। তারা সর্বদা অন্যের সাথে প্রতারণা করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোঁড়া মুসলমান ছিলেন না। কিন্তু তার কথা ও কাজে কখনও ভিন্নতা দেখা যায়নি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে দেওয়া তাঁর বেতার ভাষণ থেকেই তা বোঝা যায়। তিনি কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী আইন পাসের বিপক্ষে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে পাকিস্তান বেতার ও টেলিভিশনে দেওয়া ভাষণে বলেছিলেন,

আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে, আমরা ইসলামে বিশ্বাসী নই। এ কথার জবাবে আমার সুস্পষ্ট বক্তৃতা-লেবাস সর্বস্ব ইসলামে আমরা বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী ইনসাফের ইসলামে।[৩০]

চট্টগ্রামে রেডক্রস কর্মিদের উদ্দেশে দেয়া ভাষণে বলেন, 'আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি, মৃত্যু মানুষের একবারই হবে, দুইবার হয় না। কিন্তু বাংলার মানুষকে গোলাম করে এদের কাছে মাথা নত করতে আমি পারি না।[৩১] বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যে ইসলামের ব্যাপক প্রভাব ছিল। তিনি মুখে যা বলতেন অন্তরেও তা লালন করতেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে লিখেছেন,

আমি মুখে যা বলি, তা-ই বিশ্বাস করি। আমার পেটে আর মুখে এক কথা। আমি কথা চাবাই না, যা বিশ্বাস করি বলি। সেজন্য বিপদেও পড়তে হয়, এটি আমার স্বভাবের দোষও বলতে পারেন, গুণও বলতে পারেন।[৩২]

দেশপ্রেমিক

বঙ্গবন্ধু একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক ছিলেন। দেশের জন্য জীবন দিতে তিনি সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। মাতৃভূমির মাটি ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মাতৃভূমি ও জন্মস্থানের প্রতি মানুষের এ দুর্নিবার আকর্ষণ বা ভালোবাসা, ভালোলাগা, গভীর আবেগ-অনুভূতি ও মমত্ববোধকে বলে দেশপ্রেম। দেশের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করতে হলে স্বদেশপ্রেম অত্যাবশ্যক। যে ব্যক্তি দেশকে ভালোবাসে না, সে প্রকৃত ইমানদার নয়। মহানবী (সা.) মাতৃভূমির ভালোবাসাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করে তার অনুরূপ ভালোবাসা প্রার্থনা করেছেন। তিনি দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ! মদিনাকে আমাদের কাছে মক্কার মতো বা তার চেয়েও বেশি প্রিয় করে দাও।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৮৮৯)। বঙ্গবন্ধুর অসংখ্যা ভাষণে তাঁর দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে।

২৬ মার্চ ১৯৭৫ সালে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দেয়া ভাষণে তিনি বলেন, "আমাদের অভাব, ইনশাল্লাহ, হবে না। ভিক্ষুকের মতো হাত পাততে হবে না। আমি পাগল হয়ে যাই চিন্তা করে। এ বছর ১৯৭৫ সালে আমাকে ছয়কোটি মণ খাবার আনতে হবে। কী করে মানুষকে বাঁচাবো? কী করে অন্যান্য জিনিস কিনবো? অন্যান্য বন্ধুরাষ্ট্র সাহায্য দিচ্ছে বলে বেঁচে যাচ্ছি। কিন্তু এভাবে চলতে পারে না । আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে পায়ের উপর দাঁড়াতে হবে জাতি হিসেবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।"[৩৩] মানুষ যখন পৃথিবীর বিশাল ভূখণ্ডের কোনো এক অংশে জন্মলাভ করে, সেখানকার আলো-বাতাস গ্রহণ করে, সেখানে বেড়ে ওঠে, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার মাটি-মানুষের প্রতি অন্যরকম হৃদ্যতা ও আপনত্ব অনুভব করে। জন্মভূমির প্রতি মানুষের এই স্বভাবজাত আকর্ষণকে ইসলাম মূল্যায়ন করেছে।

পবিত্র মক্কা শরীফ থেকে বিদায়ের প্রাক্কালে রাসূলে কারীম (সা) বলেছিলেন, "ভূখণ্ড হিসেবে তুমি কতই না

উত্তম, আমার কাছে তুমি কতই না প্রিয়। যদি আমার স্বজাতি আমাকে বের করে না দিতো তবে কিছুতেই আমি অন্যত্র বসবাস করতাম না।"[৩৪] অন্য হাদীসে হযরত আনাস (রা.) বলেন, "আমি খেদমতের নিয়তে রাসূলের সাথে খায়বার অভিযানে গেলাম। অতঃপর যখন অভিযান শেষে নবী করীম (সা) ফিরে এলেন, উহুদ পাহাড় তাঁর দৃষ্টিগোচর হলে তিনি বললেন, এই পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে, আমরাও একে ভালোবাসি।"[৩৫]

মোটকথা, স্বদেশের প্রতি মানবমনের এই স্বভাবজাত অনুরাগকে ইসলাম সমর্থন করে। কিন্তু এই দেশপ্রেম যদি সীমা অতিক্রম করে আত্মঅহমিকা কিংবা আত্মকেন্দ্রিকতার জন্ম দেয়, অথবা যদি মানুষকে অন্ধত্ব ও উগ্রতার দিকে নিয়ে যায় এবং আল্লাহর সৃষ্টি অন্য কোনো দেশ বা ভূখণ্ডের বিরুদ্ধে অন্যায় বিদ্বেষের জন্ম দেয়, তাহলে ইসলাম কখনোই তা সমর্থন করে না।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ঘোষণা

ইসলামের দৃষ্টিতে চুরি, ডাকাতি, সুদ, ঘুষ, উৎকোচের মতো যেকোনো অবৈধ পন্থা অবলম্বন, দায়িত্বে অবহেলা, ক্ষমতা বা আইনের অপব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অবৈধ স্বার্থ হাসিল এবং দেশ, জাতি ও সাধারণ নাগরিকের অধিকার ও স্বার্থ হরণ করার নাম দুর্নীতি। দুর্নীতি বলতে নীতি বা আইন বিরুদ্ধ কাজকেই বুঝানো হয়।

Oxford Advanced learners dictionary তে বলা হয়েছে, 'Willing to use their power to do dishonest or illegal things in return for money or to get an advantage.'[৩৬] দুর্নীতি একটি সামাজিক অভিশাপ। কোনো জাতির ধ্বংসের পূর্বে তাদের মধ্যে দুর্নীতি মহামারীর মতো বিস্তার লাভ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে শাস্তি দেওয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে আল-কুরআনে বলেন,

ٱلَّذِينَ طَغَوْا۟ فِى ٱلْبِلَٰدِ ١١ فَأَكْثَرُوا۟ فِيهَا ٱلْفَسَادَ ١٢ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ١٣ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ١٤

'যারা দেশে সীমালঙ্ঘন করেছে এবং তাতে বড় বেশি দুর্নীতি করেছে, তখন তাদের ওপর তোমার প্রভু শাস্তির কশাঘাত হানলেন। নিশ্চয় তোমার রব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন।'[৩৭] বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রায় প্রতিটি ভাষণেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিনেও আবেগাপ্লুত হয়ে জাতির জনক বলেন, "আজ থেকে আমার অনুরোধ, আজ থেকে আমার আদেশ, আজ থেকে আমার হুকুম ভাই হিসেবে, নেতা হিসেবে নয়, প্রেসিডেন্ট হিসেবে নয়, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়, আমি তোমাদের ভাই, তোমরা আমার ভাই, এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না পায়।..... আমি চাই জমিতে যাও, ধান বোনাও, কর্মচারীদের বলে দেবার চাই, একজনও ঘুষ খাবেন না, ঘুষখোরদের আমি ক্ষমা করবো না।"[৩৮]

বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণগুলো থেকে জানা যায় যে, তিনি ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডকে কখনই পছন্দ করতেন না। তিনি দেশ থেকে অনৈসলামিক কার্যক্রম বন্ধের জন্য সোচ্চার ছিলেন। বিভিন্ন বক্তৃতা ও ভাষণে এ সম্পর্কিত যে বিষয়গুলো উল্লিখিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, দুর্নীতি, চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, সুদ, মদ, জুয়া, জুলুম, নির্যাতন, অন্যায়, ধর্ষণ, হত্যা, শোষণ, ভিক্ষাবৃত্তি ও আইন-শৃঙ্খলা।[৩৯]

বঙ্গবন্ধু দুর্নীতি ও দুর্নীতিবাজদের মতলব বুঝতে পেরেছিলেন বিধায় সর্বদা দুর্নীতি ও দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে তিনি ভাষণ দিয়েছেন। তিনি নিজে দুর্নীতি থেকে বিরত ছিলেন এবং মানুষকে দুর্নীতি থেকে বিরত রাখার জন্য চেষ্টা করেছেন। ইসলামের বিধান অনুযায়ী মানুষ নিজে সৎকাজ করলেই হবে না; বরং সমাজে সৎকাজের চর্চা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করতে হবে সকলকে। তাহলেই তিনি সফলকাম হবেন। আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন,

"আর তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। তারাই সফলকাম।"[৪০] বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে দুর্নীতির বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিয়ে বলেন,

১. সমাজের সর্বস্তর হতে দুর্নীতি উচ্ছেদ করতে হবে।[৪১]

২. দুর্নীতিবাজদের ধ্বংস করতে হবে, তা না হলে বাংলাকে বাঁচানো যাবে না কখনও।[৪২]

৩. আজ সেইজন্য আওয়ামী লীগ কর্মিদের কাছে আমার কথা যে, তোমাদের কর্তব্য রয়েছে। স্বাধীনতা এনেছ। এবার খোদাকে হাজের নাজের রেখে এই প্রতিজ্ঞা করে যেতে হবে যে, বাংলার মানুষকে সুখী করতে হবে আমার। বাংলার দুঃখী মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। দুর্নীতি উৎখাত করতে হবে। ... দুর্নীতি আমরা দেখব না, দুর্নীতি আমরা করব না, দুর্নীতি এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেব। ... বাংলার মাটিতে জনমত সৃষ্টি করতে হবে-দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর ও শোষকের বিরুদ্ধে। আমি বিশ্বাস করি, তাহলে বাংলাদেশ থেকে দুর্নীতি উঠে যাবে।[৪৩]

৪. আমি আপনাদের কাছে এই আশা করব যে, আপনারা হবেন আমার গর্বের বিষয়। বাংলাদেশের মানুষ যেন আপনাদের জন্য গর্ব অনুভব করতে পারে। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন, আপনারা যদি সৎ পথে থেকে ভালোভাবে কাজ করেন, যদি দুর্নীতির উর্ধ্বে থাকেন, তাহলে দুর্নীতি দমন করতে পারবেন। ... এবার আমি আপনাদের কাছে সাহায্য চাই। আপনারা একবার আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করুন, 'আমরা দুর্নীতির উর্ধ্বে থাকব।' প্রতিজ্ঞা করুন, 'আমরা দুর্নীতিবাজ খতম করব।'[৪৪]

৫. আজ কে দুর্নীতিবাজ? যে ফাঁকি দেয় সে দুর্নীতিবাজ। যে ঘুষ খায় সে দুর্নীতিবাজ। যে স্মাগলিং করে সে দুর্নীতিবাজ। যে ব্লাক মার্কেটিং করে সে দুর্নীতিবাজ। যে হোর্ড করে সে দুর্নীতিবাজ। যারা কর্তব্য পালন করে না তারা দুর্নীতিবাজ। যারা বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে তারাও দুর্নীতিবাজ তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে।[৪৫]

৬. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, মুখ-রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা করা হবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি পদাধিকারী ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়ের আয় ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ লওয়া হবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে না পারলে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।[৪৬]

সুদ ও ঘুষের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠ

ঘুষ একটি জঘন্যতম অপরাধ। ঘুষের প্রতিক্রিয়া ও বিষক্রিয়া সমাজকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে এবং সমাজকে কলুষিত ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ঘুষের কুফল বা অপকারিতা বহুসংখ্যক। এর পরিণাম খুবই খারাপ। ঘুষ

লেন-দেনের মাধ্যমে অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। ঘুষ গ্রহীতাকে সকলে ঘৃণা করে। ঘুষ গ্রহণ এবং দেওয়া দুটিই পাপ কাজ। ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়ই সমান অপরাধে অপরাধী। তাই এদের জীবন অভিশপ্ত।

ঘুষ গ্রহীতা ও দাতার ওপর আল্লাহ্ তা'আলার অভিশাপ বর্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيْ وَالرَّائِشِ

'রাসূলুল্লাহ (স.) ঘুষ গ্রহণকারী এবং ঘুষদাতা উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনকারীদেরকে অভিসম্পাত করেছেন।'[৪৭]

ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়ই জাহান্নামী। রাসূলুল্লাহ (স.) তাদের সম্পর্কে বলেন,

لعنة الله عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي.

'ঘুষখোর ও ঘুষদাতার ওপর আল্লাহর অভিশাপ।'[৪৮]

ইসলাম ঘুষ প্রথাকে হারাম করেছে এবং চিরতরে নিষিদ্ধ করেছে। কুরআন ও হাদীসে ঘুষ আদান প্রদান না করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ঘুষের সম্পদকে হারাম ও অপবিত্র ঘোষণা করেছেন। মুমিনগণের দায়িত্ব হলো এ নিষিদ্ধ অপবিত্র কাজে অংশগ্রহণ না করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُل لا يَسْتَوِي الخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الحبيب فَاتَّقُوا اللهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ.

'বলুন মুহাম্মাদ (স.)! হারাম ও অপবিত্র জীবিকা এবং পবিত্র জীবিকা সমান নয়। যদিও হারামের আধিক্য তোমাদের বিস্মিত করে। কাজেই হে বুদ্ধিমানগণ; আল্লাহকে ভয় করো।'[৪৯] ইসলাম ঘুষকে মানুষের পার্থিব অসম্মান ও পরকালীন শাস্তির ঘোষণা দিয়ে তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেছে। এরপরও যদি কেউ ঘুষ লেন-দেন করে থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। যে সমাজে এর ব্যাপকতা হয় সে সমাজ জুলুমে জর্জরিত হতে বাধ্য হয় এবং তার ধ্বংস অনিবার্য।

১১ জানুয়ারি ১৯৭৫ সালে কুমিল্লা সেনানিবাসে অস্থায়ী বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে বঙ্গবন্ধু বলেন, "এই বাংলার মাটি থেকে এই দুর্নীতিবাজ, এই ঘুষখোর, এই মুনাফাখোরী এই চোরাচালানকারীদের নির্মূল করতে হবে। আমিও প্রতিজ্ঞা নিয়েছি, 'তোমরাও প্রতিজ্ঞা নাও, বাংলার জনগণও প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করো। আর না, অধৈর্য, সীমা হারিয়ে ফেলেছি। এই জন্য জীবনের যৌবন নষ্ট করি নাই। এই জন্য শহীদরা রক্ত দিয়ে যায় নাই। কয়েকটি চোরাকারবারি, মুনাফাখোর, ঘুষখোর দেশের সম্পদ বাইরে বাইর করে নিয়ে আসে, মানুষকে না খাইয়া মারে। উৎখাত করতে হবে বাংলার বুকের থেকে এদের। দেখি কত দূর তারা টিকতে পারে। চোরের শক্তি বেশি না ঈমানদারের শক্তি বেশি, সেটাই আজ প্রমাণ হয়ে যাবে।"[৫০]

বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "ইনশাআল্লাহ সোনার বাংলা আবার জাগবে, যদি শোষণহীন সমাজ গড়তে পারি। তবে আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা প্রয়োজন। আপনাদের কাছে আমার আরেকটা অনুরোধ হলো যে, দুর্নীতি ও ঘুষের বিরুদ্ধে আপনারা আন্দোলন করতে রাজি আছেন কিনা? দুর্নীতি আর ঘুষ, রাজি আছেন? হ্যাঁ, খোদা হাফেজ জয় বাংলা।"[৫১] ১৯৭৪ সালে আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আজ সেইজন্য আওয়ামী লীগ কর্মিদের কাছে আমার কথা যে, তোমাদের কর্তব্য রয়েছে। স্বাধীনতা এনেছ। এবার

খোদাকে হাজের নাজের রেখে এই প্রতিজ্ঞা করে যেতে হবে যে, বাংলার মানুষকে সুখী করতে হবে আমার। বাংলার দুঃখী মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। দুর্নীতি উৎখাত করতে হবে। ... দুর্নীতি আমরা দেখব না, দুর্নীতি আমরা করব না, দুর্নীতি এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেবা। তোমরা পারবা না এদেশের মানুষকে ভালোবাসার? আমরা দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করব। এ দেশের মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে চায়, আমরা শান্তি দেব। পারবা না তোমরা এ কাজ করতে? আমার কাছে। না পার আমাকে বিদায় দাও। আমি কিছু চাই না তোমাদের কাছ থেকে। ... বাংলার মাটিতে জনমত সৃষ্টি করতে হবে- দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর ও শোষকের বিরুদ্ধে। আমি বিশ্বাস করি, তাহলে বাংলাদেশ থেকে দুর্নীতি উঠে যাবে।[৫২]

জুয়া, হাউজি ও বাজিধরা বন্ধকরণ

জুয়ার ইতিহাস বেশ প্রাচীন। বলা চলে নবী করীম (স.)-এর আগমনের সময় মক্কায় নানা ধরনের জুয়ার প্রচলন ছিল। বর্তমানে প্রাচীন পদ্ধতি ছাড়াও জুয়ার ক্ষেত্রে আরও বহু নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন হাউজি, ক্যাসিনো, টাকা বাজি রেখে ঘোড়দৌড় ও তাস খেলা ইত্যাদি। ইসলামের দৃষ্টিতে এগুলো সম্পূর্ণ অবৈধ এবং জুয়ার মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ হারাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ.

'হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদি ও ভাগ্য নির্ণয়ক সব ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো, তাহলেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ আদায়ে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না।[৫৩] পাকিস্তানি আমলে ঢাকার বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের নাম ছিল রেসকোর্স ময়দান। সেখানে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার নামে চলত জুয়া, হাউজি ও বাজিধরা প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বাজিতে হেরে অনেক মানুষ সর্বশান্ত হয়ে যেত। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা বন্ধ করেন এবং রেসকোর্স ময়দানের নাম পরিবর্তন করে রাখেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। বঙ্গবন্ধু ইসলামকে ভালোবাসতেন। ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় দেওয়া বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি বলেন, "আমাদের দেশে পাকিস্তান আমলে ইসলামবিরোধী বহু কাজ হয়েছে। রেসের নামে জুয়া খেলা রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত ছিল। আমি ক্ষমতায় এসে প্রথমেই ঘোড়দৌড় বন্ধ করে দিয়েছি, পুলিশকে তৎপর হতে বলেছি, শহরের আনাচে-কানাচে জুয়াড়িদের আড্ডা ভেঙ্গে দিয়েছি। ... আমি মুসলমান। আমি ইসলামকে ভালোবাসি। আপনারা আমাকে সাহায্য করুন, দেখবেন এদেশে ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড কখনই হবে না।"[৫৪] প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৬ এপ্রিল, ১৯৭২ ঢাকায় একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বলেন, "ঘোড়দৌড় আর মদ্যপানে কোনও জাতি বা দেশের কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। তাই বাংলাদেশে এসব সামাজিক অনাচারের স্থান হবে না।"[৫৫]

চুরি ও ডাকাতির বিরুদ্ধে হুশিয়ারী

চুরি একটি নিন্দনীয় ও অত্যন্ত জঘন্য ধরনের অপরাধ। যার মাধ্যমে সমাজে আরও নতুন নতুন অপরাধ সৃষ্টি হয়। চোর শুধু তার কাজ চুরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে না বরং সে চুরি, ছিনতাই, অপহরণ, খুন এবং মাঝে মাঝে সম্ভ্রমহানির ঘটনাও ঘটায়। চুরির কঠোর শাস্তির বিধান করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

والسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا من الله.

'আর পুরুষ চোর ও নারী চোর উভয়ের হাত কেটে দাও। তারা যা করেছে এ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।'[৫৬] ডাকাতি সম্পদ হরণ ও সম্মান-ইজ্জত বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। তাই এর শাস্তিও কঠোর। ইসলামও এ অপরাধের জন্য অত্যন্ত কঠিন শাস্তির বিধান রেখেছে। এ রকম ব্যক্তি বা গোষ্ঠিকে মুসলমান হিসেবে গণ্য করে না। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন,

-مَنْ حَمَلَ السَّلَاحَ عَلَيْنَا فَلَيْسَ مِنَّا

'যে ব্যক্তি আমাদের প্রতি অস্ত্র ধারণ করবে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।'[৫৭]

বঙ্গবন্ধু এমন একজন মানুষ ছিলেন, যিনি সর্বদা চুরি, ডাকাতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে দেশের মানুষ এ অপরাধগুলো করে তাদের উন্নতি হয় না, তাদের অধঃপতন নিশ্চিত। দেশের উন্নতিকল্পে এগুলো সর্বদা বর্জনীয়। কারণ ইসলামে এ বিষয়গুলো নিষিদ্ধের সাথে সাথে শাস্তির বিধানও ঘোষণা করেছে। তাই তো বঙ্গবন্ধু বহু সংখ্যক ভাষণে এ বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন। তাঁর সোচ্চার কণ্ঠে তা সর্বদা প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

১৯৭৫ সালে বঙ্গভবনে নবনিযুক্ত জেলা গভর্নর প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে- এটা ভালো করে জানবেন।'[৫৮]

১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে বঙ্গবন্ধু বলেন, "একটা কথা আজ থেকে বাংলায় যেন আর চুরি ডাকাতি না হয়। বাংলায় যেন আর লুটতরাজ না হয়। বাংলায় যারা অন্য লোক আছে অন্য দেশের লোক, পশ্চিম পাকিস্তানের লোক বাংলায় কথা বলে না তাদের বলছি তোমরা বাঙালি হয়ে যাও। আর আমি আমার ভাইদের বলছি তাদের উপর হাত তুলো না আমরা মানুষ, মানুষকে ভালোবাসি।"[৫৯]

চোরাকারবারি ও কালোবাজারিরা দেশের শত্রু

চোরাচালান একটি বেআইনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পদ্ধতি। প্রতিটি দেশের সীমান্ত দিয়ে পণ্য পারাপারে যেমন নির্দিষ্ট আইন রয়েছে তেমন নির্দিষ্ট রুটও রয়েছে। সীমান্তের আইন, নির্দ্দিষ্ট পথ এবং শুল্কঘাঁটি বাদ দিয়ে পণ্য আমদানী বা রপ্তানীকারিকে চোরাকারবারি বলে।[৬০] এ কথা সর্বজনস্বীকৃত, চোরাকারবার যেমনভাবে দেশের অর্থনৈতিক ধ্বংস ডেকে আনে কালোবাজারিও তেমনি সামাজিক অবক্ষয়ের গতি তরান্বিত করে। নিষিদ্ধ পণ্য ও সেবা উৎপাদন ও বিতরণের সাথে জড়িত যে কাউকেই কালোবাজারি বলা হয়। ইসলামে কালোবাজারি ও চোরাকারবারিকে ধোঁকাবাজি বা প্রতারণা বলা হয় যা সম্পূর্ণ হারাম।

বঙ্গবন্ধু চোরাকারবারি (স্মাগলার), কালোবাজারি, মুনাফাবাজদের দেশের প্রধান শত্রু হিসেবে সাব্যস্ত করেন। ১৯৭৪ সালে ঢাকায় জাতীয় দিবসে তিনি বলেন, "আমাদের নতুন প্রতিরোধ সংগ্রামে সর্বশেষ ও সর্ব প্রধান শত্রু চোরাকারবারি (স্মাগলার), কালোবাজারি, মুনাফাবাজ ও ঘুষখোরের দল। এদের কোনো জাত নেই, নেই কোনো দেশ। এইসব নরপশুদের উৎখাতে আমি আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা চাই।"[৬১]

১৯৭৫ সালে জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু বলেন, "যারা আজকে আমার মাল বিদেশে চালান দেয়, চোরাকারবারি করে, যারা দুর্নীতি করে, এদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে হবে। ..... মানুষকে বাঁচাও মানুষের দুঃখ দূর করো। আর দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, চোরাকারবারিদের উৎখাত করো। আমাদের দুর্নীতি, ঘুষ, চোরাকারকারি, মুনাফাখোরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে এবং সংগ্রাম করতে হবে।"[৬২]

১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে স্মৃতিচারণ করে বলেন, "আজ মুনাফাখোর, আড়তদার, চোরাকারবারি সাবধান হয়ে যাও। ভবিষ্যতে যদি জিনিসের দাম আর বাড়ে, আমি তোমাদের শেষ করে দেব, কারফিউ করে দেব। আর দরকার যদি হয়, আইন পাস করব। যদি চোরাকারবারি বা আড়তদাররা আমার কথা না শোনে, তাদের ছাড়ব না।"[৬৩]

নেশা ও নেশাজাতদ্রব্য নিষিদ্ধকরণ

ইসলাম মদ তথা নেশাজাত দ্রব্য সেবন বা এর সর্বপ্রকার ব্যবহার ও সম্পর্ক স্থাপনকে সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, لا تشربُ الخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ. –'তোমরা মদপান করবে না, কেননা তা সকল অপকর্ম ও অনিষ্টের চাবি।'[৬৪] ইসলাম নেশার মরণ ছোবল থেকে মানবসমাজকে রক্ষার জন্য সর্বপ্রকার নেশা ও নেশাজাত দ্রব্যকেই নিষেধ করেছে এবং এগুলোর ব্যবসায়ী বা এগুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিসম্পাত করা হয়েছে। হযরত ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মদের উপর দশ প্রকারের লানত করা হয়েছে; স্বয়ং মদ (অভিশপ্ত), তার উৎপাদনকারী, যে তা উৎপাদন করায়, তার বিক্রেতা, তার ক্রেতা, তার বহনকারী, তার যার জন্য বহন করা হয়, এর মূল্য ভক্ষণকারী, তা পানকারী ও তা পরিবেশনকারী (এরা সবাই অভিশপ্ত) ।"[৬৫]

মদ্যপানের ব্যাপারে নিজের অবস্থান সম্পর্কে ১৯৭৩ সালের ৩০ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আলিয়া ঢাকার মাঠে ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন বলেন, "পাকিস্তানি শাসকরা ইসলামের নামে গণহত্যা, লুট, অগ্নিসংযোগ ও নারীর সতীত্বহানি করেছে। শোষণের হাতিয়ার হিসেবে তারা ধর্মকে ব্যবহার করেছে। তিনি বলেন যে, তিনি মুসলমান বলে গর্বিত। ইসলামের নামে পাকিস্তানি শাসকদের কুকীর্তির উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, তাঁর সরকার সকল রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে মদ্যপান নিষিদ্ধ করেছেন। দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা সত্ত্বেও ৬ হাজার লোককে হজ্ব পালন করতে পাঠিয়েছেন।"[৬৬] প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তানের ঔপনিবেশিকবাদের তথাকথিত ইসলামি শাসনামলে মদ্যপান যথেচ্ছাচারভাবে চলেছে। এসব পাপাচার বহু পরিবারে অশান্তি ডেকে এনেছে। স্বাধীন বাংলাদেশে এসব পাপাচার বরদাস্ত করা হবে না। ১৬ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের সামনে ঘোড়দৌড় শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু এসব কথা বলেন।[৬৭]

ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদ

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদাররা জেনোসাইড বা জাতিগত নিধন চালিয়েছে বাংলাদেশে। ৩০ লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে বিশ্ব ইতিহাসের এ বর্বরতম হত্যাকাণ্ড। ইসলামে মানুষ হত্যাকে জঘন্য অপরাধ বা কবিরা গুনাহ বলা হয়েছে। যারা বিনা বিচারে মানুষ হত্যা করে কুরআন-হাদিসের দৃষ্টিতে তারা জঘন্য অপরাধী। গণহত্যা আরও বড় অপরাধ। নারীর সম্ভ্রমহানিও কবিরা গুনাহ। আল কোরআনে মানুষ হত্যাকে গোটা মানবজাতিকে হত্যার মতো জঘন্য অপরাধ আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন, 'যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করল।'[৬৮] কোরআনে বলা হয়েছে, 'হে ইমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কিসাস গ্রহণ বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।'[৬৯]

বঙ্গবন্ধু ইসলামের নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর মধ্যে হত্যা, ধর্ষণ, অন্যায়-অত্যাচারে বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় ভাষণ দেন। তন্মধ্যে কয়েকটি ভাষণ উল্লেখ করা হলো[৭০],

১. বাংলাদেশের জনগণকে হত্যা, ধর্ষণ ও সম্পত্তি ধ্বংসের জন্যে দায়ী ব্যক্তিবর্গ ও তাদের দালালদের উপযুক্ত শাস্তি সরকার নিশ্চয়ই দিবে।[৭১]

২. বড় দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, আজকে আপনি জানেন, এই সংসদের চারজন সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে। গাজী ফজলুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে। নূরুল হককে হত্যা করা হয়েছে। মোতাহার মাস্টারকে হত্যা করা হয়েছে। এমনকি, আমরা যা কোনোদিন দেশে শুনি নাই ঈদের নামাজের জামাতে এই সংসদের একজন সদস্যকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ....২৫ বছর পর্যন্ত এই বাংলাদেশে পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যারা কারা-নির্যাতন, অত্যাচার-অবিচার সহ্য করেছে, তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে।[৭২]

৩. যেসব লোক পাকিস্তানি সৈন্যদের সমর্থন করেছে, আমাদের লোকদের হত্যা করতে সাহায্য করেছে তাদের ক্ষমা করা হবে না। সঠিক বিচারের মাধ্যমে তাদের শাস্তি দেয়া হবে।[৭৩]

ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত প্রদান

দুস্থ মানবতার সেবায় দান করার রীতি ইসলামে চালু আছে। তবে ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে ইসলাম অনুমোদন দেয়নি। বরং একে বার বার নিরুৎসাহিত করেছে যা, নিষেধের পর্যায় পৌঁছে গিয়েছে। ব্যক্তি জীবনে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বনবী (সা) উৎসাহিত করেছেন এবং ভিক্ষাবৃত্তিকে তিনি নিন্দা করেছেন ও নিরুৎসাহিত করেছেন। এ মর্মে যুবাইর ইবনে 'আউয়াম (রা) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূল (সা) বলেন,

أَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكم فَيَحْتَطِبَ على ظَهرِهِ ، فَيَتَصَدَّقَ مِنهُ ، و يَسْتَغْنِي به عن النَّاس ، خَيرٌ له من أنْ يَسأَلَ رَجُلًا ، أعطاهُ أو مَنَعهُ ، ذٰلكَ-

'তোমাদের কেউ তার রশি নিয়ে চলে যাক, পিঠে কাঠের বোঝা বহন করে এনে বিক্রয় করুক এবং তার চেহারাকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচিয়ে রাখুক এটা তার জন্য মানুষের নিকট ভিক্ষা করা, চাই তাকে দান করুক বা না করুক তার চাইতে উত্তম।'[৭৪] যে মানুষ ভিক্ষা করে তার যেমন ইজ্জত থাকে না, যে জাতি ভিক্ষা করে, তাদেরও তেমনি ইজ্জত থাকে না। তাইতো বঙ্গবন্ধু ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে যেন দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে না হয়

সে সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে বলেন,

১. ভিক্ষুকের জাতির নেতৃত্ব করতে আমি চাই না। আমি চাই আমার দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হোক।[৭৫]

২. আমরা কোথায় পাব বৈদেশিক মুদ্রা? ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে হবে? না। আমাদের করতে হবে, স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। যে মানুষ ভিক্ষা করে তার যেমন ইজ্জত থাকে না, যে জাতি ভিক্ষা করে, তাদেরও তেমনি ইজ্জত থাকে না। ভিক্ষুক জাতির নেতৃত্ব করতে আমি চাই না। আমি চাই আমার দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হোক এবং সেজন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। শৃঙ্খলা আনতে হবে এবং শৃঙ্খলা দেশের জন্য অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।[৭৬] ৩. ভিক্ষা করে কোনো জাতি কোনোদিন সম্মান নিয়ে বাস করতে পারে না। আমি আমার সাড়ে সাত কোটি লোককে সারা জীবনের জন্য ভিক্ষুকের জাতি করতে চাই না।[৭৭]

উপসংহার

বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম অবিচ্ছেদ্য। হাজার বছর ধরে বাঙালি নানা চরাই-উৎরাই পেরিয়ে প্রথম একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে অকপটে নিজেদের ভাষায় কথা বলে নিজেদের সংস্কৃতিতে বসবাসের সুযোগ পায় শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব ও অনুপ্রেরণায়। তাঁর আপোষহীন সাহসী সংগ্রামী জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে জেল, জুলুম আর অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে। কিন্তু এমন দুর্গম পথ অতিক্রম করেছেন শুধুমাত্র বাঙালির চিরমুক্তির জন্য। শেখ মুজিব এমন এক নেতা ছিলেন যিনি বাঙালিকে দিয়েছিলেন একটি ভূখণ্ড, একটি পতাকা, একটি মানচিত্র। ইসলামে অনেক কিছু নিষেধ থাকলেও পাকিস্তানে তা মানা হতো না। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেও ইসলামে নিষিদ্ধ ও অনৈতিক বিষয়গুলো বন্ধ করেছিলেন। মদ, জুয়া, যাত্রা, হাউজি, উলঙ্গ নৃত্য, রেসকোর্স ময়দানে ঘোড়াদৌড়; এগুলো মুসলিম দেশ হিসেবে পাকিস্তান বন্ধ করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেছেন, ধর্মহীনতার কথা বলেননি; বরং ধর্মে যেগুলো নিষেধ আছে সেগুলো তিনি বন্ধ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষণগুলিতে তিনি বলেছেন, দুর্নীতি, দুর্নীতিবাজ, ঘুষ, ঘুষখোর, চুরি, চোরাকারবারি, ডাকাতি, জুয়া, মদ, মোনাফেকী, মুনাফাখোরী ইত্যাদি উচ্ছেদ করতে হবে, বন্ধ করতে হবে, জনমত সৃষ্টি করতে হবে তা না হলে বাংলাকে বাঁচানো যাবে না। বঙ্গবন্ধু নীতি-নৈতিকতার বিষয়ে ছিলেন আপোষহীন। তিনি ইসলামে নিষিদ্ধ তথা অনৈতিক বিষয়ের প্রতি সর্বদা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন এবং প্রতিরোধ করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

টীকা ও তথ্য নির্দেশিকা

১. উইকিপিডিয়া, স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, নৈতিকতার সংজ্ঞা, *স্ট্যানফোর্ড এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ফিলোসফি*, সংগৃহীত ২২ মার্চ ২০১৪

২. ড. মুহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান, *আখলাক ও নৈতিকতা: ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ২১

৩. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের ধারণা*, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ২০০৭,পৃ. ২

৪. মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন তুসী, *দুর্নীতি ও নৈতিক মূল্যবোধ*, পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ২২

৫. থমাস প্যাট্রিক হিউজ, ইসলামের অভিধান, পৃ. ৫৩৪

৬. *Encyclopedia of Religion* (New York: Macmillan Publishing Company, 1987) AD), P. 92

৭. *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, first published April 17, 2002 AD. Substantive revision Feb 8, 2016, Online: https://plato.stanford.edu/entries/morality-definition/.

৮. ড. মুহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৯. গোপালগঞ্জ : বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলের ঢাকা বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল ও দক্ষিণ পশ্চিমাংশে মধুমতি নদী বিধৌত একটি জেলা। এ জেলার পূর্বে মাদারিপুর ও বরিশাল জেলা, দক্ষিণে পিরোজপুর, বাগেরহাট ও খুলনা জেলা, পশ্চিমে নড়াইল ও মাগুরা জেলা এবং উত্তরে ফরিদপুর জেলা অবস্থিত। এর আয়তন ১৪৮৯ বর্গ কিলোমিটার। বাংলাপিডিয়া, ৩য় খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৪০৯/ মার্চ ২০০৯), পৃ. ১৯৪-১৯৫: https://bn.wikipedia.org/wiki. গোপালগঞ্জ জেলা

১০. টুঙ্গিপাড়া : টুঙ্গিপাড়া গ্রামটি প্রথমে কোটালিপাড়া ও পরে গোপালগঞ্জ থানার অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বাধীনতার পর টুঙ্গিপাড়াকে পৃথক থানা ঘোষণা করা হয়। এর আয়তন ১২৭.২৫ বর্গ কিলোমিটার

দ্র. সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ, ১৪২৫ ব/২০১৮, পৃ. ৩৪; মুহাম্মদ সাইদুর রহমান, *বঙ্গবন্ধুর বাল্য-কিশোর ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৫; সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাপিডিয়া*, ৪র্থ খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৪০৯/ মার্চ ২০০৯, পৃ. ১২৮: https://bn.wikipedia.org/wiki/ টুঙ্গিপাড়া উপজেলা

১১. শেখ হাসিনা, *শেখ মুজিব আমার পিতা*, অগ্রপথিক, জাতীয় শোক দিবস সংখ্যা, একত্রিশ বর্ষ ৮ম সংখ্যা, আগস্ট ২০১৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, পৃ. ২৮

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

১৩. ভবেশ রায়, *বঙ্গবন্ধুর জীবনকথা*, এশিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১৫

১৪. স্মৃতির মণিকোঠায় বঙ্গবন্ধু, শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ, পৃ. ৫৭; Ziaur Rahman, Speech of Sheikh Mujib in Pakistan Parliament (1955 1956 (Dhaka) Hakkani Publishers, First Edition). p. ৩২৪

১৫. মোনায়েম সরকার সম্পাদিত, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবন ও রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৮

১৬. রফিকুজ্জামান হুমায়ন, *বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম*, জনতা প্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৪, পৃ. ১৫

১৭. ভবেশ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

১৮. এম আর আখতার মুকুল, *মহাপুরুষ*, অনন্যা প্রকাশ, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১৭, পৃ. ২৫; মোনায়েম সরকার সম্পাদিত, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবন ও রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৯; ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবন ও ইতিহাস*, অনধিক ৩৪ বর্ষ সংখ্যা ৩ মার্চ ২০১১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, পৃ. ৮

১৯. লোরেন জেনকিন্স, *নিউজউইক* ৫ এপ্রিল ১৯৭১

২০. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *ইসলাম প্রসারে বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ৬২

২১. সিরাজ উদদীন আহমেদ, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, পৃ. ১৯৩

২২. পূর্বোক্ত, পৃ.৭৪৫-৭৪৮

২৩. সূরা আল কাহাফ, ১৮ঃ ২৩-২৪

২৪. ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ সালে প্রথম জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশনের দ্বিতীয় বৈঠকে দেয়া ভাষণ

২৫. ২৬ মার্চ ১৯৭৫ সালে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দেয়া ভাষণ

২৬. ৭ মার্চ ১৯৭১ সালে রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ

২৭. সূরা আল-মুনাফিকুন, ১:৬৩

২৮. সূরা আন-নিসা, ৪:১৪৫

২৯. সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৬১

৩০. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে পাকিস্তান বেতার ও টেলিভিশনে দেওয়া ভাষণ; মওলানা আবদুল আউয়াল, *বঙ্গবন্ধু ও ইসলামি মূল্যবোধ*, পৃ. ১২

৩১. ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে চট্টগ্রামে রেডক্রস কর্মিদের উদ্দেশে দেয়া ভাষণ। শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২১৭

৩২. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২১৮

৩৩. ২৬ মার্চ ১৯৭৫ সালে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দেয়া ভাষণ।

৩৪. *জামে তিরমিযী*, হাদীস নং ৩৯২৬

৩৫. *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং ২৮৮৯

36. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford: Oxford University Press, 9th Edition, 2018AD

৩৭. *সূরা আল-ফাজর*, আয়াত: ১১-১৪

৩৮. ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে সোহরাওয়ার্দী ময়দানে দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণ

৩৯. প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান, *বঙ্গবন্ধুর ভাষণে ইসলামি ভাবধারা*, বিআইআইটিসি পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০২১, পৃ. ১৫২

৪০. *সূরা আলে-ইমরান* ৩: ১০৪

৪১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ মার্চ ১৯৭৫

৪২. ১১ নভেম্বর ১৯৭৩ সালে ঢাকায় দেয়া বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

৪৩. ১৮ জানুয়ারি ১৯৭৪ সালে আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর দেয়া উদ্বোধনী ভাষণ

৪৪. ১৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ সালে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের প্রথম পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর দেয়া উদ্বোধনী ভাষণ

৪৫. ২৫ মার্চ ১৯৭৫ সালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনসভায় দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচিতে দেয়া বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

৪৬. যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা, দফা নং ১৩; আনু মাহমুদ, গণপরিষদ ও সংসদে বঙ্গবন্ধু, পরিশিষ্ট-খ, পৃ.২৪১

৪৭. *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ২২৩৯৯; শুআবুল ঈমান, হাদীস নং ৫১১৫

৪৮. *সুনানু ইবন মাজাহ*, হাদীস নং ২৩১৩; *সুনানু আবী দাউদ*, বাবু কারাহিয়াতির-রাশওয়াতি, হাদীস নং ৩৫৮০২ *জামিউত-তিরমিয*, হাদীস নং ১৩৩৬, ১৩৩৭, *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ৬৭৭৮; *সহীহ ইবন হিব্বান*, হাদীস নং ৫০৭৬

৪৯. *সূরা আল-মায়িদা*, ৫ : ১০০

৫০. ১১ জানুয়ারি ১৯৭৫ সালে কুমিল্লা সেনানিবাসে অস্থায়ী বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে দেয়া ভাষণ

৫১. ৫ এপ্রিল ১৯৭২ সালে ময়মনসিংহ সার্কিট হাউজের জনসভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেয়া ভাষণ

৫২. ১৮ জানুয়ারি ১৯৭৪ সালে আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর দেয়া উদ্বোধনী ভাষণ

৫৩. *সূরা আল-মায়িদা*, ৫ : ১০-১১

৫৪. ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ, সৈয়দ আলী আহসান, *বঙ্গবন্ধু যে রকম দেখেছি*, পৃ. ১৬

৫৫. ১৬ এপ্রিল, ২০২০, *বাংলা ট্রিবিউন*

৫৬. *সূরা আল-মায়িদা*, ৫ : ৩৮

৫৭. *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং 8009; শু*আবুল ঈমান*, হাদীস নং ৫১০৫

৫৮. ১১ জুলাই ১৯৭৫ বঙ্গভবনে নবনিযুক্ত জেলা গভর্নর প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর দেয়া ভাষণ

৫৯. ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর দেয়া ভাষণ

৬০. *উইকিপিডিয়া*

৬১. ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৪ সালে ঢাকায় জাতীয় দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর দেয়া ভাষণ

৬২. ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ সালে জাতীয় সংসদে দেয়া বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

৬৩. ৭ জুন ১৯৭২ সালে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে স্মৃতিচারণ করে এক বক্তৃতা প্রদান করেন

৬৪. *সুনানু ইবন মাজাহ*, হাদীস নং ৩৩৬২

৬৫. *জামিউত-তিরিমিযী*, হাদীস নং ১২১৬; *সুনানু ইবন মাজাহ*, হাদীস নং ৩৩৭১

৬৬. *দৈনিক সংবাদ*, ৩১ মার্চ, ১৯৭৩

৬৭. ১৬ এপ্রিল, ২০২০, *বাংলা ট্রিবিউন*

৬৮. *সুরা মায়েদা*, আয়াত ৩২

৬৯. *সুরা বাকারা*, আয়াত ১৭৮। কিসাস হচ্ছে কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে এর শাস্তিস্বরূপ ঘাতককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা।

৭০. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ.১১৪-১১৭

৭১. ১৫ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে দলীয় কর্মিদের উদ্দেশে দেয়া বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

৭২. ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ সালে প্রথম জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশনের দ্বিতীয় বৈঠকে দেয়া বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

৭৩. ৯ এপ্রিল ১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দেয়া ভাষণ

৭৪. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আর কুশায়রী আন-নিশাপুরী, *মুসলিম শরীফ*, হাদিস নং- ১০৪২

৭৫. ৫ এপ্রিল ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ বেতার 'দেশ আমার মাটি আমার' অনুষ্ঠানে বক্তৃতা ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ সালে জাতীয় সংসদে দেয়া ভাষণ

৭৬. ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ সালে প্রথম জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশনের দ্বিতীয় বৈঠকে দেয়া ভাষণ

৭৭. ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সালে ভৈরবে বঙ্গবন্ধুর দেয়া ভাষণ

BL College Journal
Crossref
https://doi.org/10.62106/blc2024v6i1b4
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -VI, Issue-I, June 2024
Pp. 46-61

মানবী চেতনার ধারায় পশ্চিমবঙ্গের আটের দশকের মেয়েদের কবিতা

রিয়া ঢোল

সারসংক্ষেপ

পিতৃতান্ত্রিকতা কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থা নয়, একই বা ভিন্ন সময়কালে, একই বা ভিন্ন দেশকালে তার রং বদলায় মাত্র। আটের দশকের কবিরা একদিকে যেমন বঙ্গীয় কবিতার মানবীচৈতন্যের ধারাটিকে আত্মস্থ করেছেন, অন্যদিকে তেমনই পাশ্চাত্য লালিত নারীবাদী কার্যকলাপ ও তার তাত্ত্বিকতায় নিজেদের মননকে জারিত করেছেন। তারই সূত্রে এই দশকের মল্লিকা সেনগুপ্ত, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, রূপা দাশগুপ্ত, সুতপা সেনগুপ্ত, অঞ্জলি দাশ, ঈশিতা ভাদুড়ি প্রমুখের মতো একঝাঁক তরুণী উঠে এসেছেন নারীর আত্মা, বয়ান ও স্বরের বিস্ফোরক প্রকাশ নিয়ে। এই স্পর্ধিত প্রকাশ আটের কবিতাকে শুধু স্বতন্ত্র মাত্রাই দেয়নি, হয়ে উঠেছে একটি বিশিষ্ট বিষয়।

রিয়া ঢোল
গবেষক
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা, ভারত
e-mail : ria.dhole2012@gmail.com

মূলশব্দ

আটের দশক, মানবী চেতনা, পিতৃতান্ত্রিকতা, দাম্পত্য প্রেম, যৌনতার ক্রীড়া উপকরণ, ব্যভিচার

ভূমিকা

পিতৃতান্ত্রিকতা সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপ্ত এমন এক জটিল ব্যবস্থা, যা গড়ে উঠেছে প্রচলিত পুরুষত্ব ও নারীত্বের ধারণাকে ভিত্তি করে। সেখানে পুরুষ-কর্তৃত্বের কাছে নারীকে বাধ্য করা হয় অধীনতা স্বীকার করতে। সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্র– সর্বত্রই বয়ান বদলে সে কায়েম করে তার ক্ষমতা। নারীকে নানাভাবে শোষণ করে সে এবং তাকে শিকার হিসেবে গ্রহণ করে। সেই পুরুষ রচিত ঘেরাটোপে আবদ্ধ নারী 'মেইল গেজ' এরও শিকার হয়ে ওঠে। তবু তাদের আর্তনাদ, দ্রোহ, আত্মের জাগরণ যেমন সমাজে তেমনই সাহিত্যেও নানাভাবে প্রকাশিত হয়। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষীণ স্বর ক্রমশ তীব্রতা পায়। বাংলা সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রাগাধুনিক যুগের ভরা সামন্ততন্ত্রেও সেই নারীস্বর ভেসে উঠেছে চন্দ্রাবতীর রামায়ণে কিংবা চন্দ্রাবতীর 'মলুয়া পালা' ইত্যাদিতে। এমনকি পুরুষ লেখকের হাতে যখন

মঙ্গল কাব্য, অনুবাদ কাব্য, পদাবলী রচিত হয়েছে তখনও অগোচরেই কখনো কখনো ফুটে উঠেছে মেয়েদের সত্য। রেনেসাঁস, সংস্কার মুক্তির নারীশিক্ষার বিস্তার– আনুষঙ্গিক নানা প্রগতিশীল কার্যকলাপে পুষ্টি পেয়েছে নারীর এই স্বর। মেয়েরা নিজের কলম তুলে নিয়েছেন নিজের হাতে। পুরুষ ভাষার অনুবৃত্তি কিংবা মেইল গেজের সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন টেনে এনে তাকে অস্বীকার করা যাবে না, বাদ দেওয়া যাবে না সরোজকুমারী দেবী, অপরাজিত দেবী, কামিনী রায়, প্রিয়ম্বদা দেবী, মানকুমারী বসুদের। যুদ্ধোত্তর বাংলা কবিতা যখন পাশ্চাত্য দর্শন ও পাশ্চাত্য কবিতার প্রভাবকে আত্মস্থ করে 'আধুনিক' হয়ে উঠতে চেয়েছে, তখনও সংখ্যায় কম হলেও বাঙালি মেয়েরা সমানতালে আধুনিকতার ভাবসত্যকে নিজের মতো করে গ্রহণ করেছেন। পাঁচের দশকের কবিতা সিংহ, রাজলক্ষ্মী দেবী, ছয়ের দশকের দেবারতি মিত্র, রমা ঘোষ, গীতা চট্টোপাধ্যায়, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, সাতের দশকের কৃষ্ণা বসুর মতো কবিরা এই কালখণ্ড থেকে উঠে আসা। আটের দশকের কবিরা একদিকে যেমন বঙ্গীয় কবিতার মানবীচৈতন্যের ধারাটিকে আত্মস্থ করেছেন, অন্যদিকে তেমনই পাশ্চাত্য লালিত নারীবাদী কার্যকলাপ ও তার তাত্ত্বিকতায় নিজেদের মননকে জারিত করেছেন। তারই সূত্রে এই দশকের মল্লিকা সেনগুপ্ত, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, রূপা দাশগুপ্ত, সুতপা সেনগুপ্ত, অঞ্জলি দাশ, ঈশিতা ভাদুড়ি প্রমুখের মতো একঝাঁক তরুণী উঠে এসেছেন নারীর আত্মন, বয়ান ও স্বরের বিস্ফোরক প্রকাশ নিয়ে। এই স্পর্ধিত প্রকাশ আটের কবিতাকে শুধু স্বতন্ত্র মাত্রাই দেয়নি, হয়ে উঠেছে একটি বিশিষ্ট বিষয়।

পদ্ধতি

এই লেখাটির বিশ্লেষণ মূলত Content Analysis. তবে শুধু বর্ণনা করা হয়েছে তা নয়, সেই সঙ্গে এপার বাংলার আটের দশকের মেয়েদের কবিতার প্রেক্ষাপট ও ঘটনার সঙ্গে মানবীবাদের চেতনা কীভাবে জড়িয়ে আছে এবং এই ধরনের প্রবণতার সঙ্গে কবিতাগুলি কীভাবে সাজুয্য বজায় রেখেছে তার আলোচনাও করা হয়েছে। তবে কিছু ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। Analytical Method ব্যবহার করা হয়েছে। তবে Content Analysis টাই বেশি। এছাড়া সামাজিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকেও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভোটাধিকারের দাবিকে কেন্দ্র করে যে নারীবাদী আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়, ১৯৬০ এ মূলত গ্রেটব্রিটেন ও আমেরিকায় তার নতুন পর্ব শুরু হয় সামাজিক অসাম্য ও নারীর অধিকার এবং আইনগত দিকগুলিকে সামনে রেখে নানা বিক্ষিপ্ত আন্দোলনের মধ্যে। ক্রমশ নারীবাদ একটি জোরালো ও বহুবাচনিক দার্শনিক ভিত্তি অর্জন করে। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত সিমোন দ্য বোভ্যায়ার এর 'The Second Sex' গ্রন্থটি হয়ে ওঠে তার অন্যতম দিকনির্ণয়ী বৌদ্ধিক আধার। পরে বিশ্বজুড়ে নানা তাত্ত্বিক বাঁক নেয়। একাধিক মতবাদে পুষ্ট হয়। মানবীবিদ্যার মূল তত্ত্বটি দাঁড়িয়ে থাকে পাঁচটি অঙ্গীকারের মধ্যে–

"১. নারীকে এবং সমাজে তার অবদানকে বিশেষ মূল্য দেওয়া।

২. নারী পুরুষ বিভাজনের ক্ষেত্রে লিঙ্গ-যৌন নির্মাণকে ব্যাখ্যা করা।

৩. পিতৃতান্ত্রিক অনুশীলন কীভাবে নারীর অবমূল্যায়ণ ঘটিয়েছে, তা জানতে অতীতকে বিশ্লেষণ করা।

৪. নারীর অবদান, মূল্য ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত আচরণগুলিকে পরিবর্তনের জন্য নতুন বোধ তৈরি করা।

৫. জনজীবনে একজন পূর্ণ নাগরিক হিসেবে যোগদানের যোগ্য হবার জন্য রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে নারীর সামাজিক ও ব্যক্তিগত রূপান্তর ঘটানো।"[১]

ঈভ যেদিন জ্ঞানবৃক্ষের ফল আস্বাদন করেছে, সেদিন থেকেই মানবীচেতনারও শুরু। আদিম সমাজ যখনই লৈঙ্গিক ব্যবধানকে গুরুত্ব দিয়েছে, তখনই মানবীচেতনার জন্ম। আর তা পিতৃতন্ত্রের বিচিত্র স্তরের মধ্যে দিয়ে নিজেকে পুষ্ট করেছে, বিস্তৃত করেছে রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র, উত্তর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে। মানবীচেতনাবাদ স্বভাবতই একটি স্বতন্ত্র বিষয়। এমনই স্বতন্ত্র বিষয় কালে কালান্তরে নিজেকে নিয়ে গেছে তত্ত্ব থেকে ভিন্নতর তত্ত্বে এবং তার প্রয়োগের মধ্যে। স্বভাবতই তা নানা ভাবে নারীচেতনাকে প্রভাবিত ও প্রাণিত করেছে। স্বাধীনতার সময় থেকে নারী পুরুষ বিভিন্ন কর্মসূচিতে একসঙ্গে কাজ করলেও নারীকে ঔপনিবেশিক ও লিঙ্গবৈষম্য উভয় চাপের বিরুদ্ধেই লড়তে হয়েছে। আবার এই লিঙ্গবৈষম্য সমস্যাটি যে আরও কত সমস্যা জড়িত আর এর শিকড় যে আরও কত গভীর তা উপলব্ধি করা শক্ত। "লিঙ্গ সমস্যা অপরাপর সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে জটিল রূপ ধারণ করে যেমন তৃতীয় বিশ্বের একটি নিম্নবর্ণের মেয়ের সমস্যা শুধু লিঙ্গ জনিত নয়, তার জীবনের ঔপনিবেশিকতা, কিন্তু, বর্ণ ও লিঙ্গের সংমিশ্রণ এক বিচিত্র জটিলতার সৃষ্টি করে"[২]।

মানবীচেতনাবাদ এক অর্থে নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলে। নারীকে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। প্রশ্ন করতে শেখায়, চিনতে শেখায় নিজের আইডেনটিটিকে। কথা বলতে শেখায় চোখে চোখ রেখে কান্না পড়া, আগুন লেখা, নিগ্রহ দেখা, অঙ্গার খাওয়া বা লাঞ্ছিত হওয়ার মতো। এটি শুধু পশ্চিমবঙ্গের আটের দশকের অন্যতম কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত নয়, এটি এই দশকের অন্যান্য মেয়েদের কবিতারও মুখ্য অভিজ্ঞান। আসলে এঁরা কবিতায় স্ত্রী-লিঙ্গ নির্মাণ করতে চেয়েছেন। আর করতে গিয়ে দগ্ধ হয়েছেন, আঘাতও হেনেছেন। আঘাত হানতে গিয়ে পিতৃতন্ত্রের সবচেয়ে জোরালো প্রতিষ্ঠান বিবাহ, দাম্পত্য ও যৌনতাকে আক্রমণ করেছেন কবিতায়, তাদের যৌনকাতরতা ও যৌনদ্রোহ এমনকী স্বকীয় যৌনকাতরতায়।

"যৌনতার ক্ষেত্রেও ভারতীয় নারীবাদ পশ্চিমী নারীবাদের থেকে ভিন্ন আলোচনা উপস্থাপনা করে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। যৌনতা ও দেহের ওপর ভারতীয় নারীর নিয়ন্ত্রণ নেই। পিতৃতান্ত্রিক রুদ্ধ, কঠোর ভারতীয় সমাজে অবিবাহিত নারীর যৌন সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ, বিবাহিত নারীর যৌন স্বাধীনতা থাকে না। নিজস্ব যৌন চাহিদা বিবাহিত নারীর পক্ষে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়"[৩]।

ফলে বোঝাই যায় রজোনিবৃত্তির পর যখন নারী যৌনচাহিদা মেটাতে অক্ষম তখন তার জীবন ব্যর্থ হয়ে উঠেছে ব্যর্থ। নারীর স্বাভাবিক যৌনচাহিদা তাকে খারাপ নারীর তক্‌মা এনে দেয়। ভারতীয় লোকগাথার মধ্যে নারীর সতীত্বই পূজিত। আবার এও মনে রাখতে হবে লিঙ্গ পরিচয় নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। "পাশাপাশি নারী ও পুরুষের মধ্যে একটা প্রেমের সম্পর্ক থাকাও অস্বাভাবিক নয়। বিদ্বেষ আর ভালোবাসা মিলে সম্পর্কের একটা দ্বান্দ্বিকতা গড়ে ওঠে (Love-hate relation) যা অপরাপর প্রান্তিক গোষ্ঠীর মধ্যে থাকে

না। যেমন প্রভু আর ভৃত্যের মধ্যে এই সম্পর্ক অনুপস্থিত, প্রভুর প্রতি দাসের যুগপৎ অনুরাগ আর বিরাগের টানাপোড়েন চলে না"[৪]। এইসব বিষয়কে মনে রেখে আমরা আশির নারী কবিদের কবিতায় নারী চেতনা বিষয়টি আলোচনা করার পূর্বে বেশ কয়েকজন পুরুষের কবিতাকে সামনে রেখে দেখাতে চাইব পুরুষ কোন বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে নারীকে দেখেছেন এবং নারীর অসহায়তাকে তাদের কবিতায় ভাষা দিয়েছেন। এই আলোচনা আমাদের কাছে আরও পরিষ্কার করবে যে মেয়েদের কবিতায় তাদের নারী চেতনার স্বর পুরুষের কবিতা থেকে কোথায় ভিন্ন হয়ে গেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় নারীবাদী চিন্তা ও আন্দোলন প্রথম ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম তরঙ্গের নারীবাদী চিন্তা সমাজের নারী পুরুষের বৈষম্য, নারীর নিম্নতর অবস্থান, নারীর অধিকার অর্জন ইত্যাদি বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল। কিন্তু এই পর্বে নারীর যৌনতা বিশেষ করে যৌনস্বাধীনতা, শরীরের ওপর নারীর অধিকার বা তার গর্ভপাতের অধিকারের মতো বিষয়গুলি তেমন গুরুত্ব পায়নি। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নারীবাদী আন্দোলন ও তাত্ত্বিকতা নতুনতর ভাষ্য নিয়ে আসে। ১৯৬০-৮০ পর্যন্ত চলা এই আন্দোলন মুখ্যত পিতৃতান্ত্রিকতা, জৈবিক লিঙ্গের বৈষম্যের দিকে আঙুল তুলেছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, পারিবারিক জীবনে, যৌন সম্পর্ক ও এই ক্ষেত্রে নারীর স্বাধীনতার প্রশ্নগুলিও গ্রেট ব্রিটেনের দ্বিতীয় তরঙ্গের আন্দোলনে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আসলে ১৯৭০ থেকে নারীবাদী আলোচনায় যৌনতা বিভিন্ন দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আলোচনার একটি ধারা যৌন হিংসা, ধর্ষণ ইত্যাদি বিষয়গুলিকে তুলে ধরে। এই ধর্ষণ পুরুষ আধিপত্য বিস্তারের প্রধান অস্ত্র। আনন্দের চেয়ে আধিপত্য বিস্তারের জন্য যেন বৈবাহিক জীবনে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে পুরুষ। যৌন হিংসার বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন করেন তাদের মধ্যে Andrea Dworkin I Catherine Mackinnon দের নাম গুরুত্বপূর্ণ। স্মৃতি ও সত্তায় মিশে থাকা পুরুষ শোষণের এই ক্ষতচিহ্ন, মিথ্যাচার ও অপমানের কালো অন্ধকার দাগগুলোকে মূর্ত করতেও ভোলেননি আটের কবিরা। যতক্ষণ পুরুষের যৌনভোগ, ততক্ষণই নারীর সমাদর। যৌনরাত কেটে গেলেই তা রূপান্তরিত হয় ক্ষমতায়নের চাবুকের দাগে–

"স্নানের পরেও সমস্ত শরীর জুড়ে ফুটে উঠেছে পদ্মকাঁটা
শাসনের চোখ মধ্যরাত অবধি কথা বলেনি।
ভোরবেলা, যাবতীয় উত্তরাধিকার নিয়ে খোলাচুলের নিচে
জড়ো হয়েছে বিপথের মানুষ"[৫]
(চিরহরিতের বিষ/অঞ্জলি দাশ)

পুরুষের কাছে বসন্তের নারীশরীর শুধু কাম্য, শীতের নারী নয়। শীতের দুপুরে বর্ণহীন দুপুরে একা নারীর সম্বল শুধুমাত্র স্মৃতি–

"অবিরাম নতপিঠে ভেঙে পড়ত যৌনপ্রহররাশি, খালবিল ভর্তি ছিল মাছ বেলা ভোর
বাগানে ছড়িয়ে থাকত দুপুরমণির বিষে, সে সময় আমাদের স্বচ্ছলতা ছিল। আজ
শীতকালে এসে গেলে সেদিকে তাকিয়ে দেখি, সংগত পুরুষের মতো মিথ্যুক রোদ্দুর

মসৃণ তশর টুকরো খশে পড়ল শুপুরি বাগানে, লাল মেঝে জুড়ে রয়েছে ছড়ানো
পায়ের গোছ, আড়াআড়ি, আমাদের দিন ছিল এরকম"[৬]

(স্বচ্ছলতা/সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়)

বাস্তব যখন স্বপ্ন হয় কিংবা স্বপ্ন বাস্তব– সর্বত্রই পুরুষ প্রেমের নামে ঘৃণা ছড়িয়ে যায়–

"টিলা থেকে নেমে আসে বিকেল
জোরো টিপ তার গলে পড়ে
গালের উপর, ওগো শোনো
যদি স্বপ্নেও কাছে টানি
ছিঁড়ে দেবে হাত, ভাঙাচোরা
সুখের সাগরে দেবে ঘৃণা?"[৭]

(বাঁশি/সুতপা সেনগুপ্ত)

গৃহ হিংসা বলতে মূলত আটের দশকে বোঝাত পণের দাবিতে বধুর উপর একাধিক নির্যাতন। অ্যান্টি ডাউরি অ্যাক্ট হিসেবে ৪৯৮(এ) ধারাটির সৃষ্টি ১৯৮৩ সালে যার মূল উদ্দেশ্য স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির নির্যাতন থেকে মেয়েদের রক্ষা করা। অথচ এই Dowery Prohibition Act, 1961 বিবাহিত মহিলাদের রক্ষাকবজ হতে ব্যর্থ হচ্ছিল। এই বিষয়ে সাত ও আটের দশকের নারীবাদীরা সরব হন। সেই সময় পুনেতে যখন মঞ্জুশ্রী সারদা বা শৈল লৎকারের মৃত্যু হয়েছে, কলকাতায় তখনই ঘটেছে সুরূপা গুহর অস্বাভাবিক মৃত্যু। নারীবাদীদের তরফ থেকে আইন সংস্কারের বিষয়ে চাপ সৃষ্টি হতে থাকে সেই সময় থেকেই। বধু হত্যা থেকে মানসিক চাপ সৃষ্টিতে বধূর আত্মহত্যা একের পর এক ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর অবশেষে Criminal Law Amendment Committee বসে ১৯৮২ সালে। এরপর ১০ই আগস্ট ১২৮৩ সালে ল কমিশন অব ইন্ডিয়া তাদের ৯১তম রিপোর্ট পেশ করে। একাধিক আইন পরিবর্তনের সুপারিশ হয়। অবশেষে হয় ৪৯৮(এ) ধারাটি। ৪৯৮(এ) ধারাটিও একটা চূড়ান্ত অবস্থাকেই ধরে নেওয়া হয়, মেয়েটি যখন অভিযোগ করতে আসে তখন থানার আধিকারিকরা বারবার এটাই যাচাই করার চেষ্টা করেন যে সে অবস্থা এসেছে কি না, কারণ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা মানেই পরিবারের একান্তে প্রশাসনের অনুপ্রবেশ। একবার তা করলে মেয়েটির আশ্রয়ের প্রশ্নও এসে যায়। সে দায় প্রশাসন নিতেও চায় না, তার সাধ্যও নেই। সমস্যার মূলে গিয়ে পৌঁছতে পারছে না বলেই এবং পরিবারের মধ্যে মেয়েদের অবমূল্যায়ণকে একটা ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিতে হচ্ছে বলেই এই আইনগুলির প্রয়োগও খুবই সীমিত। আসলে এই আইনে নারীকে যে অধিকার দেওয়া হচ্ছে তা একজন ব্যক্তিমানুষ হিসেবে নয়, পরিবারের কোনো এক ব্যক্তির সঙ্গে তার সম্পর্কের ভিত্তিতে।

সাতের দশক থেকে নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গে পিতৃতান্ত্রিকতা বিশ্লেষণমূলক শব্দ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত কেট মিলটের SEXUAL POLITICS বইতে Patriarchy শব্দটি প্রথম ব্যবহার হয়–

"If knowledge is power is also knowledge, and a large factor is their subordinate position is the fairly systematic ignorance patriarchy imposes upon women"[৮]

এই পিতৃতান্ত্রিকতা এমন এক জটিল অবস্থা যা শুধুমাত্র পুরুষদের তৈরি কতগুলি চিন্তাধারাকে প্রধান চিন্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এবং বোঝায় যা কিছু এই মূল চিন্তার বাইরে তাই গৌণ, তাই ভুল ও নিন্দনীয়। পিতৃতন্ত্র চিহ্নিত করে দেয় নারী হবে একগামী, বিবাহিতা, সন্তানবতী বলা বাহুল্য পুত্রবতী। স্বভাবতই অবিবাহিতা, বহুগামী, পুরুষালি নারী সমাজে চূড়ান্ত নিন্দনীয় বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়। এমনকী উন্নত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়, পিতৃতন্ত্র নারীকে ভোগপণ্যে পরিণত করে। পশ্চিমবঙ্গের আটের দশকের কবিতায় পাই সেই পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে, তার একবাচনিক আধারের বিরুদ্ধে আঙুল উঁচিয়ে ধরা প্রতিবাদ, নানা মুদ্রায়, নানা অনুষঙ্গে। মানবীবাদের প্রথম তরঙ্গে নারী যে প্রশ্ন উঠিয়েছিল, সেই প্রশ্ন কবিতার শৈলীতে স্লোগানের স্পর্ধায় জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়ে এসেছে পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে–

১) "আমরা তো জানি পৃথিবী রমণী আকাশ আদিম পুরুষ
তবে কেন তুমি আমার দুহাতে শেকল পরিয়ে রেখেছ
হাজার বছর ধরে কেন তুমি সূর্য দেখতে দাওনি?
যে মাটিতে তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ তার অপমান কোরোনা
পুরুষ, আমিতো কখনও তোমার বিরুদ্ধে হাত তুলিনি"[৯]

(রক্তচিহ্ন/মল্লিকা সেনগুপ্ত)

পিতৃতন্ত্রের সঙ্গে শোষিত নারী শরীরের যে লড়াই, সে লড়াই যখন কূটকৌশলী হয়ে ওঠে, তখন তা পিতৃতন্ত্রের জাল ছিঁড়ে ফেলে নিষ্ক্রমণের জন্য–

২) "ধীবর তোমার মারণ জালে
অনেক বছর আগে আমি
গোপনে এক ছিদ্র করেছিলাম"[১০]

(রোহিত/সুতপা সেনগুপ্ত)

যে সিঁদুর বৈবাহিক চিহ্ন হিসেবে সমাজ আদৃত, তার ইতিহাসে রয়ে গেছে রক্তাক্ত শোষণের দাগ, তাই তার চেয়ে শূন্য সিঁথিই শ্রেয়–

৩) "না আমায় সিঁদুর দিয়ো না। সিঁদুরের শূন্যতা বোধ নেই।
শূন্য মানেই নীল, অবিরাম
আমার ভ্রূণও তাতে ভালো থাকবে"[১১]

(বিবাহঋতু/সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়)

বিষয়বৈভবে, প্রকাশের ঋজুতায় এবং মুদ্রার নিজস্বতায় এ ভাবেই আটের দশকের নারীবাদী চেতনার কবিতা হয়ে উঠেছে আটের দশকের কবিতা বিশ্বের অর্ধেক আকাশ। আসলে মনোবিশ্লেষক নারীবাদ মনে করে ছোটবেলার সামাজিকীকরণ ও কিছু অভিজ্ঞতার ফলে নারীদের অবদমন ঘটে। ছেলেবেলার বেশ কিছু অভিজ্ঞতা তাদের কোনো নিজস্ব ক্ষমতা তৈরি করতে দেয় না। পরবর্তীকালে তা হয়ে ওঠে পীড়নের কারণ। নানা কুসংস্কার মিশ্রিত নিয়ম তাদের উপর চাপিয়ে রীতিমতো মনকে করে দেয় দুর্বল। সংস্কার হয়ে ওঠে স্বাধীনতা হন্তারক।

আর মধ্যবয়স যখন শরীরকে ছোঁয়, শ্যাওলাঘন তখন যে নারীমূর্তি উঠে আসে, তারও কিছু মোহ থাকে, কামনা থাকে। যে মোহ, যে কামনা কখনো চরিতার্থ হবে না, তার জন্য থেকে যায় আঁশ বঁটি, ব্লেড, আত্মহননের নানা উপাচার। সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় দেখি সেরকমই ছবি–

"করতল মধ্যবয়সিনী, তাতে শিরা ফুটে আছে
এ হেন নখরা দেখে, একে কবি, তায় উন্মাদিনী প্রায়
আমারও তো কিছু লোভ হয়।
আমারও গলার মধ্যে ঢোঁক গিয়ে মোহ জেগে ওঠে,
ব্লেড ভাবি, প্রাচীন প্রাচীন বঁটি-ব্লেড
গায়ে কিছু শুকনো ও আঁশটে
রক্ত বলতে শ্যাওলা লেগে?"[১২]

(বিউটিপার্লার/ সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়)

যেমন শ্লোগানধর্মী তেমনই সূক্ষ্ম কাব্যভাষার প্রগাঢ় বিস্তার লক্ষ করা যায় এই দশকে মেয়েদের কবিতায়। নারীর জৈবিক অভিজ্ঞান কবিতায় চিহ্নিত হয় ঋজু ও সহজ কাব্যভাষায়–

"শীত ও গ্রীষ্মের মধ্যে আমি কার আঙুলে নির্ভর করব বলে
জলের তচনচ আকুল কোলাহল, শরীর নিয়ে আমি উঠে এলাম"[১৩]

(জলের মাছ/মল্লিকা সেনগুপ্ত)

মল্লিকা দেখিয়েছেন শরীর নিয়ে মেয়েরা আজ আর কুণ্ঠিত নয়। এই দশকের মেয়েরা কবিতায় সম্পূর্ণ নিজস্ব শারীরিক অভিজ্ঞানের কথা প্রকাশ করেছে শ্লীল-অশ্লীলতার ব্যাকরণকে দ্বিধাহীনভাবে সরিয়ে আর কখনো কখনো তা হয়ে ওঠে নারী পাঠকৃতির অনন্য নমুনা–

"আঠাশ দিনের মাথায় আমার
রক্তকলস পূর্ণতা পায়
আঠাশ দিনের মাথায় গাছের
ডগায় ফুটেছে রুদ্র পলাশ
এখন আমার সানুদেশ জুড়ে
কুয়াশা জমেছে নীরক্ত শ্বেত
রক্ত নামছে ঊষর মাটিতে
মা-ভূমি গুল্মগর্ভা হবেন"[১৪]

(মা-ভূমি/ঐ)

এদের আত্মবীক্ষা ও নারীপরিসরের নিজস্ব মেয়েলী ভাষ্যে একইভাবে বিমিশ্রিত হয় কখনো চটুল শ্লেষ কখনো গাঢ় সমালোচনা, কখনো প্রত্যাখ্যানের ব্যাপকতা। তারই অনুষঙ্গে কবিতা জুড়ে থাকে তাঁদের নিজস্ব বিশ্ব অনুসন্ধান ও নির্মাণের আর্তি। অন্বেষণ চলে নিজস্ব স্বর ও ভঙ্গিরও। মেয়েলি বাচন, মেয়েলি চলন, মেয়েলি

অভিজ্ঞানে 'মেয়েলি' এই পুরুষ প্রবর্তিত শব্দটির অর্থান্তর ঘটে যেতে থাকে। সেই অনুষঙ্গেই দাম্পত্যের মধ্যে থেকে দাম্পত্যের বিরুদ্ধে দ্রোহ প্রকাশ পায় অসতী মেয়ের পদচ্ছায়ায়, চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের 'বিজ্ঞাপনের মেয়ে'তে–

"আমাদের বিয়ের রাত পেরিয়ে আমরা এখন সরাসরি ঢুকে পড়েছি এক আগ্নেয়...

আলতার শিশিতে কাঠি ডুবিয়ে রাঙিয়ে নিচ্ছে
পায়ের পাতা। গলি পেরিয়ে এই অন্দরমহলের
দরজা ওকে চিনিয়ে দিলো কে? সে ঘর থেকে
পালিয়ে এসে দেখি আমারই ভাঁড়ারের আনাচে
কানাচে ফুটে আছে সেই অসতী মেয়ের পদছায়া"[১৫]
(বিজ্ঞাপনের মেয়ে/চৈতালী চট্টোপাধ্যায়)

সেই নির্ভার আততিতেই তাদের আশ্রয় হয়ে ওঠে প্রকৃতি–

"প্রকৃতি জানে তবু আগামী সকাল আমাদের"[১৬]
(বুঁদ ক্লোরোফিল/মল্লিকা সেনগুপ্ত)

রচিত হতে থাকে ইকোফেমিনিজমের দেশজ আখ্যান। নারীবাদের আর একটি সাম্প্রতিক ধারা এই পরিবেশবাদী নারীবাদ। নারীর মতোই প্রকৃতি অবদমিত হয় তাই এই ধারার নারীবাদ এই দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্য খোঁজার চেষ্টা করেছে। 'ইকোফেমিনিজম' শব্দটি ১৯৭৪ সালে প্রথম প্রয়োগ করেন ফরাসী নারীবাদি চিন্তাশীল ফ্রাঁসোয়াজদো ওবোঁন। এই শব্দে একটি দর্শন ও একটি আন্দোলন পরস্পর স্পেস বিনিময় করেছে। তিনি তাঁর 'লে ফেমিনিজম উলা মো বইটিতে দেখান–

"বিভিন্ন সময়ে একই সময়ে বস্তুনারীবাদ গড়ে উঠলেও বস্তুনারীবাদেরা মনে করেন যে নারীরা অস্থিতিশীল জগৎ থেকে স্থিতিশীল বিশ্বনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইকোফেমিনিজমের তত্ত্বে পুরুষ প্রকৃতির শত্রু। হত্যা করা, ধ্বংস করা ইত্যাদি পুরুষের জন্মগত বৈশিষ্ট্য। তার সম্পূর্ণ বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে থাকা নারীই হল প্রকৃতির বন্ধু ও স্বজন। নারীর ধর্মই হল লালন-পালন করা, বিকাশ সাধন ও প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখা। এই কারণেই নারীমুক্তি আন্দোলন ও পরিবেশ আন্দোলন দুটিই পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলে। ইকো ফেমিনিস্টদের মতে এই পৃথিবীতে পুরুষ প্রযুক্তিগত কারণে পুরুষ সৃষ্টি করেছে পারমাণবিক বিকিরণ, কীটনাশকের ব্যবহার, বিপজ্জনক বর্জ্যের সৃষ্টি, পরিবেশগত অন্যান্য দূষণ সমস্তই নারীকে সমগ্র পৃথিবীতে বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। পারমাণবিক বর্জ্য উদ্ভূত তেজস্ক্রিয়তার ভয়াল পরিণামেই জন্মগত বিকৃতি, ক্যান্সারের মতো অসুখের প্রাদুর্ভাব। যে কীটনাশক কৃষিক্ষেত্রে ও রণভূমিতে ছেটানো হয় তা নারী ও শিশুর জীবনহানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই মেয়েরাই সামিল হয় প্রকৃতি রক্ষার আন্দোলনে। ইউরোপে সত্তর দশকে ইকোফেমিনিজমের আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে ভারতবর্ষে ও উত্তরাখণ্ডের গাড়োয়াল কুমায়ূন পাহাড় অঞ্চলে নারীদের চিপকো আন্দোলন (১৯৭২-৭৮) এক নতুন দিক উন্মোচন করে?"[১৭]

পাশাপাশি কর্পোরেট দুনিয়া শিল্পের সঙ্গে কৃষিকেও মুনাফা লাভের অন্যতম মাধ্যম করে নেওয়ায় অরণ্য-নদী-জীবজন্তু-পশু-পাখিরা ধ্বংসের মুখে পড়েছে। এর বিরুদ্ধেও ইকোফেমিনিস্টদের লড়াই। তারা প্রকৃতি

বিনষ্টিকরণের সঙ্গে পুরুষের নারীর প্রতি অমানবিক আচরণ, তাকে ভোগের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করাকে মিলিয়েছেন। তারা মনে করেছেন প্রকৃতির ধ্বংসের মধ্যেই নারীর প্রতি অত্যাচারের মূলসূত্র লুকিয়ে আছে। আলোচক রাজশ্রী বসু বিশিষ্ট পরিবেশবাদী নারীবাদী বন্দনা শিবাকে (Vandana Shiva) উদ্ধৃত করে বলেন যে এই ধারার নারীবাদীদের প্রধান লক্ষ্য হল ভূমির উৎপাদনশীলতা ও নারীর সক্রিয়তাকে সমাজ কীভাবে দেখে তার পুনর্নির্মাণ করা। মারিয়া মাইজ ও বন্দনা শিবা তাঁদের 'Ecofeminism' গ্রন্থে বলেন বিজ্ঞান এক পশ্চিমী পুরুষাধিপত্যের ধারা যার হাতে প্রকৃতি ও নারী সমানভাবে অবদমিত ও শোষিত–

"Patriarchal civilization is the effort to solve one problem of the male gender, namely the fact that men cannot produce human life on their own. They are not the beginning. They cannot produce children, particularly sons, without women. Mothers are the beginning. This was still evident to the old Greeks. Mothers are arche, the beginning of human life. Therefore men invented a technology for which mothers are not necessary. Technologies like the atom bomb or reproductive and genetic technology or the Internet such 'motherless children'. Another form of violence against women is still the same as in 1993; the invention of reproductive and genetic technology. With the artificial fabrication of the first test-tube baby, Louise Brown, it was clear women had lost their age-old monopoly on birth. From there onwards, male reproductive engineers could produce a baby without women. Now genetic engineering could control all the genetic and biological processes by which human and animal life could be produced, reproduced and manipulated. It seems that man has at last become the creator of life. A human relation between a man and a woman is no longer necessary to create new human life."[১৮]

এই প্রসঙ্গে আমরা বলতে চাইব 'গঙ্গাজন্ম' ও 'মেধাজন্ম' কবিতা দুটির কথা। শান্তি প্রদাত্রী গঙ্গা মল্লিকার কবিতায় বেদনাগ্রহণকারীও। তাকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন অঞ্চলে বৃহত্তর সভ্যতা গড়ে উঠেছে। অথচ মানুষ সুসভ্যতার আলো গ্রহণ করে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছে দূষণ, প্রকৃতি-বিচ্যুত পরিবেশ। বিষাক্ত পরিবেশে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে তার। তবু কত লোক নদী প্রণাম করে। গঙ্গা তার কবিতায় হয়ে ওঠেন কন্যা, জননী, ঘরনী, বাল্যসঙ্গিনী। ছড়িয়ে পড়ে কবির আর্তি–

"গঙ্গা তোমাদের বাঁচিয়ে রেখেছিল
তোমরা গঙ্গাকে বাঁচাতে পারছ না
আমরা চাই বন্ধু একজন
রাজদ্বারে আর শ্মশানে সম্পদে
তোমাকে চাই আমি হে মেধা পাটেকর
সবুজ নারী তুমি আমার হাত ধর
নতুন গঙ্গার জন্ম দাও?"[১৯]
(গঙ্গা জন্ম/মল্লিকা সেনগুপ্ত)

ইকোফেমিনিজমের আরো একটি সার্থক দৃষ্টান্ত মল্লিকা সেনগুপ্তের 'মেধাজন্ম' কবিতাটি। পুরুষ যেমন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্যের জোরে নারীকে নীচে নামিয়ে রাখে, সম্পর্কে ফাটল ধরায়, ঠিক তেমনই প্রকৃতির ওপর চলে পুরুষের অত্যাচার। সেইভাবে সর্দার সরোবর প্রকল্পকে সামনে রেখে মেধা পাটেকরের নদী রক্ষার আন্দোলনকে নিয়ে আসেন কবিতায়। ইকোফেমিনিজমের আলো দীপিত হয়ে ওঠে–

"নর্মদামাঈ
তোমার জন্য
একটি লড়াই
মেধা পাটেকর"[২০]
(মেধাজন্ম/ঐ)

আটের দশকের বেশ কিছু মেয়েদের কবিতা মেধাবী ও আবেগপ্রবণ। তারই সঙ্গে ঠিকরে ওঠে তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদাবোধের আগুন। আর তারই মধ্যে অবারিত হয় নারীর স্বভাবকোমল আত্মনিবেদন ও ক্ষতময় যন্ত্রণার আর্তি। ঝলসে ওঠে আগুনবর্ণ শ্লেষও। শুধু মানবীবাদের দ্রোহ নয়, বরং একজন নারীর পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ অবারিত হয়েছে কবি সুতপা সেনগুপ্তের কবিতায়। নারীর কাছে পুরুষ যা চায়, ডালা সাজিয়ে তাকেই দিতে চায় নারী। কিন্তু সেই বেলেল্লা চুলের সঙ্গে সে যুক্ত করে নেয় প্রখর ভালোবাসাকেও। যৌনতা হয়ে ওঠে বুড়িবালামের ঐতিহাসিক লড়াইয়ের মতো সংঘর্ষী ও রক্তাক্ত–

"নতুন বছর আমায় দিও সর্বনাশা খিদে
তোমায় আমি সাজিয়ে দেব ডালায়
বেলেল্লা চুল, সন্ধ্যে বকুল, প্রখর ভালোবাসা
দুপুর রোদে অন্ধ বুড়িবালাম?"[২১]
(নতুন বছর/সুতপা সেনগুপ্ত)

পুরুষ নির্মাণ করতে চায় নারীকে তার নিজস্ব সৌন্দর্যের ব্যাকরণে, চিত্রাঙ্গদা মিথকে সামনে রেখে আট দশকের কবি মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা তার বিরুদ্ধেই সোচ্চার হয়ে ওঠে–

"পুরুষ তোমাকে যেমন ইচ্ছা বানাবে
তাই কি নিয়তি তোমার
অথবা কেউই বুঝতে পারেনি তোমাকে
তুমিই আসলে প্রকৃত স্বয়ংসিদ্ধা?"[২২]
(চিত্রাঙ্গদা/মল্লিকা সেনগুপ্ত)

১৯৭০ থেকে নারীবাদী আলোচনায় যৌনতা যখন হয়ে উঠল বিভিন্ন দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তখন একদল বৈপ্লবিক নারীবাদী তাত্ত্বিক সমকামিতাকে নারীমুক্তির প্রধান পথ হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। নারীবাদী লেখিকা Naomi McComick মনে করেন যে দুটি নারীর মধ্যে আবেগতাড়িত, মানসিক ও বৌদ্ধিক এমনকী শারীরিক সম্পর্ক গড়ে উঠলে তাও হয়ে ওঠে সমান গুরুত্বপূর্ণ। আটের দশকের মেয়েদের কবিতায় যৌন অভিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতনতা যেমন স্পষ্ট, তেমনই বেশ কিছু কবিতায় সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণও উঠে আসতে থাকে অত্যন্ত

সাবলীলভাবে। এবং এরও উৎসমুখে থাকে পুরুষ প্রেমের প্রতি খেদ ও প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক আধুনিকতাকে প্রত্যাখ্যানের জের। মানবীবাদের তৃতীয় ধারায় যখন মেয়েরা পুরুষের সাহচর্য, যৌনতা এমনকি শরীর প্রত্যাখ্যান করে, তখন তার যৌন-অযৌন সাহচর্য পূর্ণতা পায় আর একটি নারী শরীর ও মনকে নিয়ে। কবিতার এই অংশে শীতকাল, ঘাম, নিঝুম স্বপ্ন ইত্যাদির অনুষঙ্গে সমকামের সেই আর্তি মূর্ত হয়ে উঠেছে সুতপা সেনগুপ্তের কবিতায়–

"চলো শীতকাল, যাব শীতকাল
যদি শীতকাল আসে স্বপ্নেও
কত ভালোবাসা ঢালো কুয়াশায়
বলো, অরুণা, আমার শীতকাল"[২৩]

(শীতকাল/সুতপা সেনগুপ্ত)

'সমকামিতা' আইনত স্বীকৃতি পায় কিছু বছর আগে, কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই আটের কবিতায় মেয়েরা একে নিয়ে আসে পূর্ণ মর্যাদায়। কবি সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাতেও দেখি সেই একই স্বর–

"অনুরাধাকে দেখলে হলদি নয়, আমার চোখে ঝলসে ওঠে কাঁসাই...
কতদিন টিপ পরি না, ভেবে মন কেমন করে ওঠে।
মা টেরেসা কি তাঁর বাচ্চাদের কপালে কাজলের টিপ
পরিয়ে দেন? আজ এরকমই সন্তানাকাঙ্ক্ষা অনুভব
করি। কিন্তু যে জীবন আমার নয়, সে জীবন কোনো
নারীর নয়, তা আমার সন্তানকে কেনই বা সে দেবে?
তার বীর্য তবে মিথ্যে হোক। অকালে, বাজ পড়ে শূন্য
মাঝে"[২৪]

(বিবাহঋতু /সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়)

পিতৃতন্ত্রের জালে বন্দী মেয়েদের যন্ত্রণাতেই তৈরি হয় অস্তিত্বের সংকট, যা ডেকে আনে শূন্যতা। হৃদয়কে করে তোলে বিষময়। সংযুক্তার কবিতায় সেই নারীসত্তার সংকট ও নারীবাদী মনোভঙ্গি উথলে উঠতে চায়–

"সব রঙ শেষ হলে চর্মচক্ষে শুধু অন্ধকার দেখি।
রোগা রোগা অন্ধকার, রোগা আমরা কালো আমরা, মেয়েরাই অমর
ওই তারা ছড়িয়ে যাচ্ছে বিদেশ হারেম জুড়ে দাসী, এ দেশও
কালো পণ্য কালো ভ্রূণ লেখো শাদা পাতা, তাকে রম্যও নশ্বর"[২৫]

(বর্ণানুক্রম/ঐ)

পিতৃতন্ত্রের কাছে মেয়েদের অভিমান মূল্যহীন। অশ্রু ঠাট্টার কারণ, বিষাদ অর্থহীন। সেই অবমূল্যায়িত অভিমানেই তাদের কলমে নির্মিত হয় অভিমানজাত ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য মেশানো এক নতুন ধরনের চিত্রকল্প, যেখানে তারা নিজেদেরই চিহ্নিত করেন ডাইনি বা জিন বলে, যে মূর্তিতে পুরুষ নারীকে দেখতে অভ্যস্ত। এই সুতীব্র অভিমান আটের দশকের কবিদের কবিতায় ভিন্ন দ্যোতনা যুগিয়েছে। কবি অঞ্জলি দাসের বর্ণনায়–

শূন্যের ভিতর এই ঘর ও সংসার, ছায়াহীন দেহে দীর্ঘ দীর্ঘ জিভ, এখন জিনের মতো আমাদেরও উল্টো দিকে পা। অঞ্জলি দাশের কবিতায় জিন মল্লিকার কবিতায় রূপান্তরিত হয় ডাইনিতে। পিতৃতন্ত্রের ভাষ্য যতই নারীকে আদিমকাল থেকে ডাইনি বা জিন বলে মারতে চেয়েছে, ততই নারী হয়ে উঠেছে মৃত্যুহীন– আমরা ডাইনি আমরা আগুনে মরি না...

মল্লিকার কবিতার মতোই চৈতালীর নারীসত্তাকে ডাইনি মায়ের অষ্টম গর্ভের মেয়ে হিসেবে চিহ্নিত করেছে। অষ্টম গর্ভের পুরুষ কংসকে নিধন করেছিলেন, অষ্টম গর্ভের ডাইনি চিহ্নিত নারী আজ নিধন করতে চেয়েছে পুরুষের অত্যাচারকে–

"আমার জননীর গোপন যোনিপথে
প্রসবকালে কোন যাদুকরী
মন্ত্র পড়ে বিষ লুকিয়ে ঢেলেছিল
ডাইনি মেয়ে আমি জন্মেছি?"[২৬]

(প্রেম/ চৈতালী চট্টোপাধ্যায়)

তীব্র নারীচৈতন্যজারিত স্বর যখন সোচ্চার হয়, তখন তাদের বাচনও হয় তীক্ষ্ণ ও শাণিত। সে বাচন বহুসময়েই শ্লোগানধর্মের স্বর পেরিয়ে যায়। নন্দন সৌন্দর্যে বিভাসিত হয়ে ওঠে।

আটের মেয়েদের কবিতায় মিশে থাকে কাব্যভাষার অভিনবত্বও। তবে প্রত্যক্ষ বাচনও আটের কবিতার স্বাভাবিক অভিজ্ঞান। প্রয়োজন মতো স্থান করে নেয় মেয়েলি বাকভঙ্গি। পুরুষতন্ত্রকে অস্বীকার করে স্ব-মহিমায় আত্মপ্রকাশের এটি আরও একটি দিক। মল্লিকা সেনগুপ্ত দেখিয়েছেন মেয়েদের জন্মই শুধু যৌন লালসা মেটানোর জন্য আর বংশরক্ষার তাগিদে। তাই পুরুষদৃষ্টি এ সংসারে শুধু গর্ভধারণ অথবা গর্ভধারণের অক্ষমতা একমাত্র কথা ও কাহিনি রচনা করে–

"সারাটা বোশেখ মাস গাঁদামাটি ছেনে ছেনে দেবতার লিঙ্গ নাড়াচাড়া
ওলো কর্তা কুলীন গো, কাঁচা পঞ্চদশী তার ছোট বউ, পোয়াতি হয়েছে মাসদেড়
সে বিচার পরে হবে আমি আটকুঁড়ি কিনা, তেঁতুল খাইয়ে আগে তোর পেট ফেলি
বউ তুই দুধ চুরি করিসনা আর, এই ষষ্ঠীর পালক মাজায় বেঁধেনে তোর?"[২৭]

(অনার্যর তীর/মল্লিকা সেনগুপ্ত)

১৯৭১ সালে Medical Termination of Pregnancy Act. চালু হয়ে গেছে যেখানে মেয়েদের অধিকার আছে স্বাধীনভাবে গর্ভপাত ঘটানোর। কিন্তু খুব কম সংখ্যক মেয়েরাই সেই অধিকার জীবনে প্রয়োগ করতে পারে, সাধারণ মেয়েদের ক্ষেত্রে ইচ্ছে থাকলেও তা ফলপ্রসূ হয় না। পুরুষের ইচ্ছায় তার গর্ভধারণ ও অক্ষমতা থাকলে তার দায়ভার সে নিজে বহন করে।

আটের দশকের মেয়েদের কবিতা শুধু মুঠো হাতের প্রতিবাদ নয়, কথ্য, কলোকাল, নাগরিক চাতুর্য ভরা ও কথোপকথনের ভঙ্গিতে সেখানে মেয়েদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাকেও তুলে ধরা হয়েছে বারবার। প্রতিবাদে সেখানে মিশে থাকে মিহি সুতোর ভালোবাসার আদ্রতাও। কেউ কেউ দ্বিধা করেননি আত্মগত স্বীকারোক্তির পথে হাঁটতে। একদিকে নিজস্বতা, অন্যদিকে নিজস্ব বৃত্তি ছাড়িয়ে পাঠকের সঙ্গে নিবিড়

সম্পর্ক তৈরি করা– এই দুয়ের সেতুবন্ধনে আটের দশকের মেয়েদের কলম সার্থক হয়ে ওঠে। বড় গভীর, আন্তরিক ও দার্শনিক দ্যুতিময় উচ্চারণে বারবার চোখে পড়ে এই দশকের কবিদের নারীবীক্ষা ও নারী পরিসরের আখ্যান। চৈতালী চট্টোপাধ্যায়ের 'বিজ্ঞাপনের মেয়ে' কবিতা থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু উক্তি–

১। "জঞ্জালে ভরা ফুটপাত ঘেঁষে কিছুদূর
হাটলেই কেমন যে নেশা
ধরে যায়
আমার। ঝিমঝিম করে কপালের
রগ, চারপাশে
তখন অপরিমেয় মমতায় গলে
পড়ছে অবিশ্বাস"[২৮]

(বিজ্ঞাপনের মেয়ে/চৈতালী চট্টোপাধ্যায়)

নারীসত্তার মন্থন থেকেই জেগেছে তাদের কল্পনা, তাদের শৈল্পিক প্রকরণ, পদ্ধতি ও বিনির্মাণের তাগিদ। সময়ের দাহ্যরূপ ও আত্মকথনের উন্মোচনে তাদের কবিতা তৈরি করেছে অনবদ্য যুগলবন্দী। যৌনতায়, প্রেমে, ব্যঞ্জনায়, সৌন্দর্যচেতনায় অসামান্য শব্দশৈলীতে, নারীত্বের আত্মগত আবেদনে তাদের লেখন ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। কখনও তীব্র ক্রোধ ও জোরালো শব্দভঙ্গিতে, কখনও কিছুটা অভিমানাহত বেদনায়, কখনও জাদুকরী চাতুর্যে নারী জীবনের গভীর মনস্তত্ত্বকে তুলে এনেছেন এই কবিরা। এসেছে মেয়েদের ঘরোয়া ও পারিবারিক বন্ধনের কথা এবং সেই বন্ধন মুক্তির কথাও। আবার কখনও নারীবাদের কণ্ঠের প্রকট ছায়া থেকে বার হয়ে নির্মাণ করতে চেয়েছেন একটি নতুন গৃহ। অঞ্জলি দাশের কবিতায় সেই গৃহ নির্মাণের আগে তারা দেখে নিতে চান সেখানকার 'চাঁদ, পলিমাটি'। কিন্তু শুধুমাত্র পার্থিব শরীর নয়, সেখানে এসেছে 'অলৌকিক রূপোর পোশাক'।

শরীর থাকলে তৃষ্ণা থাকবে, আর সেই তৃষ্ণাই কবিতায় 'অনাহারী হতশ্বাস'। সেই তৃষ্ণা পাত্র শুকনো রেখেও বারবার ফণা তুলতে চায়–

"নিথরপুকুর, অস্পর্শ, মনের ইচ্ছে বলে ডুব
আজ তৃষ্ণা পাত্র শুকনো দেখে জলের
তৃপ্তির কথা
রটিয়ে দিয়েছে"[২৯]

(বিবাহমন্ত্র/অঞ্জলি দাশ)

কেন এই নির্বেদ? এই বিষণ্ণতা? এই প্রশ্নের মধ্যেই বুঝে নিতে হয় নারীর সামাজিক স্তরটিকে। প্রবণতা মূর্ত জগতের পরিসর থেকে নিজেকে অর্জন করতে চাইলেও সেই সিদ্ধিকে অনেক সময় মেয়েরা অতিক্রম করতে পারেনি। সমাজ ও সংস্কারের মুখোশ সরিয়ে এইসব কবিতা যেন নিজেদেরই মুখোমুখি হওয়ার আন্তরিক তাগিদ। সেখানে বাচনিক কোষে মিশে থাকে যেমন নারী জীবনের শূন্যতার হাহাকার, তেমনি সেই উচ্চারণে

মাঝে মাঝেই ঝিলিক দিয়ে ওঠে নিহিত জীবন ভাষ্যে–

"চল রান্নাঘরে যাই
ঝুলকালি মাখা মৃদু বালবের আলোয়
ভাল মানুষের মতো
তুমি সেঁকো, আমি বেলে দিই বসে,
প্রিয় সাদা পাতা, শোন
আমি মরে গেলে
যে কথা বলিনি আজো কোনোদিন, মাথা খেও
তুমি বলে দিও"[৩০]

(সাদা পাতা তোমাকে/চৈতালী চট্টোপাধ্যায়)

এভাবে সময়ের বহ্নিবলয় পেরিয়ে এসে আটের দশকের নারী কবিরা নতুন বাচন ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রকরণ খুঁজে নিতে চেয়েছেন। স্ত্রী লিঙ্গ নির্মাণ নিয়ে আমাদের চিরাচরিত ধারণার মূলোচ্ছেদ ঘটিয়েছেন। কখনও কখনও কবিরা এমন এক সর্বাত্মক নারীচেতনার জাগরণ ও প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন যা পূর্ণত রাজনৈতিক। যে লিঙ্গ প্রতাপের দৃশ্য ও অদৃশ্য শৃঙ্খল আবহমান কাল ধরে মেয়েদের জড়িয়ে রেখেছে তা স্পষ্ট করে তোলার জন্য কবিতাকে করেছেন তাদের যুদ্ধের উপকরণ।

নারীর অসহায়তাকে ছুঁয়ে ছেনে আটের দশকের কবিরা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তাদের দীপ্তি ও জাগরণ। রাজনৈতিক চেতনা সম্মত এই জাগরণের কথা বলতে গিয়েই কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর 'অর্ধেক পৃথিবী' সংকলনে লিখেছেন 'আপনি বলুন, মার্কস'র মতো কবিতা। এই কবিতায় কবি প্রশ্ন তুলেছেন–

"ছড়া যে বানিয়েছিল, কাঁথা বুনেছিল
দ্রাবিড় যে মেয়ে এসে গম বোনা শুরু করেছিল
আর্যপুরুষের ক্ষেতে যে লালন করেছিল শিশু
সে যদি শ্রমিক নয়, শ্রম কাকে বলে?"[৩১]

(আপনি বলুন মার্কস/মল্লিকা সেনগুপ্ত)

গৃহশ্রম নিয়ে মার্কসের অবস্থানকে কূট তর্কের মুখোমুখি করেছেন যে সব মার্কসবাদী ও নারীবাদী তাত্ত্বিক, তারা অনেকেই মল্লিকার এই কবিতাটি প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারেন, কিন্তু এ নিয়ে অন্তত কোনও প্রশ্ন থাকতে পারে না যে কবিতায় তত্ত্বের সঙ্গে যে বোঝাপড়া মল্লিকা সেনগুপ্ত এই কবিতাটিতে এনেছেন তা সম্পূর্ণ নতুন। নারী শ্রমের প্রতিটি মূল্য যিনি অক্ষরে অক্ষরে বুঝে নিতে চান, তারই প্রকাশ হয়ে ওঠে এই কবিতা। একইভাবে 'ফ্রয়েডকে খোলা চিঠি'-তে তিনি লিখেছেন–

"পুরুষের দেহে এক বাড়তি প্রত্যঙ্গ
দিয়েছে শাশ্বত শক্তি, পৃথিবীর মালিকানা তাক্র
পায়ের তলায় থেকে ঈর্ষা করে পৌরুষের প্রতি"[৩২]

এভাবেই কবি লিঙ্গ রাজনীতির স্বরূপ উন্মোচন করে ও শিল্পের সব রকম আড়াল সরিয়ে ফ্রয়েডকে সামনে রেখে

প্রত্যক্ষ বাচনে জানিয়েছেন–

"আমার শৈশবে কোনও লিঙ্গ ঈর্ষা ছিল না
আত্মপরিচয়ে আমি সম্পূর্ণ ছিলাম
আজও আমি দ্বিধাহীন সম্পূর্ণ মানুষী"[৩৩]

মেয়েরা যখনই একান্ত ব্যক্তিগত কক্ষ নির্মাণের চেষ্টা করেছে, তখনই উঠেছে প্রতিবাদ, ব্যর্থতা থেকে হাহাকার। আটের কবিদের কবিতায় সেই হাহাকার ও প্রতিবাদ নানাভাবে এসেছে, গড়তে চেয়েছে কবিতায় নিজস্ব মানবী অবয়ব। মেয়েরা চেয়েছে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে, ফলে পুরুষের মতো তারাও বেরিয়েছে বাইরে, সুদৃঢ় করতে চেয়েছে তাদের আত্মমর্যাদা। ফলে অনিবার্য হয়ে উঠেছে পুরুষের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংঘাত।

উপসংহার

এভাবেই জীবনের কাটাছেঁড়া কোলাজের সমন্বয়ে কখনও বেদনাজাত অভিমান প্রকাশে, কখনও ক্রোধে, কখনও প্রতিবাদে আবার কখনও শ্লেষে আমাদের ভাবতে শিখিয়েছে আটের দশকের নারী কবিরা হৃদয়ে রক্তক্ষরণ থেকে যেমন জন্ম দিয়েছে কবিতাকে, আবার তাকেই পাঠকের সামনে নিয়ে এসেছে নান্দনিক কাঠামোয়।

তথ্যসূত্র

১। Tierney, Helen (ed.) *Women's Studies Encyclopedia,* Conneticut Greenwood Press, 1999, p. 476

২। শেফালী মৈত্র, *নৈতিকতা ও নারীবাদ দার্শনিক প্রেক্ষিতে নানা মাত্রা*, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৭, পৃ. ৬

৩। রাজশ্রী বসু, *নারীবাদ*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১২, পৃ- ৭৮

৪। শেফালী মৈত্র, তদেব, পৃ. ৬

৫। অঞ্জলি দাশ, '*চিরহরিতের বিষ*', শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০০৯, পৃ. ৪৯

৬. সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, '*স্বচ্ছলতা*', শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ১৬

৭. সুতপা সেনগুপ্ত, '*বাঁশি*', শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ২২

৮. Kate millet, '*Sexual Politics*', https://www.goodreads.com /auther/quotes/150588. kate-Millett.

৯. মল্লিকা সেনগুপ্ত, '*রক্তচিহ্ন*', শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, পুস্তকমেলা জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ২৫

১০. সুতপা সেনগুপ্ত, '*রোহিত*', তদেব, পৃ. ৯

১১. সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, '*বিবাহঋতু খ*', তদেব, পৃ. ৯

১২. সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, '*বিউটিপার্লার*', তদেব, পৃ. ১০

১৩. মল্লিকা সেনগুপ্ত, '*জলের মাছ*', তদেব, পৃ. ১৯

১৪. মল্লিকা সেনগুপ্ত, '*মা-ভূমি*', তদেব, পৃ. ২৩

১৫. চৈতালি চট্টোপাধ্যায়, '*বিজ্ঞাপনের মেয়ে*', কবিতা সংগ্রহ, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মে ২০১৮, পৃ. ১৩

১৬. মল্লিকা সেনগুপ্ত, '*বুঁদ ক্লোরোফিল*', তদেব, পৃ. ১৬

১৭. সুপর্ণা লাহিড়ী বড়ুয়া, *নারীর পৃথিবী নারীর সংগ্রাম*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৮৫

১৮. Maria Mies and Vandanda Shiva, *Ecofeminism*, Rawat Publication, New Delhi, 2010, p. 25

১৯. মল্লিকা সেনগুপ্ত, '*গঙ্গাজন্ম*', তদেব, পৃ. ৮৮

২০. মল্লিকা সেনগুপ্ত, '*মেধাজন্ম*' তদেব, পৃ. ৯৭

২১. সুতপা সেনগুপ্ত, '*নতুন বছর*', তদেব, পৃ. ১২৬

২২. মল্লিকা সেনগুপ্ত, '*চিত্রাঙ্গদা*', তদেব, পৃ. ১২৬

২৩. সুতপা সেনগুপ্ত, '*শীতকাল*', শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ১১

২৪. সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, '*বিবাহঋতু : খ*', তদেব, পৃ. ৯

২৫. সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, '*বর্ণানুক্রম*', তদেব, পৃ. ১০৪

২৬. চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, '*প্রেম*', তদেব, পৃ. ৩১

২৭. মল্লিকা সেনগুপ্ত, '*অনার্যর তির*', শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ১২

২৮. চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, '*বিজ্ঞাপনের মেয়ে*', তদেব, পৃ. ১৩

২৯. অঞ্জলি দাশ, '*বিবাহমন্ত্র*', তদেব

৩০. চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, '*সাদা পাতা তোমাকে*', তদেব, পৃ. ৪৩

৩১. মল্লিকা সেনগুপ্ত, '*আপনি বলুন মার্কস*', শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ৪১

৩২. মল্লিকা সেনগুপ্ত, '*ফ্রয়েডকে খোলা চিঠি*', তদেব, পৃ. ৪৯

৩৩. তদেব

BL College Journal
https://doi.org/10.62106/blc2024v6i1b5
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -VI, Issue-I, June 2024
Pp. 62-81

সৌরভ পত্রিকা ও প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যচর্চা

মিজানুর মণ্ডল

সারসংক্ষেপ

সাময়িকপত্রের ধর্মীয়, সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রচারের মাত্রা কখনো কখনো সামাজিক আন্দোলনের পথকেও সুপ্রশস্ত করে দিয়েছিল। সাময়িকপত্র আরও একটা ভূমিকা সেদিন পালন করেছিল সেটা হল প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পুরনো ঐতিহ্যের যুগোপযোগী করে চলমান সময়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচণ্ড সাহস ও শক্তি। বলতে গেলে উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে প্রাগাধুনিক বাংলা কাব্য কবিতাগুলির আবিষ্কার এবং যথাযথ সম্পাদনা, আলোচনা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণে উৎসাহদান পরাধীন বাঙালির জাতীয় জীবনে অপরিহার্য ছিল নিজের দেশ ও জাতির ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে। সাময়িকপত্রিকাগুলি এই সময়ে সমাজ ইতিহাসের দলিল হিসেবে কাজ করেছে। এই যুগের প্রবণতাগুলি অনুসন্ধানে ইতিহাসের উপাদান হিসেবে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে বিচার বিশ্লেষণ সম্পাদনে উৎসাহদান হিসেবে অতীত ঐতিহ্যের অনুসন্ধান হিসেবে সেদিন আপামর বাঙালি পাঠকের দরবারে হাজির করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল সাময়িকপত্রিকাগুলি। সৌরভ পত্রিকা ময়মনসিংহের অনাবিষ্কৃত তথ্য, প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত বিষয় যথাসাধ্য অনুসন্ধান করে প্রকাশ করেছিলো। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যসাধনা সৌরভের এক প্রধান অঙ্গ ছিল।

মিজানুর মণ্ডল
গবেষক
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা, ভারত
e-mail : mizanurmondal07@gmail.com

মূলশব্দ

প্রাগাধুনিক, সাময়িকপত্র, সৌরভ, ময়মনসিংহ, ঐতিহ্য

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রাচীন কালের সঙ্গে আধুনিক কালের এক অবিচ্ছিন্ন মানসিক ধারা সংযোগ থেকে গেছে। মানুষের জীবনস্পন্দের ইতিহাস কখনোই বিছিন্নভাবে শুধু বর্তমানের মধ্যে পাওয়া যায় না। আধুনিক মানুষ অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সমন্বয়ে নিজের ইতিহাস অনুসন্ধান করে। যে কোনো দেশের মানুষের বর্তমান অস্তিত্বকে সর্বাঙ্গীণভাবে অনুভব করবার জন্য ইতিহাস সচেতনতার প্রয়োজন। মানুষের আত্মপ্রবহমানতার সম্পূর্ণ নির্মাণে অতীত ছাড়া কখনোই

সম্ভব নয়। ঐতিহ্য হয়ে উঠতে পারে নতুন করে অর্থময় ও অনন্ত সম্ভাবনার ক্ষেত্র। মানুষের জীবন, মানস সমাজ ও সংস্কৃতির সম্পূর্ণ নির্মিতির জন্য সম্ভাবনাময় অতীতের দিকে ফিরে তাকানো প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ গবেষক, তারা হয়তো পুরনো এইসব উপকরণ আর খুঁজে পান না। সেই সঙ্গে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পত্রিকার প্রবন্ধগুলি বর্তমানে প্রায় দুষ্প্রাপ্যও বটে। পত্রিকাগুলি খুঁজে প্রবন্ধের সন্ধান করে পাঠ করার অবকাশ বর্তমানে কমও বলা যায়। কিন্তু যেহেতু প্রবন্ধগুলির গুরুত্ব কম নয়, তাই সেগুলিকে একত্রিত করবার, জনসমক্ষে সম্পূর্ণরূপে উপস্থাপন করবার দায়ও গবেষকের থেকে যায়।

পদ্ধতি

লেখাটিতে বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

ভূমিকা

১৩১৯ সালে পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলা থেকে প্রকাশিত হয় সৌরভ নামক মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকার প্রকাশ ও প্রচার কেদারনাথ মজুমদারের এক স্মরণীয় কীর্তি। সুদূর মফস্বল থেকে এই রকম একটি উচ্চমানের পত্রিকা প্রকাশ বাস্তবিকই বিস্ময়কর। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর সংকলিত মৈমনসিংহ গীতিকা-র ভূমিকায় লিখেছিলেন–

"উত্তরে গারো পাহাড়, জয়ন্তা ও খাসিয়ার অসম শৈলশ্রেণী, তাহাদের পদলেহন করিয়া একদিকে সোমেশ্বরী ও অপরদিকে কংস ছুটিয়াছে। এই বিস্তৃত ভূ-খণ্ড ছাড়িয়া দক্ষিণ পূর্বে নানা ধারায় ধনু, ফুলেশ্বরী, রাজেশ্বরী, ঘোড়া-উৎরা, সুন্ধা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র ক্বচিৎ ভৈরব রবে ক্বচিৎ বীণার ন্যায় মধুর নিক্কণে প্রবাহিত হইয়াছে। এই সকল নদ-নদী গুলির অন্তরবর্তী দেশসমূহ এককালে জলের নীচে ছিল। এ সমস্ত প্রদেশটিই এখনও বহু বিল ও জলাশয়কীর্ণ।"[১] এই রচনার প্রায় এগারো বছর পূর্বে, কেদারনাথ মজুমদার (১৮৭০-১৯২৬) তাঁর সম্পাদিত সৌরভ প্রকাশকালে প্রথম সংখ্যার সূচনায় 'আভাষ' শিরোনামের সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন: "সাহিত্য জাতীয় জীবনে এক নব-শক্তি সঞ্চার করে। প্রকৃতির শিক্ষা এবং লৌকিক শিক্ষা সাহিত্যের প্রধান সহায়। ময়মনসিংহের প্রকৃতি সাহিত্যচর্চ্চার অনুকূল। যমুনা এবং ব্রহ্মপুত্র প্রকৃতি ও পুরুষের ন্যায় ময়মনসিংহের পরিচর্য্যা করিতেছে; মেঘনার নীলাম্বু কত গভীর ভাব জাগাইয়া থাকে। উত্তরে উন্নত শৈলমালা, দক্ষিণে নিবিড় অরণ্যানীড় ময়মনসিংহের অপূর্ব শোভা ও সম্পদ।'[২] এই সম্পাদকীয় রচনার উপসংহারে তিনি আরো লিখেছিলেন: 'ময়মনসিংহ জেলা বিস্তৃত, জনসংখ্যা অগণ্য, ইহার ঐশ্বর্য্য প্রচুর।"[৩]

নিছক কোনো রাজনৈতিক উন্মাদনা কিংবা প্ররোচনা জাগাবার উদ্দেশ্য নিয়ে কেদারনাথ পত্রিকা প্রকাশ করতে চাননি, বরং সমাজ ও শিক্ষার নানা সমস্যা সাহিত্যের পাশাপাশি বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে সমসাময়িক ভাবুকদের চিন্তাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সম্পাদক চেয়েছিলেন তাঁর জেলার সাহিত্য শিল্প ও সংস্কৃতির নানা বিষয় সকলের সামনে তুলে ধরতে। যে অন্তর্নিহিত প্রেরণায় তিনি এই কাজে ব্রতী হয়েছিলেন দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সেটি সংক্ষেপে এবং স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিলেন : "সৌরভ সাহিত্যের সাধনায় কোন্ কোন্ উপচার অতিমাত্রায় কিম্বা অল্প মাত্রায় বিতরণ করিতেছে, সে বিচার আমরা করিব না; সৌরভ,

ময়মনসিংহের অনাবিষ্কৃত তথ্য সংগ্রহে যত্ন করিয়াছে; ইতিহাস, ভূগোলে, লোকচরিত্র এবং প্রত্নতত্ত্বে– যাহা জ্ঞাতব্য যথাসাধ্য তাহার সন্ধান লইয়াছে। ময়মনসিংহের প্রবীণ লেখকগণের চিন্তা সংগ্রহ এবং নূতন লেখকের সৃষ্টি সৌরভের সাহিত্যসাধনার এক প্রধান অঙ্গ।"[৪] এই সম্পাদকীয়'র উপসংহারে আরো জানিয়েছিলেন, ময়মনসিংহের চিত্র-শিল্পীদের আঁকা ছবিও মুদ্রণের ব্যবস্থা করবেন। এই উদ্যোগও যথেষ্ট সচেতনতার সঙ্গেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন, কেননা 'ময়মনসিংহ দুই একটী চিত্রকর প্রতিভার স্পর্দ্ধা করিতে পারে।' প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যাতে নরেন্দ্রনাথ মজুমদার লিখেছিলেন : "ময়মনসিংহের স্থানে স্থানে নিবিড় অরণ্য-অন্তরালে, লোকলোচনের অগোচরে এখনও বহু ধ্বংসস্তূপ-স্মৃতি বিরাজ করিতেছে, আমরা ক্রমে তাহা পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিব।"[৫] প্রাচীন গীতিকা, প্রবচন, কথাসাহিত্য উদ্ধারের পাশাপাশি পল্লীর প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে এরকম মমতাময় আগ্রহ সৌরভ-এর প্রচেষ্টার একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য। এই সঙ্গে একথাও উল্লেখ্য, প্রথম তিনবছর 'সাহিত্য সেবক' নামে একটি বিভাগ প্রবর্তন করে লেখকদের পরিচিতি প্রকাশ করা হত।

'সৌরভে' কবিতা ও গল্প প্রকাশিত হলেও তার সংখ্যা ছিল স্বল্প। পত্রিকাটির প্রধান আকর্ষণ হল চিন্তাধর্মী প্রবন্ধ। নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হত 'সৌরভে'। প্রাবন্ধিকদের তালিকায় ছিলেন যতীন্দ্রমোহন সিংহ (শ্রীশিক্ষা), সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ, অমরচন্দ্র দত্ত (ব্রাহ্ম ও খৃস্টান), অনঙ্গমোহন লাহিড়ী (জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনচরিত), যতীন্দ্রনাথ মজুমদার (নারায়ণের রুচিবিকার), অক্ষয়কুমার মজুমদার (বাঙ্গালা ভাষায় প্রাদেশিকতা), রঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী (আর্য সঙ্গীত ও মিঞা তানসেন), মনোরঞ্জন চৌধুরী (কবিওয়ালা তারাচাঁদ), রসিকচন্দ্র বসু, (করটীয়ার শিলালিপি), বিজয়নারায়ণ আচার্য (রাম, সরকার), ঈথবরচন্দ্র গুহ (কীটভূক তর,), রামপ্রাণ গুপ্ত (তিব্বতে মুসলমান সৈন্য), কেদারনাথ সেন (হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন), গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ (বৈষ্ণব দর্শন), উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (আত্মার সক্ষম শক্তি), বনমালী গোস্বামী (চৈতন্য চরিতামৃতের রচনাকাল), হরিচরণ গুপ্ত (প্রলয়), পরমেশপ্রসন্ন রায় (ছোটনাগপুরী হো), প্রিয়গোবিন্দ দত্ত (প্রমাণ না বিশ্বাস) প্রভৃতি।

এইসব লেখকরা কেউই খ্যাতিমান নন। এদের অধিকাংশই কেদারনাথের উৎসাহেই প্রবন্ধ রচনা শুরু করেন। উমেশ ভট্টাচার্য, রজিৎ দাশ, চন্দ্রকুমার দে প্রভৃতি লেখকরা অকপটে কেদারনাথের ঋণ স্বীকার করেছেন। কত কষ্টে, কত দরদ দিয়ে যে কেদারনাথ নতুন লেখক তৈরি করতেন চন্দ্রকুমার দের রচনা থেকে আমরা তা জানতে পারি। তিনি লিখেছেন যে, কেদারনাথই তাঁকে প্রবন্ধ রচনার কৌশল শেখান হাতে কলমে, তাঁর প্রবন্ধ নিয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে নিয়ে সকলের সঙ্গে পরিচিত করান, চন্দ্রকুমার উন্মাদরোগগ্রস্ত হলে নিজের ঘরে রেখে তাঁর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন, বন্ধু, কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস অসুস্থ হলে তাঁরও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন। আমাদের গবেষণাকর্মের সময়পর্বে সৌরভ পত্রিকায় প্রাগাধুনিক বাংলা সম্পর্কিত যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো পর্যালোচনা করা হল।

বিশ্লেষণ

সৌরভ পত্রিকায় ফাল্গুন, ১৩২০ সনের ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যায় শ্রীচন্দ্রকুমার দে 'মহিলা কবি চন্দ্রাবতী' নামক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি প্রথমে কবি চন্দ্রাবতীর পিতা দ্বিজ বংশীদাসের পরিচয় দিয়েছেন।

চন্দ্রাবতী দ্বিজবংশী দাসের একমাত্র কন্যা। প্রাবন্ধিক চন্দ্রাবতী কৃত রামায়ণ গীত থেকে আলোচ্য উক্তির সমর্থন করে দেখিয়েছেন। চন্দ্রাবতী তাঁর রচিত রামায়ণে লিখেছেন–

"ধারাস্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহে যায়
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায়
ভট্টাচার্য বংশে জন্ম, অঞ্জনা ঘড়ণী
বাঁশের পালায় ঘর ছনের ছাউনী।
ঘট বসাইয়া সদা পুজে মনসায়।
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছেড়ে যায়।

* * * *

দ্বজবংশী পুত্র হৈলা মনসার বরে,
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে।
ঘরে নাই ধান চাল চালে নাই ছানি,
আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পাণি
ভাসান গাহিয়া পিতা বেড়ান নগরে,
চালকড়ি যাহা পান আনি দেন ঘরে ।
বাড়িতে দরিদ্র জ্বালা কষ্টের কাহিনী
তার ঘরে জন্ম লৈল চন্দ্রা অভাগিনী
সদাই মনসা পদ পূজে ভক্তিতরে
চালকড়ি পান কিছু মনসার বরে।

* * * *

দুরিতে দরিত্র দুঃখ দিলা উপদেশ
ভাসান গাহিতে স্বপ্নে করিলা আদেশ।
বন্দনায় চন্দ্রাবতী লিখেছেন:-
সুলোচনী মাভা বন্দি দ্বিজেবংশী পিতা,
যার কাছে শুনিয়াছি পুরাণের কথা।"[৬]

চন্দ্রাবতীর কবিত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন–

"তিনিই সাধারণের প্রাণের কবি, চন্দ্রাবতী পূর্ব্ব ময়মনসিংহের সর্বসাধারণের প্রাণের কবি ছিলেন। বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি– সেই অপূর্ব্ব মন প্রাণ মাতান সঙ্গীত। মাঠে কৃষকেরা শিশুর মুখে, আঙ্গিনায় কুলকামিনীদের মুখে, ঘাটে বাটে, মন্দিরে, প্রান্তরে, বিজনে, নদীর পুলিনে সেই সঙ্গীত; বিবাহে, উপনয়নে, অন্নপ্রাশনে, ব্রতে, পূজার সেই সঙ্গীত ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া কানে আসিয়া বাজে, মরমের ভিতর প্রবেশ করে, তারপর সেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর শব্দ স্বর্গরাজ্যের কোন অদৃষ্টপূর্ব বিহঙ্গিনীর ন্যায় স্রোতের মনে তরঙ্গ

ছুটাইয়া উর্দ্ধলোকে মিলিয়া যায়, সেই মৃদুতর শেষ চরণটুকুতে সেই মহিলা কবির স্মৃতিটুকু আনিয়া দেয়। প্রায়ই শুন চন্দ্রাবতীভনে, চন্দ্রাবতী গায়। শ্রাবণের মেঘ ভরা আকাশতলে ভরা নদীতে যখন বাইকগণ সাঁঝের নৌকা সারি দিয়া বাহিয়া যায়, তখন শুনি সেই চন্দ্রাবতীর গান, বিবাহে কুল কামিনীগণ নব বরবধূকে স্নান করাইতে জল ভরণে যাইতেছে সেই চন্দ্রাবতীর গান, তারপর স্নানের সঙ্গীত, ক্ষৌরকার বরকে কামাইবে তার সঙ্গীত, বরবধূর পাশা খেলা, তার সঙ্গীত সে কত রকম।"[৭]

অতপর প্রাবন্ধিক চন্দ্রাবতী পালার আখ্যান সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। চন্দ্রাবতী পালায় আমরা লক্ষ করি হৃদয়ভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাসে এক ব্যর্থ প্রেমের কাহিনি। ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার বিখ্যাত মনসা কবি দ্বিজবংশী দাসের কন্যা চন্দ্রাবতীর ব্যর্থ প্রেমের কাহিনি এই পালায় বর্ণিত হয়েছে। পিতার শিব পূজার জন্য চন্দ্রাবতী প্রত্যহ নির্জন পুকুরের ধারে ফুল তুলতে যায়। একদিন সেখানেই পিতার শিষ্য জয়ানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর দু'জনের দুজনকেই ভালো লেগে যায়। দুজনের এই ভালোলাগা ক্রমশ নিবিড় ভালোবাসায় পরিণত হয়, তারা উভয়ে উভয়ের অন্তরের নিভৃত কোণে নিজেদের প্রেমের আসন প্রতিষ্ঠা করে। চন্দ্রাবতীর পিতা দ্বিজবংশী দাস কন্যার এই হৃদয় দেওয়ার ঘটনা জানতে পেরে কন্যার প্রেমকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য জয়ানন্দের সঙ্গে চন্দ্রাবতীর বিবাহের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বিয়ের আয়োজন প্রায় শেষ এমন সময় চন্দ্রাবতী জানতে পারে জয়ানন্দ অন্য নারীতে আসক্ত হয়ে তাকে বিবাহ করেছে। চন্দ্রাবতী নিজ প্রেমিকের এই বিশ্বাসঘাতকতায় বিমূঢ় হয়ে যায়। ক্ষণপরে তার সেই বিমূঢ় ভাব কাটলে সে পিতার কাছে উপস্থিত হয়ে নিজের কঠোর সংকল্পের কথা জানায়।

পিতা চন্দ্রাবতীর এই কঠোর সংকল্পের কথা শুনে তা অনুমোদন করেন এবং সেই সঙ্গে বাংলা ভাষায় রামায়ণ কাব্য রচনা করার আদেশ দেন-শিবপূজা কর আর লেখ রামায়ণে। (চন্দ্রাবতী) দৃঢ় চিত্ত চন্দ্রাবতী তার কামনা বাসনাকে এভাবে এক কঠোর সংকল্পের মধ্যে বেঁধে ফেলতে সমর্থ হলে জয়ানন্দ নিজের ভুল বুঝতে পারে। অনুতপ্ত চিত্তে সে চন্দ্রাবতীর কাছে উপস্থিত হয়ে নিজ কৃতকার্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে তার দর্শন প্রার্থনা করে। কিন্তু রুদ্ধ দেবালয়ের মধ্যে চন্দ্রাবতী তার হৃদয়কে অসার করার যে সাধনা শুরু করেছিল তাতে জয়ানন্দের প্রার্থনা প্রতিহত হয়ে ব্যর্থ হয়। হতাশ জয়ানন্দ তখন মালতী ফুল দিয়ে তার শেষ কথা মন্দিরের রুদ্ধদ্বারের বাইরে লিখে রেখে নিজের প্রাণ বিসর্জনের জন্য নদীর ঘাটের দিকে এগিয়ে যায়। সেই দিনই চন্দ্রাবতী রূদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করে দেবালয়ের দ্বারে জয়ানন্দের লেখা শেষ কথা দেখতে পেয়ে নদীর ঘাটে উপস্থিত হয়ে দেখে জয়ানন্দের প্রাণহীন দেহ জলের উপর ভাসছে।

জয়ানন্দের দেহ দেখে চন্দ্রাবতীর চোয়াল দৃঢ় ও শক্ত হয়, নির্বাক চন্দ্রাবতী কেবল অপলক দৃষ্টিতে নদীর ঘটের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কাহিনির উপসংহার অংশে চন্দ্রাবতীর এই দৃঢ়তা, সংযম পাঠকচিত্তকে অভিভূত করে।

শ্রাবণ ১৩২০ সনের ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যায় শ্রীরসিকচন্দ্র বসু 'প্রাচীন সাহিত্যে প্রাচীন সমাজ চিত্র' নামক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তবে আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক মূলত নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ কাব্যের সমাজচিত্রই তুলে ধরেছেন। আমরা জানি নারায়ণ দেব ময়মনসিংহের প্রাচীন কবি। ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার

অধীন তাড়াইল থানার অন্তর্গত নসিরুজিয়াল পরগণার বোরগ্রামে ছিল কবি নারায়ণ দেবের বসতি। আর সৌরভ পত্রিকা প্রকাশিত হয় ময়মনসিংহ থেকেই কাজেই প্রাবন্ধিক শ্রীরসিকচন্দ্র বসু প্রাচীন সাহিত্যে সমাজচিত্র আলোচনা করতে গিয়ে ময়মনসিংহের প্রাচীন কবি নারায়ণ দেবের পদ্মা পুরাণ কাব্যের সমাজচিত্রই আলোচনা করেছেন। প্রাবন্ধিক ভূমিকাতেই জানিয়েছেন–

"কবি নারায়ণ দেব, ময়মনসিংহের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কবি। বর্তমান সময়ের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে নারায়ণ, তদীয় 'সুরস পাঁচালী'– পদ্মাপুরাণ রচনা করেন। সুতরাং পদ্মপুরাণে আমরা পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বের এতদ অঞ্চলের সমাজ চিত্র-শিক্ষা, সভ্যতা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, গৃহস্থালী, বাণিজ্য, ঐশ্বর্য্য ও দারিদ্র্যের চিত্র দেখিতে পাই।"[৮]

অতঃপর প্রাবন্ধিক পর্যায়ক্রমে নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ কাব্যের শিক্ষা, জাতি, গৃহ, গৃহিণী, বিবাহ, রন্ধন ও ভোজন, দাস-দাসী ও বিবাহ পদ্ধতি নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। শিক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন–

"সে কালে টোল বা চতুষ্পাঠীই শিক্ষাগার ছিল। এক এক জন অধ্যাপক বিদ্যা-কল্পদ্রুম হইয়া একাকী শত শত শিষ্যকে নানা বিদ্যা-কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, স্মৃতি, তন্ত্র ও পুরাণাদি শিক্ষা দিতেন। এই শিক্ষা ব্রাহ্মণের জন্য মুখ্যরূপে বিহিত হইলেও ইহার ব্যাপ্তি ঘটিয়াছিল। গন্ধবণিক চাঁদ ও লক্ষীন্দর সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ হইয়াছিলেন। পিঙ্গলাচার্য্য-রচিত ছন্দঃশাস্ত্র সে কালে পঠিত হইত। বেদের চর্চ্চা ছিলনা।"[৯]

জাতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন ব্রাহ্মণেরা সেকালে ও একালে সমাজের শীর্ষস্থানীয় হলেও পদ্মাপুরাণে কিন্তু ব্রাহ্মণ প্রভুতার চিহ্ন নেই। গন্ধবণিকদেরই সেকালে সমাজে সর্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠাবান দেখা যায়। তাছাড়া গ্রাম্য দেবতারা–চণ্ডী, মনসা, সত্য- নারায়ণ,– গন্ধবণিকদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এই গন্ধবণিকেরা কেবল লক্ষপতি কোটীপতি ছিলেন না, বিদ্যা, বিনয়ে চরিত্র উজ্জ্বল ছিল। গ্রাম্য দেবতারা সহজে এঁদের গৃহে আসন পাননি। চণ্ডীমঙ্গলের শৈব ধনপতি খুল্লনার 'মেয়েদেবতা' চণ্ডীর ঘট লাথি মেরে ভেঙ্গে ছিলেন, পদ্মাপুরাণের চাঁদ সওদাগরের হেতালের লাঠির চোটে পদ্মার কাকালে বেদনা হয়েছিল এসকল বর্ণনায় গন্ধবণিকদের চরিত্রগত একটা তেজ ফুটে উঠেছে। একালের বণিক সমাজে সে তেজের আর চিহ্নও নেই। কি বিস্তার হিসেবে কি অর্থ ও সম্মানের হিসেবে বর্তমানে বণিক সমাজের অধঃপতন হয়েছে বলে প্রাবন্ধিকের মনে হয়েছে।

"সৌরভ পত্রিকায় চৈত্র ১৩২০ সনের ২য় বর্ষে ষষ্ঠ সংখ্যায় চন্দ্রকুমার দে চন্দ্রাবতীর গীত অবলম্বনে লেখেন 'দস্যু কেনারাম নামক প্রবন্ধ। দর্স্যু কেনারামের পালা' এতদঞ্চলের একটী কৌতূহলপূর্ণ ঘটনা। সুকণ্ঠ গায়কগণ আজও কেনারামের পালা গাহিয়া বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করেন। ইহার সঙ্গে দেশের বহু কালের বিগত স্মৃতি বহু পরিমাণে জড়িত আছে। আজ আমরা তাহার কিঞ্চিন্মাত্র আভাস প্রদান করিলাম।"[১০]

পূর্ববঙ্গের ধারার মনসামঙ্গলের অন্যতম প্রধান কবি দ্বিজ বংশীদাস। তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর পিতা। দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে সর্ব প্রথম এই কবির পরিচয় উদ্ধার করেন। প্রাচীন পালাগান সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে ময়মনসিংহ থেকে লোকমুখে প্রচলিত পালাগান সংগ্রহ করতে গিয়ে বংশীদাসের বিস্তারিত পরিচয় সংগ্রহ করেন। এবং সেই সমস্ত তথ্য 'সৌরভ' পত্রিকায় দুই কিস্তিতে

প্রকাশ করেন ১৩২০ সালে। ১৩১৮ সালে দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ও রামনাথ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় সর্ব প্রথম দ্বিজ বংশীদাসের 'পদ্মাপুরাণ' সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এতে বংশীদাসের কবি পরিচয় সম্পর্কে অনেক তথ্য বিবৃত হয়েছে। দ্বিজ বংশীদাসের মুদ্রিত পুঁথিতে যে আত্মবিবরণী আছে, তা থেকে জানা যায় যে কবির এক পূর্বপুরুষ রাঢ় দেশ ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে ময়মনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ মহাকুমার অন্তর্গত পাতোয়ারি গ্রামে বসবাস করতেন। এখানেই দ্বিজ বংশীদাসের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম যাদবানন্দ, মাতার নাম অঞ্জনা। বংশীদাসের আত্মবিবরণীতে কালজ্ঞাপক যে শ্লোকটি রয়েছে তা হল–

"জলধির বামেতে ভুবন মাঝে দ্বার।
শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার।।"[১১]

এটির অর্থ হল বংশীদাস ১৪৯৭ শকাব্দে বা ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে পদ্মাপুরাণ রচনা করেন। কিন্তু ড. সুকুমার সেন, ড.আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ পণ্ডিতগণ বংশীদাসকে এত প্রাচীন কবি বলে মনে করেন না। সাধারণত বংশীদাসকে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থাপন করা হয়। বংশীদাসের কাব্যে আত্মবিবরণীতে হাজরাদি পরগণার অন্তর্গত পাতুয়ারী গ্রামের কথা বলা হয়েছে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন যে ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে বার ভুঁইয়ার অন্যতম ঈশা খাঁ মানসিংহ দ্বারা পরাজিত হওয়ার পরে হাজরাদি পরগণার সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিজ বংশীদাসের রচনায় মগ, ফিরিঙ্গির উল্লেখ আছে। সে কালে পর্তুগিজদের ফিরিঙ্গি বলা হত। এই উল্লেখের জন্য অনেকেই বংশীদাসের পূর্বোক্ত কাল সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আবার ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ জানিয়েছেন– "রালফফি (১৬০৬ খ্রীঃ) পূর্ববঙ্গে ঈসাখাঁর রাজ্যে অনেক পর্তুগীজকে বসবাস করিতে ও প্রভুত্ব খাটাইতে দেখিয়াছেন। কাজেই ফিরিঙ্গিদের উল্লেখের জন্য বংশীদাসকে ১৫৭৫-৭৬ খ্রী. এর পরবর্তী মনে করিবার কোনও কারণ নাই।"[১২] আবার আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন যে, দ্বিজ বংশীদাস সতেরো শতকের পূর্ববর্তী লোক হতে পারেননা। তবে সবদিক বিবেচনা করে তিনি দ্বিজ বংশীদাসকে সতেরো শতকের মধ্যবর্তী লোক বলে মনে করেছেন। কবি তাঁর কাব্যে এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়েছেন–

"বন্দ্যঘটি গাইগোত্র রাঢ়ীর প্রধান।
শাণ্ডিল্য গোত্র বলি যাহার বাখান।।
গৌতম মুনির শাখা তৃতীয় প্রবর।
দাস উদ্ধব ধারা সামদেব পর।।
বংশ বীজ পূর্বে গোঁসাই চক্রপানি।
ভূত ভবিষ্যৎ আদি ত্রিকাল সে জ্ঞানী।।"[১৩]

তাছাড়া দ্বিজ বংশীদাসের সুযোগ্য কন্যা বাংলায় সুপরিচিত 'মহিলাকৃত্তিবাস' চন্দ্রাবতী তাঁর অনূদিত রামায়ণে পিতার যে পরিচয় দিয়েছেন তা হল–

"ধারা স্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহে যায়
বসতি যাদবা নন্দ করেন তথায়
ভট্টাচার্য বংশে জন্ম, অঞ্জনা ঘরনী

বাঁশের পালায় ঘর ছনের ছাউনী।
ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায়
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছেড়ে জায়।"[১৪]

এ ছাড়াও চন্দ্রাবতী রচিত 'ময়মনসিংহ গীতিকায়' 'দস্যু কেনারামের পালা' থেকে আমরা অবগত হতে পারি যে সুকণ্ঠ গায়ক কবি দ্বিজ বংশীদাস মনসার ভাসান গান গেয়ে বেড়াতেন। এই গান শুনেই দস্যু কেনারামের পাষাণ মনও দ্রবীভূত হয়ে গিয়েছিল। এবং সে বংশীদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। ঘটনাটি ছিল এইরূপ, একবার দ্বিজ বংশীদাস তাঁর মনসার গানের দল নিয়ে কোনো এক স্থানে যাচ্ছিলেন। পথের মধ্যে কেনারামের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়। কেনারাম দলবলসহ তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হল। বংশীদাস জন্মের শেষ মতো একবার মনসার গান করবার আবেদন করলেন।

মহাকবি বলিলেন– 'কেনারাম একটু সবুর কর, আজ আমার জীবনের শেষ দিন, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছি, একবার জন্ম শোধ গাহিয়া লই, জীবনের শেষ গান।' কেনারাম বলিল– "তবে গাও ঠাকুর যতক্ষণ পর্য্যন্ত আবার খাণ্ডা হাতে না লই।" তখন–

"আকাশ চাঁদোয়া হইল, শুনে পশু পাখী
কেনারাম বসিল হাতের খাণ্ডা রাখি,
উড়ে যায় পাখী আসি বসিল ডালেতে,
মনসা ভাসান গায় অঙ্গনার সুতে।

বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর দূর্ব্বা শ্যামল গালিচা পাতার তার উপর কেনারাম দলবলসহ বসিয়া গেল। গীত আরম্ভ হইল। আজিকার এই গান ইহ জীবনের শেষ গান। তাহার প্রতি কথায়, প্রতি অক্ষরে, অশ্রুধারা বহিতে লাগিল, শ্রোতা গায়ক সকলেরই মন গলিয়া গেল। আজিকার এই গান কেনারামের জন্য নহে, এ মর জগতের জন্য নহে, আকাশ প্রান্তর প্লাবিত করিয়া চন্দ্র সূর্য্যকে পিছনে ফেলিয়া গায়কের কণ্ঠস্বর বিধাতার সিংহাসন তল পর্যন্ত পৌঁছিল। সন্ধ্যা মিলাইয়া গেল, নীল চন্দ্রাতপ তলে হীরার ঝার জ্বলিতে লাগিল। অন্ধকার যখন ঘনীভূত হইয়া আসিল, তখন প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া দস্যুগণ মশাল জ্বালিয়া দিল।"[১৫]

দ্বিজ বংশীদাস গান আরম্ভ করলেন, কেনারাম শুনতে লাগলেন। যখন বংশীদাস বেহুলার ভাসান অংশ গাইলেন, তখন কেনারাম হাতের খাঁড়া দূরে ফেলে দিয়ে দ্বিজ বংশীর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। আজন্ম সঞ্চিত পাপের জন্য তার অনুতাপের সীমা রইলনা–

কেনারাম স্নান করিল, পুণ্যস্রোতে যেন তাহার পাপ-জীবনের সমস্ত কলঙ্ক ধৌত হইয়া গেল; মনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আকৃতিরও সহসা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিল। এইরূপে মহাপুরুষ-সংস্পর্শে কেনারাম অচিরেই নবজীবন লাভ করিল, এবং মহাকবির প্রিয়তম শিষ্য ও সুকণ্ঠ গায়ক বলিয়া দিনদিন প্রসিদ্ধি লাভ করিতে লাগিল। তারপর প্রভুর সমস্ত সদ্‌গুণরাশির অধিকারী হইয়া একদিন–

"কেনারাম কহে প্রভু ঘরে যাও তুমি
চাউল কড়ি যাহা পাই লয়ে আসি আমি।"[১৬]

এইভাবে মহাকবি তাঁর জীবনের সমস্ত কার্যভার কেনারামের উপর অর্পণ করে দিয়ে ঘরে গেলেন, কেনারাম নগরে ঘুরে ঘুরে "মনসা ভাসান" গেয়ে বেড়াতে লাগল। যে কেনারামের নাম শুনলে লোকে প্রাণ ভয়ে শিহরি উঠত, সেই কেনারামের গানে আজ সমস্ত দেশ পুলকে রোমাঞ্চিত হতে লাগল।

"এইরূপে ভাসান প্রচারে ঘরে ঘরে,
পাষাণ গলিয়া জল বহে শত ধারে,
কেনারাম গায় গান ঝরে বৃক্ষের পাতা,
পয়ার প্রবন্ধে ভনে দ্বিজবংশী সুতা।"[১৭]

এইভাবেই দ্বিজ বংশীদাস হয়ে উঠেছিলেন পূর্ববঙ্গের প্রাণের কবি। গ্রামে গ্রামে দলে দলে সুকণ্ঠ গায়কগণ ও কবি দ্বিজ বংশীদাস দল বেঁধে কবিকৃত মনসার ভাসান গান গেয়ে বেড়াতেন। গ্রামের দিকে প্রথমে মানুষজন সখ করে ধান, চাল, পয়সাকড়ি দিয়ে গান শুনত। কিন্তু ক্রমে তিনি ভাবের প্লাবনে দেশকে মাতিয়ে তুললেন। আর সেই অমর সঙ্গীতে কেনারামের পাষাণ হৃদয়ও গলে গেল। তাইত তিনি শেষে নিজেকে কবির চরণে নিবেদন করতে চাইলেন। কবির ভক্তির প্লাবনে ও ভালোবাসায় দেশের সমস্ত কুরীতি কুপ্রথা যেন এইভাবে অদল বদল হয়ে গেল। তাই চন্দ্রকুমার দে মন্তব্য করেছেন– "বহু শতাব্দী পার হইয়া গিয়াছে, আজও পূর্ববঙ্গ সে স্বর্গীয় সুধার আশ্বাস ভুলিতে পারে নাই, আজও মনসা পূর্ববঙ্গে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা, আজও মেঘভরা আকাশ ভুলে পল্লী কুটিরে বসিয়া লোকে সেই অমর সঙ্গীত গান করে। আজও সেই গীত শুনিয়া বরিষার ধারার ন্যায় কুল কামিনীগণ অশ্রু ধারা বর্ষণ করেন। আজও ময়মনসিংহের শিক্ষিতা ও অশিক্ষিতা ও অর্ধশিক্ষিতা কুল-ললনাগণ নাটক নোবেলের কথা দূরে রাখিয়া পদ্মাপুরাণের নায়িকা বেহুলার পূত চরিত্রের কথা ভাবিতে তন্ময় হইয়া পড়েন।"[১৮]

সৌরভ পত্রিকায় শ্রাবণ, ১৩২১ সনের ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যায় চন্দ্রাবতীর গীত অবলম্বনে চন্দ্রকুমার দে লিখেছেন 'মনসার ভাসান' নামক প্রবন্ধ। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি মূলত বেহুলা চরিত্রকে সামনে রেখে চন্দ্রাবতীর মনসার ভাসান গান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

আমরা জানি মনসামঙ্গল কাব্যের এক উল্লেখ যোগ্য চরিত্র হল বেহুলা। মূলত এই চরিত্রকে সামনে রেখেই কাব্যের মূল উদ্দেশ্য দেবী মনসার পূজা প্রচার সেটা সাধিত হয়েছে। এই বেহুলার পূর্ব ইতিহাস আমরা জানি। সে শাপভ্রষ্টা ঊষা, দৈত্যরাজ বাণের কন্যা। স্বামী লখিন্দরের মৃত্যুর পর সকলের অনুরোধ বেহুলা প্রত্যাখ্যান করে আপন ইচ্ছা ও সংকল্পকে আঁকড়ে ধরে থেকে অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। সেখানেও তাঁর এই আত্মবিশ্বাসের ছবিটি পরিস্ফুট হয়েছে। লখিন্দরের মৃত্যুতে বেহুলার কোনো দোষ ছিলনা। কিন্তু বেহুলার মৃত্যু সংবাদে পাড়াপড়শি এমনকি সনকার দ্বারাও শুরু হয় বেহুলার উপর মানসিক অত্যাচার। সনকা তো সরাসরি বেহুলাকে বলেই দিলেন– 'খণ্ড কপালিনী চিরুনিয়া দাতী' বলে উল্লেখ করেছেন। সনকার কথা মতো বেহুলাই যেন লখিন্দরকে সর্প রূপ ধরে দংশন করেছে। এই সময় বেহুলার অন্তর ছারখার হলেও, সনকার অভিযোগের

কোনো উত্তর দেয়নি। নীরবে সহ্য করেছেন। এমনকি বেহুলার সমাজ বাস্তবতার জ্ঞানও ছিল প্রচুর। কেননা বেহুলার দাদারা এসে নদীতে ভাসমান বেহুলাকে দেখে কাতর হন। দাদারা পরামর্শ দেয় মৃত দেহ পরিত্যাগ করে তাদের গৃহে ফিরে আসতে। তারা এও জানায় যে সাত ভাইয়ের সংসারে বেহুলার কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু সমাজ অভিজ্ঞ বেহুলা জানতেন, বিয়ের পর দাদাদের সংসারে আগের মতো মূল্য পাবে না। অতঃপর বেহুলা মৃত স্বামী লখিন্দরকে নিয়ে স্বর্গের পথে যাত্রা করে। এই যাত্রা পথও খুব একটা মসৃণ ছিলনা। ছিল নানা বিপদ ও প্রলোভন। বেহুলাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করার জন্য দেখা যায় নানান ঘাটে নানা পুরুষ অবস্থান করেছে। এইভাবে ঘোর অন্ধকার বিপদে পড়লেও বেহুলার বুদ্ধি, ধৈর্যনাশ হয়নি। সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে নিজের আয়ত্তে আনতে পেরেছিল। এরপর নেতর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যেও আমরা আর এক বেহুলাকে খুঁজে পাই। সেখানে তার বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় মেলে। অজানা অচেনা পরিবেশে মানুষের মন কিভাবে জয় করতে হয় বেহুলা তা জানে। তাইতো সে নেতকে মাসি বলে সম্বোধন করে নেতর মন জয় করে নিয়েছে। আর এই আত্মীয়তার সুতো ধরেই বেহুলা দেবসভায় সহজেই হাজির হতে পেরেছে। দেবকুলের দৃষ্টি নিজের দিকে আকৃষ্ট করে শুধু মৃত স্বামী নয়, চম্পকনগরে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল ছয় ভাসুরসহ চোদ্দ ডিঙ্গাও। এমনকি চাঁদও পুত্রবধূর এই সাফল্যকে অস্বীকার করতে পারেননি। স্নেহের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে বেহুলার অনুরোধে বাম হাতে হলেও মনসার পূজা দিয়েছিলেন।

"শ্রাবণ মাস আসিলেই মনে পড়ে, সেই হতভাগিনী, সেই জন্ম দুঃখিনী বেহুলার কথা। চারিদিকে জলদকুন্তলা হাস্যময়ী প্রকৃতির শ্যামচ্ছবি, উপরে জলদজালজড়িত আকাশ, দূরে শ্যামল বনরাজি, শিরোভাগে ধূম্রকিরীট শোভী গিরিশৃঙ্গের অপূর্ব্ব শোভা, নীচে স্বর্ণচূড়া শস্য ক্ষেতে সকল ফলভরে অবনত। এই সময় বাঙ্গালার গৃহে গৃহে নবান্ন, দিকে দিকে আশার গান, চারিদিকে বিমলানন্দ। তারই মধ্যে কে যেন কোথা হইতে অলক্ষিতে থাকিয়া আপন করুণ বীণাটী, রহিয়া রহিয়া বাজাইয়া দিতেছে। তাহার সেই মর্ম্মস্পর্শী প্রতি করুণ ঝঙ্কারে, মনে পড়ে সেই হতভাগিনী, সেই চিরদুঃখিনী বেহুলার কথা। যখন দিগন্তে মেঘের গুড় গুড় ধ্বনিতে শৈশবের জীর্ণ পুরাতন স্মৃতি একটা একটা করিয়া মনের ভিতর জাগাইয়া দেয়, সেই সঙ্গে মনে পড়ে দুঃখিনী বেহুলার কথা। শ্রাবণের রৌদ্র স্নাত নদীতে যখন বাইকগণ সাজের নৌকা সারি দিয়া বাহিয়া যায়, যখন তাহাদের সেই–

কালনাগ মাঞ্জসে গেল লখাইরে দংশিয়া,
সায়রে ভাসিল বেহুলা পতি কোলে লইয়া।"[১৯]

বাস্তবিক বাংলাদেশের পক্ষে, বিশেষতঃ ময়মনসিংহবাসীর পক্ষে শ্রাবণ একটা স্মরণীয় মাস। সুখে দুঃখে গড়া এই মাস বুঝি আর নাই। হর্ষ বিষাদের এমন মাস আর দেখা যায় না। হাসি ও অশ্রুতে গড়া শ্রাবণ মাস ময়মনসিংহবাসীর বড় আদরের, এই সময় ময়মনসিংহের সার্বজনীন দুর্গোৎসব বা মহাশক্তির অংশরূপিনী নাগ মাতা বিষহরীর অর্চ্চনা হয়ে থাকে। মেয়েরা শ্রাবণী পঞ্চমীতে ঘট স্থাপন করে, সারা মাস নিত্য সন্ধ্যাকালে মণ্ডপে ধূপ ধূনা জ্বালিয়ে, হুলুধ্বনিতে আকাশ প্লাবিত করে নিজ নিজ আবাসে নাগমাতার অধিষ্ঠান কামনা করেন। এবং পুরুষেরা প্রত্যহ খোল করতাল সংযোগে তাদের সেই চির আদরের পুরাতন কাহিনী গান করে দুঃখ, দৈন্য অবসাদের হাত থেকে কিছু দিনের জন্য মুক্তি কামনা করে। মেয়েরাও এই সময় নিশ্চেষ্ট থাকেন না। অবসরকালে পাড়ার সমস্ত সঙ্গীরা মিলে বেহুলার পবিত্র স্মৃতি নিয়ে তাদের কণ্ঠগাথা এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত

গান করে থাকেন। এই সঙ্গীতের রচয়িতা আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধে বর্ণিতা মহিল কবি চন্দ্রাবতী। তবে প্রচলিত নারায়ণ দেব ও বংশী দাসের পদ্মাপুরাণ থেকে এই গীত একটু স্বতন্ত্র রকমের। আখ্যানবস্তু, ছন্দ ও সুর বিভিন্ন রূপ।

মনসামঙ্গল কাব্য ধারায় দ্বিজ বংশীদাস একজন শীর্ষস্থানীয় কবি। মনসামঙ্গল গল্পের কেন্দ্রবিন্দু ছিল স্ত্রী দেবতা মনসার সঙ্গে শিবসাধক চন্দ্রধরের বিরূপতা। বংশীদাসের কাব্যে চাঁদ মনসার সেই বিরোধের কাহিনি পরিবর্তিত হয়েছে। তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে বৈষ্ণবধর্ম প্রভাবিত সমন্বয়মূলক মনোভাব। আর এই কারণেই তাঁর চাঁদ সওদাগর প্রথমে চণ্ডী ও মনসা এই উভয় দেবীর প্রতি সমদর্শী ছিলেন। কিন্তু পরে চণ্ডীর তাড়নায় চাঁদ মনসার সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। শৈব চাঁদের সঙ্গে মনসার দ্বন্দ্বের পরিবর্তে চণ্ডী ও মনসার বিবাদের কথাই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা মূলত চণ্ডী ও মনসার বিবাদ, চাঁদ সদাগর উপলক্ষ মাত্র। দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে চাঁদ সদাগর ও মনসার বিরোধ একটু অন্যভাবেই সূচিত হয়েছে। তাঁর কাব্যে দেখা যায়, চাঁদ আগে থেকেই মনসা পূজা করতেন–

"কর যোড়ে ভক্তি ভাবে করিলেক স্তুতি।
ব্রহ্মা স্বরূপিনী তুমি আদ্যা প্রকৃতি।।
যেই দুর্গা সেই তুমি জগতের মাতা।
অভেদ চণ্ডিকা তুমি নাহিক অন্যথা।।"[২০]

কিন্তু রাত্রে চণ্ডী এসে চাঁদকে স্বপ্নাদেশে মনসাকে কটাক্ষ করে মনসার পূজা করতে নিষেধ করেন। এবং তারপর থেকেই চাঁদ মনসার বিরোধী হয়ে ওঠেন।

কবি চন্দ্রাবতীর গানে দেখা যায় জালু মালুই পদ্মা পূজার প্রথম প্রবর্তক। তবে হালুয়া বছাইরও নাম পাওয়া যায়। বন্দনা গীতির পরে কবি চন্দ্রাবতী এক স্থানে গেয়েছেন–

"জালুর পুত্র কানাইয়া গো জাল বাহিতে যায়,
পদ্মার আদেশে কাল দংশে তাহার পায়।
পার্বতী কানায়ার মাও এই কথা শুনি,
আউলাইয়া মাথার কেশ গো ছুটে পাগলিনী।
হেনকালে তথায় গো একটী যোগিনী
ছাই যারা সর্ব অঙ্গে গো গলদেশে ফণী।
চূড়াকারে বান্ধা কেশ গো পিঙ্গল বরণ,
পার্বতী কান্দিয়া ধরে গো তাঁহার চরণ।
আউলা পার্বতী গো, বলিছে মোর মাও
বিনামূলে হব দাসী গো ছাওয়ালে জীয়াও।।"[২১]

পদ্মার কৃপায় কানাইর প্রাণ বাঁচল। দেবী কৌশলে পার্বতীকে আপন পূজার উপদেশ দিয়ে অন্তর্হিত হলেন। তখন পার্বতী–

"পঞ্চবর্ণের গুড়িতে গো অষ্টনাগ আঁকিয়া
তাহাতে স্থাপিল ঘট ভক্তি যুক্ত হকিয়।
জয়াদি জোকার দিয়া গো পূজয়ে মনসা
পার্বতীর হুইল পূর্ণ মনের যত আশা।"[২২]

ক্রমে এই কথা দেশময় রাষ্ট্র হল। জালু এখন লক্ষেশ্বর; সে সোনার ভৃঙ্গারে জল খায়, রূপার পালঙ্কে পার্ব্বতীকে নিয়ে নিদ্রা যায়। কানাইয়াকে আর মাছ ধরতে হয় না। রত্নবতী নামে এক মৎস্য ব্যবসায়ী ধনবান সওদাগরের কন্যাকে বিবাহ করে জলটুঙ্গীর উপর বসে বসে হাওয়া খায়। এই কথা শুনল চাঁদের স্ত্রী সনকা। সাধারণত দেবদেবীর উপর যতটা ভক্তি বিশ্বাস থাকে, সনকার তদপেক্ষা কিছু অধিক ছিল। রাজপাটেশ্বরী তৎক্ষণাৎ জালুর স্ত্রীকে আনবার জন্য সুবর্ণ শিবিকা প্রেরণ করলেন। এবং অচিরেই তার নিকট থেকে পদ্মা পূজার সমস্ত বিবরণ অবগত হলেন। অচিরেই মহাপূজার ধূম পড়ে গেল। সোনার মন্দিরে সোনার ঘট স্থাপিত হল। কাঁসর ঝাঁজরী শঙ্খ ধ্বনিতে, জয়-মঙ্গল গীতে, চম্পক মুখরিত হয়ে উঠল। অগুরু, ধূপ, ধূনার গন্ধে আকাশ ভরে গেল।

এই সংবাদ চন্দ্রধরের কানে গেল। শৈব-চূড়ামণি চন্দ্রধর, পাছে নব দেবতার পূজায় ব্যস্ত সনকা, তার চির উপাস্য চন্দ্রচূড়কে অবহেলা করেন, এই ভয়ে হেমতাল নামক তার ভীম দর্শন তালের যষ্টি হাতে করে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। উপরে রত্ন বেদিকার উপর স্থাপিত সুবর্ণ ঘট, নীচে শিলাসমে ধ্যানমগ্ন সনকা। সনকা মন প্রাণ পদ্মার চরণে উৎসর্গ করে বসে আছেন। সহসা মন্দিরের ভিতর দুম করে শব্দ হল, চক্ষু মেলে সনকা দেখলেন, স্বামী তার মহাপূজার সর্বনাশ সাধন করে, মন্দির থেকে বার হচ্ছেন। ভগ্ন ঘট শতখণ্ড হয়ে রত্নবেদির উপর গড়িয়ে পড়েছে। সনকা চৈতন্য হারালেন। দাম্ভিক রাজা তৎক্ষণাৎ বাইরে এসে–

"ঘোষণা করিয়া দিলা গো সপ্ত শত ঢলে।
যে করিবে পদ্মা পূজা তারে দিবে শূলে।।"[২৩]

এইভাবে মনসার সঙ্গে চাঁদ সওদাগরের বিবাদের সূত্রপাত।

সৌরভ পত্রিকায় পৌষ ১৩২৪ সনের ষষ্ঠ বর্ষে তৃতীয় সংখ্যায় শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য 'সাধক রামপ্রসাদ ও কবি রামপ্রসাদ' নামক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি জানিয়েছেন–

"কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া প্রসাদের জীবনী আলোচনার দ্বার খুঁজিতেছিলাম। বহু চেষ্টায় স্বর্গীয় দয়ালচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক সংগৃহীত রামপ্রসাদী গানের বহি হাতে পাইয়া বড় আনন্দ হইল। আকুল আগ্রহে বহিখানি পড়িয়া দেখিলাম, ইহাতে দুইজন রামপ্রসাদ চিহ্নিত হইয়া আছেন। একজন কবিরঞ্জন আর একজন দ্বিজ রামপ্রসাদ। সেই সময় হইতে রামপ্রসাদের সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ হয়। যতদূর জানিলাম তাহার বিবরণ লইয়া ১৩১৯ সালের মাঘ মাসে ঢাকা সাহিত্য পরিষদে উপস্থিত হই। ঐ সালের চৈত্র সংখ্যা 'প্রতিভায়' প্রকাশিত হয়। তাহার পর রামপ্রসাদ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিয়াছি। আজ সেই সকল বিবরণের সংক্ষিপ্ত সার এখানে উপস্থিত করিতে প্রয়াস পাইব।"[২৪]

প্রাবন্ধিক বাবু দয়ালচন্দ্র ঘোষের উদ্ধৃতি তুলে ধরে জানিয়েছেন যে, দয়াল বাবু প্রসাদী সঙ্গীত সংগ্রহ করে কেবল মাত্র কবিরঞ্জনই এটার রচয়িতা এমন বলেননি। পূর্ব্ববঙ্গেও এক রাম প্রসাদের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেছেন। তবে আর অধিক অনুসন্ধান না করেই দয়াল বাবু কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনকেই 'দ্বিজ' রামপ্রসাদ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। এক্ষেত্রে দয়াল বাবু অতি দুর্বল কতিপয় প্রমাণ উপস্থিত করেছেন বলে প্রাবন্ধিকের মনে হয়েছে। তবে ১৩০২ সনের শ্রাবণ সংখ্যা 'নব্যভারতে' শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয়ও 'দ্বিজ' ভনিতা অর্থহীন প্রমাণিত করে রামপ্রসাদকে 'কায়স্থ' প্রতিপন্ন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ঐ সালের পৌষের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত রসিক বাবুর লেখার প্রতিবাদ করেন। তবে প্রাবন্ধিক শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় জানিয়েছেন কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক।

অতঃপর প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন দ্বিজ রাম প্রসাদের সাধন পীঠস্থান ছিল ঢাকা জিলার চিনিসপুরগ্রাম। টঙ্গী ভৈরব রেলপথের নরসিংদী বা জিনারদী ষ্টেশন থেকে অনতিদূরেই গ্রামটি অবস্থিত। এমনি কি দ্বিজরাম প্রসাদকে কেউ কেউ নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের সহোদর ভ্রাতা বলে নির্দেশ করেন। তবে উক্ত অঞ্চলে দ্বিজরাম প্রসাদকে নিয়ে অনেক প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে। শোনা যায় যে রামপ্রসাদ শিশুকাল থেকে উত্তম গান করতে পারতেন এবং প্রসাদের সঙ্গীতে পশুপক্ষী পর্যন্ত মুগ্ধ হত। কথিত আছে একদিন রামপ্রসাদ স্নান করে গৃহে আসলে তাঁর মাতা জানাই– যে, এক অপূর্ব্ব সুন্দরী বালিকা বলে গেল রামপ্রসাদ যেন কাশী গিয়ে তাকে গান শুনায়। রামপ্রসাদ মায়ের নিকট এই কথা শুনেই বালিকার অনুসরণ করলেন আর গান ধরলেন–

"তোমরা নি কেউ দেখেছরে ভাই, তোমরানি চিন তারে।
এই পথে মোর জগদম্বা মা গেছেন কত দূরে।
মা আমার জগৎকর্ত্রী, জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী
মায়ের রূপে জগৎ আলো শমন পলার যার ডরে।।"[২৫]

অবশ্য এই গানের অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায় না বলে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন।

পরিশেষে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন রাম প্রসাদ কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের গৌরব নয়– সমগ্র বঙ্গের আদরের সামগ্রী। বঙ্গের আবালবৃদ্ধ বণিতা সকলেই রামপ্রসাদের নামে মুগ্ধ। অথচ পূর্ববঙ্গের লোক তাঁর সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

রামপ্রসাদের পূর্ব্ববঙ্গের আপন স্বত্ব সংরক্ষণে প্রচেষ্টার আশ্চর্য ঔদাসীন্য লক্ষ করে প্রাবন্ধিক দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছেন–

"এবার পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজের সম্পাদক কর্মবীর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আহ্লাদের সহিত প্রস্তাবটী গ্রহণ করিয়াছেন। দেখা যাউক কার্যক্ষেত্রে কতদূর গড়ায়। এইখানেই পশ্চিমবঙ্গের সহিত আমাদের ব্যবধান অত্যন্ত পরিস্ফুট। তাঁহারা খুঁজিয়াই রামপ্রসাদের ভিটা নির্দ্দেশ করিয়াছেন– সদলবলে সেখানে যাইয়া অতীতের চিত্র সকলকে দেখাইতেছেন, কৃত্তিবাসের দেশে সভা করিয়া কবির প্রতি সম্মান দেখাইতেছেন। আর আমাদের এতবড় গৌরবের সামগ্রী রামপ্রসাদের সঠিক সংবাদ পাইয়াও আমরা একটু কিছু করিতে রাজী নহি। কেবল পরের ঘাড়ে বন্দুক রাখিয়া গুলি ছুড়িতে পারিলে আমরা বাঁচিয়া যাই।"[২৬]

সৌরভ পত্রিকায় ১৩৩৩ সনের ১৫শ বর্ষে ১ম সংখ্যায় তারিণীকান্ত মজুমদার 'মৈমনসিংহ গীতিকা: কঙ্ক ও লীলা' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক মৈমনসিংহ গীতিকার কঙ্ক ও লীলা পালার বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। আমরা জানি মৈমনসিংহ গীতিকায় কঙ্ক ও লীলা পালাটি বিচিত্র ঘটনায় পরিপূর্ণ। ছয়মাস বয়সে কঙ্ক তার পিতা ও মাতাকে হারায়। সংসারে অনাথ শিশুটির কেউ দেখাশোনার জন্য থাকে না। তার অসহায় অবস্থা দেখে এক নিঃসন্তান চণ্ডাল দম্পতি কঙ্ককে নিজ পুত্রজ্ঞানে লালন পালন করতে থাকে। কঙ্কের যখন বয়স পাঁচবছর তখন সে চণ্ডাল দম্পতিকে হারিয়ে পুনরায় মাতৃ-পিতৃহীন হল। নিরাশ্রয় কঙ্ক এবার গর্গ নামক এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহে আশ্রয় পেল। ব্রাহ্মণ গর্গের এক কন্যা ছিল, তার নাম লীলা। আট বছর বয়সে লীলাও মাতৃহীন হল। এরপর থেকে গর্গ কঙ্ক ও লীলা মাতাপিতার স্থান পূর্ণ করতে লাগলেন। লীলা যৌবনে পদার্পণ করলে গোপনে যে কৈশোর কাল থেকে কঙ্ককে ভালোবাসত তা প্রকাশ পেল–

"ভাই বোন মত তবে দুহু করে বাস,
এক জনে কান্দে যখন অন্যে দেয় আশ।
কঙ্কের না দিয়া লীলা ভাত নাইরে খায়,
দুই জনে গলাগলি ঘুরিয়া বেড়ায়।
ধেনু চরাইতে রোদে কঙ্কে মানা করে,
কঙ্কের বিরহ লীলা সহিতে না পারে।
বাগান হইতে কঙ্ক ধেনু লইয়া আইসে,
আভের পাঙ্‌ক্ষা লইয়া লীলা বৈসে তার পাশে।।"[২৭]

ইতিমধ্যে কঙ্ক ও লীলার গ্রামে এক মুসলমান পীরের আবির্ভাব হয়। কঙ্ক পীরের বাণীতে আশ্বস্ত হয়ে তাঁর কাছে যাতায়াত শুরু করে। এবং একদিন তাঁর কথায় মুগ্ধ হয়ে পীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তারপর পীরের আদেশে কঙ্ক সত্যপীরের পাঁচালী রচনা করে। সত্যপীরের পাঁচালী গ্রন্থ রচনার পর কঙ্কের কবি খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কঙ্ক শৈশবাবস্থায় চণ্ডাল গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলেন বলে গর্গ তখন কঙ্ককে বিধিমতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে নিজ গৃহে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কঙ্ককে গর্গের এই আশ্রয় দানের ঘটনায় তখন ব্রাহ্মণ সমাজের মানুষ খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। যৌবনকালে কঙ্ক পীরের দীক্ষা নিয়েছে আবার কঙ্ক লীলার প্রতি গভীর প্রণয়াসক্ত হয়ে উঠেছে একথা জানার পর ব্রাহ্মণ সমাজের মানুষ এবার গর্গের কুৎসায় মুখর হয়ে উঠলেন। ব্রাহ্মণ সমাজের কুৎসায় ক্রোধান্ধ গর্গ কঙ্ক ও লীলার প্রাণবধ করার সংকল্প গ্রহণ করলেন।

গর্গ একদিন কঙ্কের অন্নে বিষ মিশিয়ে রাখলে লীলা তা দেখতে পেয়ে কঙ্ককে তার পিতার আশ্রয় থেকে পালিয়ে যেতে অনুরোধ করল। কঙ্ক লীলার কথা শুনে তার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে তীর্থ ভ্রমণে বের হল। দিন যায়, মাস যায়, কঙ্ক আর ফেরে না। কঙ্কের বিরহ লীলার কাছে ক্রমেই দুঃসহ হয়ে উঠতে লাগল। গর্গ নিজের ভুল বুঝতে পেরে কঙ্কের অনুসন্ধানে তাঁর দুইজন শিষ্যকে নিযুক্ত করলেন। ছয়মাস কাল তারা নানা তীর্থস্থানে অনুসন্ধান করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। দুঃখে বেদনায় লীলা শয্যা নিল, তারপর আস্তে আস্তে মৃত্যুর প্রহর গুণতে শুরু করল। কঙ্ক এরপর একদিন নিজে থেকেই গর্গের কাছে ফিরে এল, লীলা তখন মারা গেছে। লীলার দেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কঙ্ক ঊর্দ্ধশ্বাসে শ্মশানের দিকে ধেয়ে গেল। শ্মশানে লীলার দেহ পঞ্চভূতে বিলীন

হয়ে গেল। লীলার মৃত্যুতে গর্গ আত্মসম্বিৎ ফিরে পেয়ে, সংসারের মায়া ছিন্ন করে কঙ্কের সঙ্গে তীর্থ পর্যটনে বেড়িয়ে পড়েন। কাহিনীর উপসংহার অংশে গর্গের এই সম্বিৎ ফিরে পাওয়া ও সংস্কার মুক্তির চিত্র কঙ্ক ও লীলা পালাটির মানবিক আবেদন ধরা পড়েছে। প্রাবন্ধিকের ভাষায়–

"গর্গ হাহাকার করিতে করিতে তাহারে জড়াইয়া ধরিলেন। অনেক বিলাপ পরিতাপের পর সেই শোকার্ত অনুতাপ দগ্ধ ব্রাহ্মণ কঙ্ক ও শিষ্যগণকে লইয়া নীলাচলে প্রস্থান করিলেন। নিম্নে গর্গের বিলাপের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া সমালোচনা শেষ করিলাম।

উঠ উঠ উঠ মাগো কত নিদ্রা যাও,
আমি অভাগায় ডাকি আঁখি মেলে চাও।
ক্ষুধা তৃষ্ণায় কেবা মোরে দিবে অন্ন পানি,
বিউনি বাতাসে কেবা জুড়াইবে প্রাণী।
পড়িয়া রহিল তোমার হীরামণ শাড়ী,
পড়িয়া রহিল তোমার জলের গাগরী
আর একবার মাগো চাও মেলি আঁখি,
নয়ন ভরিয়া তোমার জন্ম শোধ দেখি।"[২৮]

আসলে কবি এই পালায় নাটকীয় ঢঙে পিতৃমাতৃহীন সন্তান কঙ্কের জীবনের দুঃখ কষ্টের বর্ণময় জীবনের ছবি এঁকে তার সঙ্গে ব্রাহ্মণ গর্গের কন্যা লীলার প্রেমচিত্র অঙ্কন করে কাহিনিতে এক অনন্য আস্বাদনের সৃষ্টি করেছেন। কঙ্ক উদার প্রকৃতির যুবক। তার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান এই ভেদজ্ঞান না থাকায় সে যেমন ব্রাহ্মণ গর্গের কন্যা লীলাকে ভালোবেসে নিজের করে নেয় তেমনি গ্রামে আগত পীরের আখড়ায় উপস্থিত হয়ে প্রসাদ খেয়ে দীক্ষা নিয়ে পীরের আদেশ পালন করে সত্যপীরের পাঁচালী গ্রন্থ রচনা করে জনসমাজে প্রচার করে। কঙ্কের এই ভেদ জ্ঞানহীন মনোভাব ব্রাহ্মণ্য সমাজে সমালোচিত হয়। কঙ্কের গুরু গর্গ এতে বিচলিত বোধ করে কঙ্কের অন্নে বিষ মিশিয়ে তাকে হত্যা করে লীলার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে উদ্যত হয়। গর্গের কন্যা লীলা কঙ্ককে পিতার এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দিয়ে তাকে দেশান্তরি হওয়ার অনুরোধ জানালে কঙ্ক যে লীলাকে ভালোবাসে সেই ভালোবাসায় সমাজ ও গুরুর অনুমোদন নেই বুঝতে পেরে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে অজ্ঞাতবাসে চলে যায়। এদিকে লীলা কঙ্কের শোকে শয্যা গ্রহণ করে। গর্গ লীলার সেই দুঃখকষ্টের কথা বুঝতে পেরে উতলা হয়ে কঙ্ককে ফিরিয়ে আনার জন্য বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। লীলা এক সময় কঙ্কের শোকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। প্রেমাস্পদের জন্য লীলার এই তিল তিল করে নিজেকে নিঃশেষিত করে দেওয়ার চিত্র গীতিকার কবি 'কঙ্ক ও লীলা' পালায় অনবদ্য রূপ দান করেছেন।

১৩৩৩ সনের ফাল্গুন ১৫শ বর্ষে, ২য় সংখ্যায় সুরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী মৈমনসিংহ গীতিকা নামক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যে ময়মনসিংহ গীতিকা প্রকাশ করেছিলেন সেখানে স্থানে স্থানে যে সকল ঐতিহাসিক মন্তব্য বা শব্দের অর্থ অসঙ্গতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রাবন্ধিক প্রথমেই প্রবন্ধটি লেখার কারণ ব্যক্ত করেছেন–

"ময়মনসিংহবাসীর সাধারণ প্রচলিত কথ্য ভাষা সর্বত্র তাঁহার সহজবোধ্য হইবে না তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু ডাক্তার মহাশয় তাহা স্বীকার করিতে নারাজ। আমরা ইতিপূর্বে মৈমনসিংহ গীতিকায় প্রকাশিত কতকগুলি ঐতিহাসিক ভ্রান্তি ও শব্দগত অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়া রেজেষ্টারী ডাকে তাঁহার নিকট এক চিঠি দিয়াছিলাম। কোনরূপ বাহাদুরী নেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা ভাবিয়াছিলাম, ভবিষ্যতে যখন মৈয়মনসিংহ গীতিকা প্রকাশিত হইবে তখন সেন মহাশয় আমাদের কথাগুলি একটু বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষার কর্ণধার আমাদের মত ক্ষুদ্র লোকের পত্র প্রাপ্তি স্বীকার করাটাও তাঁহার পক্ষে অপমানজনক মনে করিয়াছেন। তাই বাধ্য হইয়া সাময়িকপত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল।"[২৯]

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এল, মহাশয়ও এই উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে গীতিকার বহু সংখ্যক শব্দার্থ এবং ঐতিহাসিক ভুল প্রদর্শন করে চিঠি লিখেছিলেন। সেন মহাশয় তাঁর চিঠিরও কোন উত্তর দেননি। প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা ময়মনসিংহ জেলাকে 'মৈমনসিংহ' বলে থাকেন। প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন 'মমিন সাহ' থেকে মমিন সাহী এবং অতঃপর ময়মনসিংহ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এ জেলার কোন লোকই মৈমনসিংহ বলেন না। তাই সঙ্গত কারণেই প্রাবন্ধিকের মনে হয়েছে পুস্তকের নাম 'ময়মনসিংহ গীতিকা' লেখাই সঙ্গত ছিল।

আলোচ্য গ্রন্থে যে সকল ভুল প্রদর্শিত হয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হল–

গীতিকার ৪৫ পৃষ্ঠায় দীনেশবাবু 'খেত খোলা'র অর্থ করিয়াছেন "ক্ষেত শব্দের সঙ্গে সঙ্গে খোলা শব্দ অনেক সময় একত্র ব্যবহৃত হয়, ইহার বিশেষ কোন অর্থ আছে বলিয়া বোধ হয় না।" তবে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন এদেশে গৃহের সন্নিকটবর্ত্তী উন্মুক্ত স্থানকে খোলা বা খলা বলে। যেমন ধোপারা বাড়ীতে যে স্থানে কাপড় কাচে সে স্থানকে ধোপাখলা বলে। খলা ও খোলা একই শব্দ। সংস্কৃত খোলা মানে নিম্নভূমি; সংস্কৃত খল্লিকা মানে তাওয়া বা চাটু। সুতরাং প্রাবন্ধিক খেতখলা মানে অর্থ করেছেন বিস্তৃত ক্ষেত্র।[৩০]

শিস্যায় ভরা ৫৭পৃ.। শিস্যায় ভরাকে প্রাবন্ধিক বলেছেন শিস্যায় স্থানে ক্ষীস্যায় হবে। কেননা এখনও মৈমনসিংহ অঞ্চলে পিঠার মধ্যে যে ঘন ক্ষীর পুর দেওয়া হয় তাকে ক্ষীস্যা বলে। প্রাবন্ধিক জানাচ্ছেন এই ক্ষীস্যা শব্দ কোনো কোনো জেলায় ক্ষীরসারূপে উচ্চারিত হয়।

চই ৫৮ পৃঃ। দীনেশবাবু অর্থ করেছেন একরূপ ঝাল শাক। কিন্ত প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন এখানে চই-এর অর্থ হল এক জাতীয় পিঠা। মৈমনসিংহ অঞ্চলে এখনও এই পিঠের খুব প্রচলন আছে। এটা পশ্চিমবঙ্গের চসী পিঠার অনুরূপ। ওড়িয়া ভাষায় যাকে বলে চিতই পিঠা। চিতারই নামান্তর চিত ও চই গীতিকায় আছে। আর এটাই ফরিদপুরে চিতই পিঠা বলে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন।

বউগড়া ৬৭পৃঃ। গীতিকায় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অর্থ করেছেন বউটিকে। কিন্তু প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন মৈমনসিংহ অঞ্চলে নূতন বধূকে গৃহে বরণ করে নেওয়ার অনুষ্ঠানকে বউগড়া বলে। এবং এই অর্থই সমীচীন বলে মনে করেছেন প্রাবন্ধিক।

'কাছলা ১২৩ পৃঃ। গীতিকার অর্থ গামছা। প্রকৃত অর্থ মাটির বড় হাঁড়ী। "কাছলা ভরা সাচ্চা দই পাতিল ভরা সর" দীনেশবাবু কিরূপে কাছলার অর্থ গামছা করিলেন বুঝিতে পারিলাম না।'[৩১]

হালি ধান ১৮৬ পৃঃ। গীতিকায় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অর্থ করেছেন শালি ধান্য, অথবা হালের দ্বারা যে ধান্য উৎপন্ন করা হয়েছে। কিন্তু প্রাবন্ধিকের মতে হালি ধানের অর্থ বীজ ধান। যে ধান ক্ষেতে বপন করবার জন্য কৃষকরা আলাদা করে রাখে। কোনো কোনো স্থানে এটাকে আলি ধানও বলা হয় বলে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন।

এইভাবে সমগ্র প্রবন্ধ জুড়ে দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহ গীতিকার অজস্র ভুল প্রদর্শিত করেছেন প্রাবন্ধিক। এবং পরিশেষে জানিয়েছেন–

"পরিশেষে আমরা বলিতে চাই দীনেশ বাবুর অখ্যাতি প্রকাশ করা আমাদের এ আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। ভবিষ্যৎ সংস্করণে যদি তিনি আমাদের মন্তব্যগুলি একটু বিবেচনা করিয়া দেখেন তাহা হইলেই আমরা সুখী হইব। এ গীতিকা প্রচার করিয়া তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি। যাহাতে এ পুস্তকটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয় তাহাই আমাদের ঐকান্তিক বাসনা।"[৩২]

সৌরভ পত্রিকায় ১৩৩৫ সনের ১৬ বর্ষের ১০ম সংখ্যায় যতীন্দ্রনাথ মজুমদার পূর্ববঙ্গ গীতিকা নামক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি পূর্ববঙ্গ গীতিকা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আমরা জানি ময়মনসিংহের পল্লী সাহিত্যের বিবরণ নিয়মিতভাবে সৌরভ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। চন্দ্রকুমার দে পূর্ব্ব ময়মনসিংহের কয়েকটা প্রাচীন পল্লী কবি রচিত গীতিকার পরিচয় সৌরভ পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। মৈমনসিংহ গীতিকার সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে মহাশয়ই। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ফেরুয়ারি মাসে তিনি ময়মনসিংহ জেলার আইথর গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রামকুমার দে। বাল্যেই তিনি পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে পড়েন। অল্প বয়সে তাঁকে জীবিকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হয়। এই জন্য তিনি প্রথমে স্থানীয় মুদির দোকানে মাসিক এক টাকা বেতনে কাজ শুরু করেন এবং পরে দু'টাকা মাস মাইনেতে গ্রাম্য তহসিলদারের কাজ নেন। এই তহসিলদারির কাজে তাঁকে ময়মনসিংহ জেলা ও পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে ঘুরতে হয়। এতে স্থানীয় লোকসমাজ ও লোকসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। তিনি ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকে স্থানীয় লোকসংস্কৃতি ও লোক সাহিত্যের নানা ছবি 'সৌরভ' পত্রিকায় প্রকাশ করতে শুরু করেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর 'সৌরভ' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাচীন মহিলা কবি চন্দ্রাবতী বিষয়ক রচিত প্রবন্ধটি প্রথম আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের নজরে পড়ে এবং সেই প্রবন্ধ পাঠ করে তিনি চমৎকৃত হন। তাঁর কথায়–

"গ্রন্থকার চন্দ্রাবতীর কাহিনীর মর্ম্মাংশটি মাত্র দিয়াছিলেন। কিন্তু যেটুকু দিয়াছিলেন, তাহা একেবারে চৈত-বৈশাখী বাগানের ফুলের গন্ধে ভরপুর; সেই দিন কেনারামের উপাখ্যানের সারাংশের উপর আমার অনেক চোখের জল পড়িয়াছিল।"[৩৩]

সেই সকল প্রবন্ধ সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। দীনেশবাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্ত উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট পূর্বে ময়মনসিংহের পল্লীকবি রচিত গীতিকার অসামান্য কবিত্বের কথা জ্ঞাপন করেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ঐ সকল গীতিকার অতুলনীয় মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে তা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থব্যয়ে মুদ্রিত করতে সংকল্প করেন। স্যার আশুতোষ

মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে এবং দীনেশচন্দ্র কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে ১৯২৩ সালে পূর্ব্ব ময়মনসিংহের পল্লীকবি রচিত কতগুলি উৎকৃষ্ট গীতিকা মুদ্রিত হয়েছিল। ময়মনসিংহ গীতিকা দেশ এবং দেশের বাইরে অসামান্য প্রশংসা লাভ করেছে দেখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ পল্লী সাহিত্য সংগ্রহে উৎসাহিত হয়েছিলেন। ফলত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই চেষ্টার ফলে বাংলা সাহিত্যের অনেক লুপ্তপ্রায় রত্ন সংগৃহীত হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এবং প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন ময়মনসিংহ গীতিকার ন্যায় 'পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা' বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই মহৎ প্রেরণার ফল।

পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকায় মোট ১৩টা পালাগান সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই গ্রন্থটি ১১২৪-২৬ সনের রামতনু লাহিড়ী ফেলোশিপের বক্তৃতা স্বরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। পূর্ব্বোক্ত ১৩টী পালাগানের মধ্যে ১০টাই ময়মনসিংহের অক্লান্ত কর্মী চন্দ্রকুমার দে মহাশয় সংগ্রহ করেছিলেন। পূর্ববঙ্গ গীতিকা সম্পর্কে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন–

"এই কাব্যগুলি বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পদ। বাঙ্গালীর প্রাণের জিনিস। বাঙ্গলার স্নিগ্ধ শীতল সুরম্য প্রকৃতির শ্যামল কুঞ্জে বসিয়া কোন্ যুগে আপন মনে পল্লী কবি সুমধুর বংশী ধ্বনি করিয়া নিরক্ষর পল্লীবাসীর চিত্তবিনোদন করিয়াছিলেন, আজ বহু দিনের সহসা সেই লুপ্তপ্রায় স্বর নিস্বন শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রাণে প্রবেশ করিয়া অমৃতের ধারা ঢালিয়া দিয়াছে। সেকালে পল্লী কবির হৃদয় হইতে কি মাদকতাপূর্ণ সঙ্গীতের পীযূষ ধারা প্রবাহিত হইত। বাঙ্গালার প্রাণের সেই খাঁটি সরল পবিত্র উচ্ছ্বাবাস এখন রুদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গলার শস্য শ্যামলা প্রকৃতির রমনীয় মাধুর্য্যে ঢুকিয়া সেকালের পল্লী কবি যে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন তাহাই সুচারু ভাষার সূত্রে গাঁথিয়া বাণীর চরণে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের জ্ঞানের বিস্তার না থাকিলেও প্রাণের গভীরতা ছিল। তাহাদের পাণ্ডিত্যের গৌরব না থাকিলেও ভাবপ্রবণতা ও সহৃদয়তার অভাব ছিল না।"[৩৪]

গীতিকাগুলি সমাজের অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত অবস্থায় রচিত হয়েছিল। অল্প শিক্ষিত কবি, সমাজের নিম্ন স্তরের নিরক্ষর সরল ভাবপ্রবণ জনসাধারণের চিত্ত বিনোদনের জন্য এই সকল গীতিকা রচনা করেছিলেন। অধিকাংশ গীতিকাই জনসাধারণের সুবিদিত সাময়িক ঘটনা অবলম্বনে রচিত এবং গীতিকাগুলিকে গায়ক তাল-লয় সংযোগে গেয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত বিনোদন করত। প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন কবিতার ন্যায় পাঠ করিলে যেমন সঙ্গীতের সম্যক সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারা যায় না, তেমনি এই গীতিকা কবিতার ন্যায় পড়ে গেলে উহাদের প্রকৃত সৌন্দর্য্যানুভূতি হয় না। গায়ক যখন ভাবে মাতোয়ারা হয়ে সুমধুর কণ্ঠে নানা রাগ রাগিণী সংযোগে এই সকল পালাগান গেয়েছে তখন যেন শ্রোতৃমণ্ডলী ভাবে বিভোর হয়েছে। পূর্ব্ব ময়মনসিংহের অনেকেই এই সকল পালাগান 'গাইনের' মুখে শুনে শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং এই পালাগানগুলি পূর্ব ময়মনসিংহের অতি প্রিয় ও অতি গৌরবের সামগ্রী। তবে গীতিকার ভূমিকায় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় গীতিকাগুলির সময়কাল সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, প্রাবন্ধিক তা সমর্থন করেননি। প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন–

"দীনেশ বাবু ভূমিকায় গীতিকাগুলি রচনার যে সময় নির্ধারণ করিয়াছেন তাহা ভুল। পূর্ব্ব ময়মনসিংহের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকায় তিনি যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অধিকাংশই অপ্রকৃত। কলিকাতায় থাকিয়া পূর্ব্ব ময়মনসিংহের সামাজিক অবস্থার প্রকৃত বিবরণ লিখা অসাধ্য। তাই এই সম্বন্ধে তিনি কল্পনার উপরই অধিক নির্ভর করিয়াছেন। এই কারণে তিনি গীতিকাগুলির যথার্থ

রচনা কালও নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই।"[৩৫]

'ধোবার পাট', 'মইষাল বন্ধু' এই দুইটী পালা সম্বন্ধে দীনেশ বাবু লিখেছেন– 'ভাব ও রচনা ভঙ্গীতে ত্রয়োদশ কিম্বা চতুর্দশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া মনে হয়।'

কিন্তু প্রাবন্ধিক যতীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের মতে গীতিকাগুলি অনেক পরবর্তী সময়ে রচিত হয়েছিল। ধুবার পার্ট ও মইষাল বন্ধু গীতিকায় এমন কতকগুলি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে দেখে প্রাবন্ধিক সিদ্ধান্ত করেছেন এই দুটি গীতিকা ষোড়শ শতাব্দীর পরে রচিত।

উপসংহার

পরিশেষে সার্বিক আলোচনা করে বলা যে, সৌরভ পত্রিকার একটি বিশেষত্ব হল, এই পত্রিকার এইসব লেখকরা কেউই খ্যাতিমান নন। এদের অধিকাংশই কেদারনাথের উৎসাহেই প্রবন্ধ রচনা শুরু, করেন। উমেশ ভট্টাচার্য, রণজিৎ দাশ, চন্দ্রকুমার দে প্রভৃতি লেখকরা অকপটে কেদারনাথের ঋণ স্বীকার করেছেন। কত কষ্টে, কত দরদ দিয়ে যে কেদারনাথ নতুন লেখক তৈরি করতেন চন্দ্রকুমার দের রচনা থেকে আমরা তা জানতে পারি। এবং একথাও অকপটে স্বীকার করতে হবে যে এই পত্রিকার দৌলতে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের অনেক লুপ্ত সাহিত্যকীর্তি উদ্ধার হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. দীনেশ চন্দ্র সেন, *মৈমনসিংহ গীতিকা*, ভূমিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, ভূমিকা অংশ

২. প্রভাতকুমার দাস, ময়মনসিংহের সাহিত্যসেবকগণের *সৌরভ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, ১১০ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, পৃ. ১৭৬

৩. দীনেশ চন্দ্র সেন, *মৈমনসিংহ গীতিকা*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, ভূমিকা

৪. কেদারনাথ মজুমদার, সৌরভের নবসাধনা, *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, ১১০ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, পৃ. ১৭১

৫. প্রভাতকুমার দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

৬. শ্রীচন্দ্রকুমার দে, মহিলা কবি চন্দ্রাবতী, *সৌরভ* সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ মজুমদার, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, সন ১৩২০ পৃ. ১৪৯

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

৮. শ্রীরসিকচন্দ্র বসু, প্রাচীন সাহিত্যে সমাজচিত্র, *সৌরভ* সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ মজুমদার, ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, সন শ্রাবণ ১৩২০পৃ. ৩১৬

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬

১০. শ্রীচন্দ্রকুমার দে, দস্যু কেনারাম, *সৌরভ* সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ মজুমদার, ২য় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, সন চৈত্র ১৩২০ পৃ. ১৭৯

১১. রামনাথ চক্রবর্তী ও দ্বারকানাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, *বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ*, ভট্টাচার্য এন্ড সন্স, বৈশাখ ১৩১৮, পৃ. ১৪

১২. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১ম সংস্করণ, মার্চ ১৯৬৫, পৃ. ১৩৬

১৩. রামনাথ চক্রবর্তী ও দ্বারকানাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

১৪. শ্রীচন্দ্রকুমার দে, মহিলা কবি চন্দ্রাবতী, *সৌরভ* সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ মজুমদার, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, সন ১৩২০ পৃ. ১৪৯

১৫. শ্রীচন্দ্রকুমার দে, দস্যু কেনারাম, *সৌরভ* সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ মজুমদার, ২য় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, সন চৈত্র ১৩২০ পৃ. ১৭৭

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

১৮. শ্রীচন্দ্রকুমার দে, মহিলা কবি চন্দ্রাবতী, *সৌরভ* সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ মজুমদার, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, সন ১৩২০ পৃ. ১৪৮

১৯. শ্রীচন্দ্রকুমার দে, মনসার ভাসান, *সৌরভ* সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ মজুমদার, ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, সন শ্রাবণ ১৩২১ পৃ. ৩২৩

২০. রামনাথ চক্রবর্তী ও দ্বারকানাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, *বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ*, ভট্টাচার্য এন্ড সন্স, বৈশাখ ১৩১৮, পৃ. ১৯৩

২১. শ্রীচন্দ্রকুমার দে, মনসার ভাসান, *সৌরভ* সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ মজুমদার, ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, সন শ্রাবণ ১৩২১ পৃ. ৩২৪

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫

২৪. শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, সাধক রামপ্রসাদ ও কবি রামপ্রসাদ, *সৌরভ* সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ মজুমদার, ৩য় সংখ্যা, ষষ্ঠ বর্ষ, সন পৌষ ১৩২৪ পৃ. ৭০

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

২৭. তারিণীকান্ত মজুমদার, মৈমনসিংহগীতিকা, *নির্বাচিত সৌরভ* সম্পাদনা খান মাহবুব, বাংলা একাডেমি ঢাকা, মে ২০১৮ পৃ. ৩০

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

২৯. সুরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী, মৈমনসিংহগীতিকা, *নির্বাচিত সৌরভ* সম্পাদনা খান মাহবুব, বাংলা একাডেমি ঢাকা, মে ২০১৮ পৃ. ৩৬

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

৩৩. যতীন্দ্রনাথ মজুমদার, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, *নির্বাচিত সৌরভ*, সম্পাদনা খান মাহবুব, বাংলা একাডেমি ঢাকা, মে ২০১৮

৩৪. যতীন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

BL College Journal
https://doi.org/10.62106/blc2024v6i1b6
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -VI, Issue-I, June 2024
Pp. 82-98

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রথম দশক: একটি ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ

মোঃ ইব্রাহীম

মোঃ ইব্রাহীম
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস
বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

গবেষক
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
e-mail : tuhin511@gmail.com

সারসংক্ষেপ

স্নায়ুযুদ্ধের জটিল পরিস্থিতির মধ্যে বাংলাদেশের সৃষ্টি দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে বৃহৎ দেশগুলোর মনোযোগ আকর্ষণ করে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন বিরোধিতার নীতি গ্রহণ করলেও স্বাধীনতার পর কয়েক মাসের মধ্যেই স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতিলাভের পর প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক সম্পর্ক সাহায্য নির্ভর হলেও ধীরে ধীরে তা কার্যকর অংশীদারি সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলের শুরুর দিকে নানাবিধ কারণে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। কিন্তু, বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বিদ্বেষ নয়' নীতি গ্রহণ করে সব ধরনের বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে সমন্বয় করে বাস্তববাদী অর্থনৈতিক নীতি পরিচালনা করেন। যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ এশিয়ায় তাঁর বৃহৎ স্বার্থ তথা সোভিয়েত প্রভাব ঠেকাতে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে ত্রাণ ও পুনর্বাসন, রাস্তা ও সেতু সংস্কার, অবকাঠামোগত উন্নয়ন খাতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বিপুল পরিমাণে সাহায্য প্রদান করার মাধ্যমে বাংলাদেশে আর্থিক সাহায্য প্রদানকারী দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র সর্বোচ্চ স্থানে অবতীর্ণ হয়। তাঁর শাসনামলে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে কিছু টানাপোড়েন প্রত্যক্ষ করা গেছে, যার নেপথ্যে বৈশ্বিক রাজনৈতিক হিসাব নিকাশ প্রত্যক্ষ করা যায়। বঙ্গবন্ধু পরবর্তী ১৯৭৫-১৯৮১ সালের সরকারগুলোর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। ফলে, দ্বিপাক্ষিক সুসম্পর্কের দরুণ বাংলাদেশে পশ্চিমা সাহায্য বৃদ্ধি পায়। এর নেপথ্যে ঐতিহাসিক কারণও রয়েছে। সে সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে বাণিজ্যিক ভারসাম্যের ঘাটতি হ্রাস পায়। প্রবন্ধে ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রথম দশকের নানাবিধ কার্যক্রম, প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

মূলশব্দ

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, জাতীয় স্বার্থ, বৈদেশিক সাহায্য, পিএল-৪৮০, আমদানি-রপ্তানি, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি

ভূমিকা

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বহুমাত্রিক সম্পর্কের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের সাহায্য, আমদানি-রপ্তানি এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর একই বছরের মে মাসে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক কার্যক্রম শুরু হয়। তবে, এর পূর্বেও যুক্তরাষ্ট্র সরকার জাতিসংঘের মাধ্যমে বাংলাদেশে পরিচালিত ত্রাণ কার্যক্রমে অর্থনৈতিক সহায়তা দিয়ে অবদান রেখেছে। বাংলাদেশ পাকিস্তানের কাছ থেকে দারিদ্র্য, সীমিত সম্পদ, প্রচুর জনসংখ্যা এবং বেকারত্বের মতো বহু সমস্যা নিয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। দীর্ঘদিনের বৈষম্যমূলক শাসনব্যবস্থার ফলে বাংলাদেশে সম্পদের ঘাটতি তৈরি হয়। তাছাড়া, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদও ছিল সীমিত। দেশটি জন্মের শুরু থেকেই বাণিজ্যিক ভারসাম্যহীনতা নিয়ে যাত্রা করে। ফলে, স্বাধীনতা অর্জনের পর দীর্ঘসময় বাংলাদেশ বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর ছিল। তাছাড়া, নতুন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্ববাজারে পণ্য রপ্তানিতে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। এসময় মূলত পাট, পাটজাত দ্রব্য এবং চা ছিল প্রধান রপ্তানিযোগ্য পণ্য। বেশিরভাগ খাদ্যপণ্য ও নিত্য ব্যবহার্য পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হত। পণ্য আমদানি করতে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার মজুতেও ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন খাতে বৈদেশিক ঋণ সাহায্য ছাড়া দেশকে পুনর্গঠন করা কঠিন ছিল।

স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনে বিশেষ করে শরণার্থীদের পুনর্বাসন, দুর্ভিক্ষ এড়ানোর জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ বিশাল অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণে জাতীয় স্বার্থ লক্ষ রেখে বহির্বিশ্বের সাথে অর্থনৈতিক কূটনীতি পরিচালনা করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো বাংলাদেশের খাদ্য সাহায্যের চাহিদা পূরণ করতে পারছিল না।[১] বঙ্গবন্ধুর সরকার পররাষ্ট্রনীতিতে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের আদর্শকে প্রাধান্য দেয়ায় পশ্চিমা বিশ্বের সাহায্যপ্রাপ্তিতে কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। সার্বিকভাবে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে যুক্তরাষ্ট্র সরকার অর্থনৈতিক সাহায্যের দিক দিয়ে প্রথম সারিতে চলে আসে। বঙ্গবন্ধু পরবর্তী সময়ের সরকারগুলো পশ্চিমাদের অনুকূলে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করলে দেশে সাহায্য-সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। সে সময়ে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধির নেপথ্যে ঐতিহাসিক কারণ বিদ্যমান ছিল। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলসহ ১৯৮১ সাল পর্যন্ত সরকারসমূহের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য-সহযোগিতার প্রকৃতি, দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে সৃষ্ট টানাপোড়েন ও অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বিষয়ে ঐতিহাসিকভাবে বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করাই এ প্রবন্ধের লক্ষ্য।

গবেষণার পদ্ধতি ও উৎস

প্রকৃতিগত কারণে এ প্রবন্ধটি 'গুণগত পদ্ধতি'র হলেও কিছু পরিসংখ্যানগত তথ্য রয়েছে। প্রবন্ধ রচনার জন্য প্রাথমিক উৎস হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আর্কাইভসে সংরক্ষিত দলিল, যুক্তরাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারকদের বৈঠকের অবমুক্তকৃত স্মারক ও কার্যবিবরণীসমূহ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, আর্কাইভসে সংরক্ষিত দলিলসমূহ, কূটনৈতিক নথি ব্যবহার করা হয়েছে। সহায়ক তথ্যের জন্য প্রবন্ধ সম্পর্কিত প্রকাশিত গ্রন্থ, সমসাময়িক পত্রিকা, বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ, সরকারি-বেসরকারি বাৎসরিক সমীক্ষা, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান, দৈনিক পত্রিকা ও ম্যাগাজিনসহ প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত এম ফিল ও পিএইচডি পর্যায়ের অভিসন্দর্ভ থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে রচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপট

দক্ষিণ এশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক আদর্শ সম্প্রসারণকে ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানকে মিত্র হিসেবে গ্রহণ করে। যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু রাষ্ট্রকে খাদ্য সাহায্য প্রদান সংক্রান্ত আইন-'পিএল-৪৮০'র আওতায় প্রচুর পরিমাণে অর্থনৈতিক সাহায্য পাকিস্তানে আসতে থাকে। ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের অংশ হিসেবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রায় ৬৪৪.৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার খাদ্য সাহায্য এবং উন্নয়ন সহায়তা লাভ করেছে।[২] ১৯৬৯ সালের অক্টোবরে পূর্ব পাকিস্তানে বন্যার সময় যুক্তরাষ্ট্র পিএল -৪৮০-এর আওতায় ১০ লাখ টন খাদ্যশস্য প্রেরণ করে। পরবর্তীতে ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের নির্দেশে পিএল -৪৮০ এর আওতায় আরও ১০ লাখ টন খাদ্যশস্য প্রেরণ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র সরকার ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে প্রলয়ংকারী বন্যার সময় পূর্ব পাকিস্তানে কয়েক লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করলে জরুরি ভিত্তিতে ২৫ হাজার মার্কিন ডলারের অনুদান সাহায্য দেয়া হয়।[৩] সাহায্যের মধ্যে ছিল খাদ্য, তাঁবু, কম্বল ও নগদ অর্থ। যুক্তরাষ্ট্র সরকার মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশে মানবিক সাহায্য প্রদান করেছে। যুদ্ধকালীন ১২ টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে United Nations Relief Operations in Dacca (UNROD) মানবিক সাহায্য কার্যক্রম পরিচালিত করে যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ অংশগ্রহণ ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে শরণার্থীদের বাসস্থান তৈরি, মৌলিক সুবিধা এবং অর্থনীতিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য (UNROD) এবং বাংলাদেশ সরকারকে প্রায় ৩৫.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মানবিক সাহায্য প্রদান করা হয়।[৪]

স্বাধীনতার পর নতুন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক লেনদেনের ভারসাম্য চরম সংকটের মধ্যে পড়ে।[৫] ফলে, দেশ পুনর্গঠনের জন্য প্রাচ্যের সাহায্যের পাশাপাশি পশ্চিমা সাহায্য-সহযোগিতা প্রয়োজন হয়।

ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে রাজনৈতিক সুসম্পর্ক থাকায় প্রাথমিকভাবে তাদের সাথেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।[৬] কিন্তু, বাংলাদেশের বিশাল অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য পর্যাপ্ত ছিল না। ফলে, বাংলাদেশকে পশ্চিমা দেশসমূহের সাহায্য গ্রহণ করতে

হয়। যুক্তরাষ্ট্র সরকারও তার পরিবর্তিত নীতির আলোকে স্বাধীন বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়। বঙ্গবন্ধুর সময়ে যুক্তরাষ্ট্র বহির্দেশ হিসেবে সর্বোচ্চ সাহায্যদাতা দেশে পরিণত হয়।[৭]

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক নীতি ও যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য-সহযোগিতা

যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি নতুন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনে বিপুল পরিমাণ অর্থনৈতিক সাহায্য প্রয়োজন ছিল। বাংলাদেশের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে প্রাথমিকভাবে কিছু সংকট তৈরি হয়। বাংলাদেশ ভারত - সোভিয়েত বলয়ের সমর্থনে স্বাধীনতা অর্জন করায় মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বনকারী যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য গ্রহণ করা হবে কিনা সে ব্যাপারে সরকারের মধ্যে মত-পার্থক্য তৈরি হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এবং কিছু সমাজতন্ত্রপন্থীরা মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার কারণে তাদের সাহায্য গ্রহণের ব্যাপারে অনাগ্রহ প্রকাশ করেন।[৮] কিন্তু, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তি ভারত-সোভিয়েত বলয়ের খাদ্য ও অন্যান্য সাহায্যের অপ্রতুলতা প্রত্যক্ষ করে বঙ্গবন্ধু বাস্তববাদী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ পুনর্গঠনে সকল ধরনের সাহায্যকে স্বাগত জানান।[৯]

১৯৭২ সালে শেখ মুজিব সরকার দাপ্তরিক নীতি ঘোষণা করে যেখানে সকল বন্ধু রাষ্ট্র থেকে সাহায্য গ্রহণের কথা বলা হয়। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে প্রধান দুইটি অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের অপর্যাপ্ততা।[১০] দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নতকরণে সরকারকে সমৃদ্ধ দেশসমূহ থেকে খাদ্য দ্রব্য আমদানির নীতি গ্রহণ করতে হয়েছিল। ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরের শেষের দিকে গমের মূল্য প্রতি টনে ৬০ মার্কিন ডলার থেকে ১০০ ডলার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১১] আমদানিকৃত পণ্যের জন্য বাড়তি মূল্য দিতে হয়েছিল যেটা বৈদেশিক রিজার্ভকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। ১৯৭২-৭৩ সাল থেকেই বাংলাদেশের অর্থনীতি সংকট দেখা শুরু করে। এ সংকটের প্রধান দুইটি কারণ হল- প্রথমত, আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফিতি, যেটি বাংলাদেশকে প্রভাবিত করেছে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক নীতি। স্বাধীনতার পরপরই দেশের অভ্যন্তরে সরকার ব্যাংক, বীমা, পাট, টেক্সটাইল, চিনিকল, বন্দর, বিমান এবং বৈদেশিক বাণিজ্যকে জাতীয়করণ করে। জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয় লোকজনের হাতে ছেড়ে দিলে তারা কালোবাজারি করা শুরু করে।[১২] ফলে, অর্থনীতির সংকট আরো বৃদ্ধি পায়। তাই, বঙ্গবন্ধুর সরকার দেশের অর্থনৈতিক সংকট কাটানোর লক্ষ্যে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের জন্য সচেষ্ট হয়।

১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটের প্রায় ৭০ শতাংশ অর্থায়ন হয়েছে বিদেশি ঋণ এবং অনুদানের মাধ্যমে।[১৩] এই বিদেশি ঋণ এবং অনুদানের একটি বড় অংশ এসেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর কৃষি, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং খাদ্য উৎপাদনে সাহায্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে স্বীকৃতি প্রদানের পর ১৯৭৩ সালের জুন মাসের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে ৪৩৩ মিলিয়ন ডলার জন্য অনুদান হিসেবে প্রদান করে।[১৪] ১৯৭২ সালের মার্চ মাস থেকে বাংলাদেশে চরম খাদ্য সংকট এমনকি দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে বলে ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠকে আশঙ্কা করা হয়। বাংলাদেশে খাদ্য সংকট এড়াতে সে বৈঠকে খাদ্য সহায়তা প্রদানের কথা বলা হয়। বৈঠকে প্রচুর খাদ্য সহায়তা প্রদানের

প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলে অভিহিত করা হয় অর্থাৎ দেশটিতে যে সাহায্য দেয়া হোক তা ঝুড়ির ফুটো দিয়ে পড়ে যাবে আলোচকরা আশঙ্কা প্রকাশ করে।[১৫] হ্যারল্ড স্যান্ডার্স একটি প্রতিবেদনে বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২১ মিলিয়ন ডলারের খাদ্যশস্য এবং জাতিসংঘকে সাহায্য বাবদ আরও ৩ লাখ ডলার দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বলে জানানো হয়।[১৬] যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও ভারত, কানাডা, ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য দেশগুলো মোট ২৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাংলাদেশে সাহায্য প্রদান করেছে বলে তিনি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন।[১৭]

১৯৭২ সালের ৩০ মে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র প্রথম দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ ৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা লাভ করে যার উপর কোনো সুদ আরোপ করা হয়নি। প্রাথমিক পর্যায়ে সাহায্যের মধ্যে ছিল গম, ভোজ্য তেল এবং চাল। ১৯৭২ সালের জুন মাসের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ২৬৭.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ত্রাণ সাহায্য প্রদান করার মাধ্যমে বাংলাদেশের পুনর্বাসন এবং পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে[১৮] যদিও ১৯৭২ সালের ১৫ জুলাই নিক্সনের কাছে কিসিঞ্জারের পাঠানো ত্রাণ হিসেবে সরকারি ও বেসরকারি উৎসের দেয়া মোট সাহায্যের পরিমাণ জানানো হয় ৫৩৩.৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এছাড়া ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের পুনর্বাসন কাজের জন্য জাতিসংঘ, আইবিআরডি, আইএমএফে দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের ঋণের প্রতিশ্রুতি ছিল ৬৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।[১৯] এ অর্থ দ্বারা সুতা, ওষুধ, সার আমদানি করা ছাড়াও নদী ভাঙন রোধ, বিদ্যুৎ ও রাস্তা-ঘাট সংস্কার কার্যক্রমের জন্য ব্যয় করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতি ও উদ্দেশ্য

একটি দেশের বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও বহিঃউপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলো হল- ক. অর্থনীতির কাঠামো, খ. সরকারের প্রকৃতি, গ. পছন্দসই অর্থনৈতিক নীতি এবং ঘ. আমলাতন্ত্র।[২০] একটি দেশের আমদানি-রপ্তানির প্রকৃতি নির্ধারিত হয় সে দেশের অর্থনীতির কাঠামোর মাধ্যমে। এভাবে উৎপাদক দেশটি তার উৎপাদিত পণ্য উন্নত দেশে রপ্তানির করে এবং তার দেশের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পপণ্য আমদানির মাধ্যমে বিনিময় করে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬০ এর দশক থেকেই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য খাদ্য প্রদান ও নিরাপত্তা সহযোগিতার নীতিমালা তৈরি করে। ১৯৬০ সাল থেকে এ সহায়তা ভারত, পাকিস্তান, ব্রাজিল এবং ১৯৭০ সাল থেকে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন উক্ত উন্নয়ন সাহায্য গ্রহণ করে আসছে। এ সহায়তা কার্যক্রমে পিএল ৪৮০-এর আওতায় খাদ্যশস্য ও ভোজ্যতেল প্রেরণের কথা বলা হয়। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য জাতিসংঘের ত্রাণ কার্যক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণ ছিল ৭০ শতাংশ এবং ভারতের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণ ছিল ৩০ শতাংশের একটু বেশি। পরবর্তীতে জাতিসংঘ ছাড়াও নিজস্ব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সাহায্য সংস্থাকে আমেরিকান প্রতিশ্রুত তহবিল থেকে নগদ অর্থ, পুনর্বাসন সামগ্রী এবং পুষ্টিকর খাবারের জোগান দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে, বাংলাদেশের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের নীতি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদি ঋণের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিদান থেকে যুক্তরাষ্ট্র বিরত থাকে। এরপর ১৯৭৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার কংগ্রেসে মানুষের মৌলিক চাহিদা, পরিবার পরিকল্পনার জন্য উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের জন্য নতুন নীতি অনুমোদন করে।

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য প্রদানের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করলে মোটাদাগে দুইটি উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণের জন্য মানবিক সাহায্য; দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে অর্থনৈতিক গতিশীলতাকে অগ্রসর করতে সাহায্য করা। এছাড়া, দক্ষিণ এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ স্বার্থ তথা সমাজতন্ত্রকে প্রতিহত করার নীতিও বিবেচনা করতে হবে। যুদ্ধকালীন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সাহায্য ছিল সম্পূর্ণভাবে মানবিক কারণে কিন্তু যুদ্ধের পর থেকে পরবর্তী ৫-৭ বছর ধরে প্রদানকৃত যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সাহায্য ছিল বাংলাদেশের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক অন্বেষণের উদ্দেশ্যে।[২১] তাছাড়া, তৃতীয় বিশ্বের জনগণের জীবন মান উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের অন্যান্য কারণও প্রত্যক্ষ করা যায়। যদি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর আর্থিক অবস্থা উন্নত হয় তাহলে তাদের পণ্য রপ্তানির নতুন বাজার তৈরি হবে এবং তাদের শিল্প পণ্য আমদানির জন্য বিশ্বব্যাপী নতুন ভোক্তা এবং ব্যবসায়ী গোষ্ঠী তৈরি হবে। একই সাথে তাদের পুঁজি বিনিয়োগের জন্য নতুন ক্ষেত্র তৈরি হবে যা বৃহৎ অর্থে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করবে।[২২] যদিও বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ অগ্রাধিকারভুক্ত দেশের তালিকায় ছিল না, যদিও কিছু সংখ্যক আমেরিকান ছিলেন যারা বাংলাদেশে বিনিয়োগ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে গমসহ উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রির জন্য বিদেশি বাজার খুঁজছিলেন। তাছাড়া বাংলাদেশেরও পাট রপ্তানির জন্য একটি নিশ্চিত বাজার প্রয়োজন ছিল।[২৩]

বাংলাদেশের অবকাঠামো তৈরি, সংস্কার কার্যক্রম এবং পুনর্বাসনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপক পরিমাণ অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করে। প্রাথমিকভাবে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের চেয়ে বেশি পরিমাণ সাহায্য করলেও বাংলাদেশের প্রত্যাশা ছিল আরও বেশি। তবে, প্রথম দিকে নিক্সন প্রশাসন বাংলাদেশের সমাজতন্ত্রপন্থী অভ্যন্তরীণ নীতি ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত নির্ভর পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করায় বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অনাগ্রহ প্রকাশ করে। তবে, বঙ্গবন্ধু বৈদেশিক সাহায্য, খাদ্য সাহায্য, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রাপ্তিকে উদ্দেশ্য করে কার্যকর অর্থনৈতিক কূটনীতি পরিচালনার মাধ্যমে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[২৪] বস্তুত, বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্রপন্থী কিছু ব্যক্তির সমালোচনার পরেও অর্থনৈতিক কূটনীতি অনুসরণ করে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক গভীর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যরা সপ্তাহব্যাপী যুক্তরাষ্ট্র সফর করে যুক্তরাষ্ট্রের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, আইডিএর প্রধান, বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টসহ উচ্চপদস্থ মার্কিন কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন। ফলে, বাংলাদেশের জন্য অধিক পরিমাণে সহায়তা পাওয়ার প্রত্যাশা স্বাভাবিক ছিল। সে সময়ে অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে খাদ্য সাহায্যের অনুরোধ করলেও পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষকালীন খাদ্য সাহায্য বাংলাদেশে প্রেরণ করা হয় নি।[২৫] ১৯৭৪ সালে খাদ্য সংকটের সময় সেই অর্থে কোনো পশ্চিমা সাহায্য পাওয়া যায় নি। যদিও একই বছরে প্যারিস কনসোর্টিয়ামের অধীনে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য ৯৫০ মিলিয়ন ডলার ঋণ সাহায্য অনুমোদন করে। ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র একটি চুক্তি সম্পাদন করে। চুক্তি অনুসারে পিএল -৪৮০ এর আওতায় জরুরি ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র ১ লাখ টন গম এবং ৫০ হাজার টন চাল প্রদান করবে। অক্টোবর মাসে ওয়াশিংটনে জেরাল্ড ফোর্ড ও শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে বৈঠকের আলোকে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বলে জানানো হয়। ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে দুর্ভিক্ষের কঠিন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশে প্রেরণকৃত খাদ্য

সাহায্য বাতিল করে। বাংলাদেশ কিউবার সাথে পাটের ব্যাগের বাণিজ্যকে খাদ্য বাতিলের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।[২৬] কিউবার সাথে বাণিজ্য করায় পিএল- ৪৮০ আইনের শর্ত ভঙ্গ করা হয়েছে উল্লেখ করা হয়। বিশ্লেষকরা এর নেপথ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বিদ্যমান ছিল বলে বিশ্লেষণে দেখা যায়। তৎকালীন সরকার সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অনুসরণ করায় বাংলাদেশকে এর চরম মূল্য দিতে হয়েছে।

যদিও দেশে খাদ্য সংকটের জন্য তৎকালীন বিরোধী দলের নেতা মওলানা ভাসানী ও জাসদ নেতারা খাদ্যপণ্য ভারতে চোরাচালান হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন।[২৭] তবে,উক্ত দুর্ভিক্ষের নেপথ্যে অভ্যন্তরীণ কারণের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য সাহায্য না পাওয়াকে দায়ী করা হয়। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক বাজারে বড় দেশগুলো খাদ্য ক্রয় করে মজুদ করার ফলে খাদ্য সংকট তৈরি হয়। অন্যদিকে, বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে সাহায্য গ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে ছিল। বাংলাদেশের খাদ্যের চাহিদা বৈদেশিক চাপের কাছে বাংলাদেশকে অরক্ষিত অবস্থায় রেখেছে, বিশেষ করে ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষের সময় এটি স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৯৭৪-৭৫ অর্থ বছরের চেয়ে পরবর্তী ১৯৭৫-৭৬ অর্থবছরে আর্থিক সাহায্য বণ্টন করা হয়েছে বেশি। প্রকৃতপক্ষে, বিভিন্ন অর্থ বছরে আর্থিক সাহায্যে প্রতিশ্রুতি ও বণ্টনের যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়, তার নেপথ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কের টানপোড়েন ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করা হয়।

৪.৫ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতিঃ বঙ্গবন্ধু পরবর্তী সময়

বঙ্গবন্ধুর শাসনামলের পর মোশতাক ও জিয়াউর রহমানের সরকার দেশের অভ্যন্তরে পুজিঁবাদী অর্থনীতির অনুকূলে প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারিকরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয় যা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। ফলে, ১৯৭৫ সালের পর বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়তে থাকে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থনৈতিক সহায়তা বৃদ্ধি করে। অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রজেক্ট, যেমন- গ্রামীণ উন্নয়ন, গ্রামীন ব্যাংক এবং ইপিজেড আমেরিকার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ আশীর্বাদ লাভ করে।[২৮] যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফোর্ড ১৯৭৫ পরবর্তী সরকারের সাথে অর্থনৈতিক সাহায্য ও সহযোগিতা অব্যাহত এবং বাংলাদেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অটুট থাকার কথা রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন।[২৯] জুন ১৯৭৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মোট ৫,১৭৫ মিলিয়ন ডলার বিদেশি সাহায্য গ্রহণ করেছে যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে সর্বোচ্চ ২৭.১২ শতাংশ অবদান রেখেছে।[৩০] সৌভাগ্যক্রমে ১৯৭৬ বাংলাদেশে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৭৭ সালেও এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

১৯৭৬ সালে পূর্ব বছরের তুলনায় জিএনপি দশ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।[৩১] উক্ত সময়ে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ আমদানি-রপ্তানিও বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বাণিজ্য ঘাটতি কমে আসে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ ৩৯৯১.২২ হাজার টাকা মোট রপ্তানি বাণিজ্য হয়।[৩২] ফলে, বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। ১৯৭৬ সালের ১ জুলাই বাংলাদেশের ডেপুটি চীফ মার্শাল ল প্রশাসক রিয়ার এডমিরাল খান এবং ইউএসএইড প্রশাসক ডেনিয়েল পার্কারের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিপাক্ষিক একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাংলাদেশের জন্য হ্যালিকপ্টার, পিএল ৪৮০ এর আওতায় অধিক সাহায্যদান, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং সামরিক যন্ত্রপাতি প্রদানের ব্যাপারে আলোচনা হয়।[৩৩] বাংলাদেশের পক্ষ থেকে

১৯৭৭ অর্থবছরের জন্য অতিরিক্ত এক লক্ষ টন খাদ্য সাহায্য চাওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্র থেকে খাদ্য ঘাটতির কারণে অতিরিক্ত সাহায্যের ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়, হেলিকপ্টার এবং সামরিক যন্ত্রপাতি প্রদানের ব্যাপারটি বিবেচনার জন্য রাখা হয়। তবে, উক্ত বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ যে সিদ্ধান্তটি পাওয়া যায় তা হলো, বাংলাদেশ কিউবায় পাট রপ্তানির সুযোগ পাবে, যা ১৯৭৪ থেকে সাল থেকে বন্ধ ছিল। এরপর ১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৫ লাখ মার্কিন ডলারের দ্বিপাক্ষিক ঋণ চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চট্টগ্রামের কাপ্তাইয়ে ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কর্ণফুলি জলবিদ্যুৎ স্টেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এ চুক্তি করা হয়। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব একরাম হোসেন এবং মার্কিন সাহায্য মিশনের পরিচালক জোসেফ এস ট্রোনার উক্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।[৩৪]

১৯৭৭ সালে জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে মার্কিন রাষ্ট্রদূত এডওয়ার্ড ই মাস্টার্স এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সচিব এ সাত্তার একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তিটিতে বাংলাদেশে জন্মশাসনে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য আট কোটি টাকার সমমানের মার্কিন ঋণ মঞ্জুরি করা হয়। এরপর, এপ্রিল মাসের শুরুতে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র 'শান্তির জন্য খাদ্য' কর্মসূচির অধীনে সাহায্য সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে ২ কোটি ২০ লাখ মার্কিন ডলারের খাদ্যশস্য, ২ লক্ষ টন গম সরবরাহ করবে মর্মে ঘোষণা দেয়া হয়। ৪০ বছর মেয়াদের এ চুক্তিটি পিএল- ৪৮০, টাইটেল -১ এর অধীনে স্বাক্ষরিত হয়।[৩৫] মার্কিন রাষ্ট্রদূত এডওয়ার্ড ই মাস্টার্স এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কাজী আজহার আলী স্ব স্ব সরকারের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ১৯৭৮ সালের আগস্ট মাসে 'খাদ্যের জন্য উন্নয়ন' কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পিএল-৪৮০এর টাইটেল-৩ অনুসারে সম্পন্ন এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন, মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড টি স্লাইডার এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বহিঃসম্পদ বিভাগের সচিব এ এম এ মুহিত।[৩৬] চুক্তি থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে খোলা বাজারে চাল বিক্রি করে খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য এ পদক্ষেপ নেয়া হয়। বাংলাদেশ প্রথম দেশ হিসেবে পিএল-৪৮০ এর টাইটেল-৩ এর আওতায় উক্ত সাহায্য পেয়েছে বলে জানানো হয়, যার পরিমাণ প্রায় ১০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।[৩৭] একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ১.২৯ মিলিয়ন ডলার সাহায্য প্রদান করা হয়।[৩৮] এক হিসাবে দেখা যায়, ১৯৭৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,০৪৫.১৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে।[৩৯]

১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র একাধিক অর্থনৈতিক সাহায্য সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদিত হয়। ফেব্রুয়ারি মাসে স্বাক্ষরিত দুটি আলাদা চুক্তিতে পল্লী বিদ্যুতায়ন এবং কারিগরি সাহায্য সংক্রান্ত প্রকল্পের জন্য ১ কোটি ৪২ লক্ষ মার্কিন ডলার অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করা হয়।[৪০] মার্চ মাসে আরেকটি চুক্তিতে Bangladesh Agricultural Research Institute এর জন্য ৬০ লক্ষ মার্কিন ডলার মঞ্জুর করা হয়। ইউএস এইডের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক রিচার্ড আই পোডল উইলসন এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বহিঃসম্পদ বিভাগের সচিব স্ব স্ব দেশের পক্ষে উক্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।[৪১] স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৭৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশকে সামগ্রিকভাবে ৩ বিলিয়ন বা ২শ কোটি ডলার সাহায্য দিয়েছে বলে মার্কিন রাষ্ট্রদূত তথ্য প্রকাশ করেন। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কারণে জিয়াউর রহমানের সরকারের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের

সুদৃষ্টি থাকায় পূর্বের ধারাবাহিকতায় ১৯৮১ সালেও একাধিক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জানুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্র সরকার কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৮১ হজার ডলার প্রদান করবে বলে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে।[৪২] প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জনে সফরের জন্য এ চুক্তি থেকে অর্থ ব্যয় করা হবে। এরপর জুন মাসে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সাথে ২৩ লাখ মার্কিন ডলারের একটি চুক্তি সম্পাদন করেছে। কৃষি গবেষণা প্রকল্পের জন্য ৬ বছর মেয়াদি চুক্তিতে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প থেকে অর্থ প্রদান করা হবে।[৪৩] সামগ্রিকভাবে দেখা যায়, মোশতাক আহমদ ও জিয়াউর রহমানের শাসনামলে বিভিন্ন ধরনের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশের জন্য পর্যাপ্ত সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেছে। দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে ভালো সম্পর্কের কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে। উক্ত সরকারসমূহ আন্তর্জাতিক অনেক বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অবস্থানের সাথে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বিভিন্ন বিরোধ মীমাংসায় দুটো দেশ একসাথে কাজ করেছে। বিশ্বশান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে দুটো দেশ পরস্পরকে সহায়তা করছে। ফলে, বাংলাদেশে মার্কিন সাহায্য-সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য- সহযোগিতার ধরণ

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সাহায্য। যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সহযোগিতাগুলোর মধ্যে তিনটি ধরন লক্ষ করা যায়। ১. খাদ্য খাতে সাহায্য, ২. পণ্য খাতে সাহায্য, এবং ৩. প্রজেক্ট খাতে সাহায্য। যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক প্রদানকৃত আর্থিক সাহায্যগুলো বাংলাদেশে দুইটি মাধ্যমে প্রদান করা হয়। একটি হলো- ঋণ এবং অন্যটি অনুদান। ঋণ হলো, সাধারণত যেগুলোর নির্দিষ্ট মেয়াদি এবং নির্ধারিত সুদভিত্তিক। অন্যদিকে অনুদান হলো যেগুলোর নির্দিষ্ট মেয়াদ নেই। যে সকল সংস্থা ও অধিদপ্তরের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র সরকার সহযোগিতা প্রদান করে, সেগুলো হল- US Agency for International Development (USAID) এবং Co-operative for American Relief Everywhere (CARE), Department of State, Center For Diseage Control and Prevention ইত্যাদি। পরবর্তীতে এরকম সংস্থার সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য সাহায্যগুলো পাবলিক ল প্রোগ্রাম (পিএল-৪৮০) এর মাধ্যমে প্রদান করা হয় যেটার তিনটি শ্রেণি রয়েছে: ক. পাবলিক ল- 1 (পিএল-৪৮০-1), খ. পাবলিক ল- 11 (পিএল-৪৮০ 11), গ. পাবলিক ল- 1 1 1 (পিএল- ৪৮০ 1 1 1)। পিএল-৪৮০ 1 হলো, সহজশর্তে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য। পিএল-৪৮০-1 আইনের আওতায় বরাদ্দকৃত ঋণ সাহায্য ৪০ বছর মেয়াদী হয়ে থাকে। প্রথম দশ বছরে সুদের হার হবে দুই শতাংশ এবং পরবর্তী ত্রিশ বছরের জন্য সুদের হার হবে ৩ শতাংশ। বাংলাদেশে ১৯৭৪ সাল থেকে পিএল-৪৮০-1 প্রোগ্রামের আওতায় সাহায্য দেয়া শুরু হয়েছে। পিএল-৪৮০ 11 প্রোগ্রামের আওতায় সাহায্য তখনই দেয়া হয় যখন কোনো দেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে দুর্ভিক্ষ ঘটে। ক্ষুধা ও পুষ্টিহীনতা মোকাবেলায় এ সাহায্য প্রদান করা হয়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে পিএল-৪৮০ 11 প্রোগ্রামের আওতায় সাহায্য প্রদান করা শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে ১৯৭৬ সালে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে ভূমিহীন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য এ প্রোগ্রামের আওতায় সাহায্য দেয়া

হয়েছিল। বাংলাদেশে US Agency for International Development (USAID) এবং Co-operative for American Relief Everywhere (CARE) এর তত্ত্বাবধানে পিএল-৪৮০ 11 এর আওতায় উক্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। পিএল-৪৮০ 1 1 1 হল, খাদ্যশস্য বিক্রির মাধ্যমে স্থানীয় মুদ্রা আয় হয় তখন দেশটির কোনো দেশে বিশেষ কোনো কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তার জন্য পিএল-৪৮০ 1 1 1 এর আওতায় ঋণ সাহায্য দেয়া হয়। অর্থাৎ, স্বনির্ভর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্য ক্রয়ের জন্য উক্ত সাহায্য প্রদান করা হয়।

সারণি- ০১

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সাহায্য (ঋণ ও অনুদান)

(মিলিয়ন ইউএস ডলার হিসাবে)

অর্থ বছর	প্রতিশ্রুতি				বণ্টন			
	খাদ্য	পণ্য	প্রজেক্ট	মোট	খাদ্য	পণ্য	প্রজেক্ট	মোট
১৯৭১-৭২	-	৪০,৩০৫	৫২,২১০	৯২,৫১৫	-	-	-	-
১৯৭২-৭৩	২৯.৮৬০	৪৮.৯৭৩	২১.০০৮	৯৯.৮৪১	-	৩৭.৮২৯	৭.৯৯১	৪৫.৮২০
১৯৭৩-৭৪	৩২.৪০০	৮.০০০	৭.৭৮৮	৪৮.১৮৮	৪৮.৭৬১	১৩.৬৭২	৩৮.৫০১	১০০.৯৩৪
১৯৭৪-৭৫	২৩৩.৮০০	৬০.২৫০	৪৩.৩০০	৩৩৭.৩৫০	১৪৯.৬৭৪	৭০.১১৮	৪০.০৪১	২৫৯.৮৩৩
১৯৭৫-৭৬	১৫১.০৫০	২২.৭০০	১১.৭৬০	১৮৫.৫১০	২১০.৮৪৭	৫৩.৭০৯	১৭.৩৯২	২৮১.৮৪৮
১৯৭৬-৭৭	৫৯.২৪০	-	২৫.৩৪৬	৮৪.৫৮৭	৪৪.৬০৩	৪.৯০০	৭.৬৬২	৫৭.১৬৫
১৯৭৭-৭৮	৩৫.৪৩০	৬৬.৮০০	৪০.০৪১	১৪২.২৭১	৭৫.৫৫৫	৪৬.৫০৯	১৩.৬২৪	১৩৫.৭২৮
১৯৭৮-৭৯	৯৯.৫০০	৮৭.১০০	৫৬.০৪২	২৪২.৬৪২	৫৫.৮৪০	৭৬.৩৯১	৩৮.৮৫৪	১৭১.০৮৫
১৯৭৯-৮০	৮৪.৪৭৫	-	৩.৯৯২	৮৮.৪৬৭	১২৬.৮৭৫	১৩.৮১০	৩৬.৯২২	১৭৭.৬০৭
১৯৮০-৮১	৭২.৮০০	৩৬.৪০০	৫২.৭১০	১৬১.৯১০	৫০.৯০০	৩৫.৯৬৫	৪৬.০০১	১৩২.৮৬৬

Source : Commitment and Disbursment of US Aid to Bangladesh, Flow of External Resources into Bangladesh, Economic Relations Division (ERD), *Ministry of Finance,* GOB, Dhaka. March, 30, 1992. P. 41. http://erd.gov.bd/#

খাদ্য সাহায্য ছাড়াও পণ্য খাতে যুক্তরাষ্ট্র ঋণ ও অনুদান প্রদান করে থাকে। পণ্য সাহায্যের মূল উদ্দেশ্য হল বাজেট সমস্যা বা বৈদেশিক বাণিজ্যের সংকটে সাহায্য করা। পণ্য সাহায্য ঋণ এবং অনুদান দুটোকেই অন্তর্ভুক্ত করে।[৪৪] প্রজেক্ট খাতে সাহায্য করার লক্ষ্য হল- সাধারণত অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন করা। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে ফ্যাক্টরি নির্মাণ, গ্রামীণ ও শহর এলাকায় বিদ্যুতায়ন, চাষাবাদ প্রকল্প, রাস্তা ও বন্দর নির্মাণের জন্য প্রজেক্ট সাহায্য দেয়া হয়েছে। এটা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রদান করা হয় না, সাধারণত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রজেক্ট সাহায্য দেয়া হয়। প্রজেক্ট সাহায্য ঋণ এবং অনুদান দুটোকেই অন্তর্ভুক্ত করে। ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে ২০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সাহায্য দেয়া হয় শুধু ত্রাণ এবং পুনর্বাসন প্রকল্পের জন্য।[৪৫] ১৯৭৪ সাল থেকে এ সাহায্যের ধরনে পরিবর্তন আনা হয়। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন করে যেখানে কারিগরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যুক্তরাষ্ট্র আগ্রহ প্রকাশ করে। এরপর রাজনৈতিক কারণে অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ও বণ্টনে তারতম্য থাকলেও ১৯৭৫ পরবর্তী সরকারগুলোর সময়ে উক্ত খাতসমূহে ঋণ ও অনুদান সাহায্য অব্যাহত ছিল।

বাংলাদেশ- যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য ও বিনিয়োগ

বাণিজ্য বলতে খাদ্য ও পণ্যের আমদানি-রপ্তানি করাকে বুঝায়। বিভিন্ন দেশের চাহিদা ও উদ্বৃত্তের আলোকে খাদ্য ও পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। একটি দেশ যদিও উদ্বৃত্ত পণ্য উৎপাদন করে অপচয় না করতে চায় তাহলে তা বৈদেশিক বাজারে বিক্রি করতে হবে। একটি দেশের শিল্পায়নে, কর্মসংস্থানে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিদেশ থেকে ক্রয়ে, অভ্যন্তরীণ উন্নয়নে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে আমদানি রপ্তানি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মত কৃষিনির্ভর দেশগুলো কৃষি যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য ভারী ও হালকা যন্ত্রপাতি কৃষির উন্নয়নে শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে আমদানি করে থাকে। স্বাধীনতার পর ১৯৮০'র দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানিযোগ্য পণ্য ছিল পাট,পাটজাত দ্রব্য। এছাড়া চিনি, চামড়া এবং চা রপ্তানি হত।

সারণি নং-০২

প্রধান প্রধান পণ্য রপ্তানি তালিকা

(মিলিয়ন টাকার হিসাবে)

অর্থ বছর	পাট	কাঁচা পাট	চা	চামড়া
১৯৭২-৭৩	১৩৯৪.৬	১০৪১.৩	৭৫.৪	১২৫.৯
১৯৭৩-৭৪	১৫৮২.০	১০২২.৬	১১৭.২	১২৬.৯
১৯৭৪-৭৫	১৭৯৩.৩	৭৩৫.৮	১৯০.৭	২১৫.৫
১৯৭৫-৭৬	২৬৩১.১	১৮৩৭.৬	২৫৮.২	৪৪৮.৪
১৯৭৬-৭৭	২৬৮৬.২	১৭৬৫.৪	৫৫৮.৮	৫৮৭.২
১৯৭৭-৭৮	৩৭৩৫.১	১৪৫৪.০	৬৭৯.১	৬৮০.৭
১৯৭৮-৭৯	৪২৫০.৭	২১৭৮.৯	৬২০.৮	১১৪৭.৪
১৯৭৯-৮০	৬০৬৬.৭	২২২১.২	৫১০.০	১০১৪.৭
১৯৮০-৮১	৫৯৮৯.৬	১৯৪২.৮	৬৬৪.৮	৯২৬.০

Source: Government of People Republic Bangladesh, Ministry of Finance, Bangladesh Economic Survey, 1986-87

উপর্যুক্ত সারণিতে দেখা যায়, ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মাত্র ১৩৯৪.৬ মিলিয়ন টাকার পাট রপ্তানি হয়। ধারাবাহিকভাবে প্রতিবছর পাটসহ অন্যান্য পণ্য রপ্তানির পরিমাণ বাড়তে থাকে। তবে, অন্য পণ্যের তুলনায় পাট ও পাটজাত দ্রব্য বেশি রপ্তানি হয়েছে। পাশাপাশি চা এবং চামড়া প্রধান প্রধান রপ্তানিযোগ্য পণ্য ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বেশীরভাগ লেনদেন নগদ অর্থে করা হত। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পণ্য ক্রয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ স্বল্প পরিমাণে পণ্য আমদানি করলেও ধীরে ধীরে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশি পণ্যের বড় বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৯৭২-১৯৮১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ আমদানি নির্ভর ছিল। স্বাধীনতার পর প্রথম অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানির চেয়ে আমদানি ছিল তিনগুণেরও বেশি। কারণ, বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্য বেশি ছিল না। প্রতি বছরই আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৪-৭৫ অর্থবছরে বাণিজ্য ঘাটতি সবচেয়ে বেশি

ছিল। উক্ত অর্থবছরেই বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি সবচেয়ে বেশি ছিল একই সাথে সাহায্যের প্রয়োজনও ছিল তীব্র। সারণিতে আরো দেখা যায়, ১৯৭৫-৭৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আমদানি ও রপ্তানি দুটোই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৯৭৬-১৯৮১ সালের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাথে আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এক হিসাবে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধুর আমলে বার্ষিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ছিল ৮২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১৯৭৬-৮১ সালের মধ্যে ১২১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে এসে দাঁড়ায়।[৪৬] যা শতাংশের হিসাবে ৬৬ থেকে ৭৬ শতাংশে উন্নীত হয়।

সারণি নং- ৩

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য ভারসাম্য (১৯৭২-১৯৮১)

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার হিসাবে)

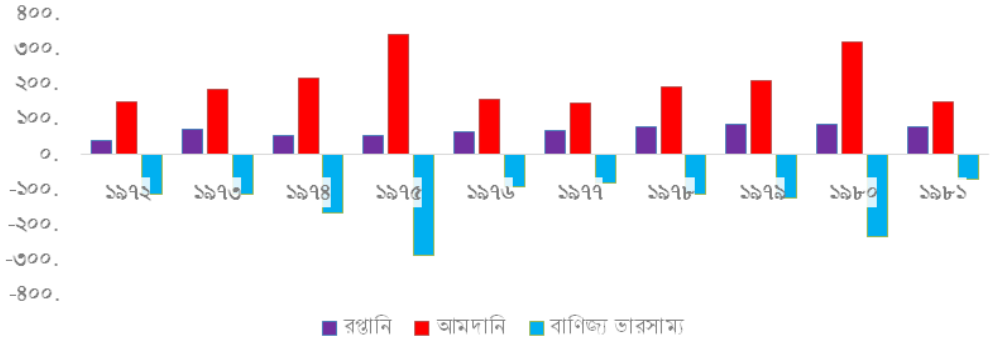

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সাহায্যঃ প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব

বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে ইন্দো-সোভিয়েত বলয়ের প্রভাব থাকার পরেও অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার কারণে বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের দিকে ঝুঁকতে হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র ছিল বাংলাদেশের জন্য বড় একটি অর্থনৈতিক সাহায্যের উৎস। বাংলাদেশে চরম খাদ্য ঘাটতির মধ্যে ধারাবাহিকভাবে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সর্ববৃহৎ সাহায্যদাতা দেশে পরিণত হয়। তবে, যুক্তরাষ্ট্রের এ সাহায্য বিভিন্ন সময়ে চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সাহায্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করেছে। বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য এবং সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯৭০ এবং ১৯৭৪ সালের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় যুক্তরাষ্ট্র শুধু খাদ্য সাহায্যই দেয়নি বরং বিপর্যয় পরবর্তী সময়ে পুনর্বাসন এবং সংস্কারেও তারা সাহায্য করেছে। এটি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

তবে, বিদেশি সাহায্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করলেও এটাও সত্যি যে, উন্নয়নের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের বিদেশি সাহায্য নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাধীনতার পর ১৯৮০'র

দশক পর্যন্ত বাংলাদেশ বিদেশি সাহায্য নির্ভর ছিল। যদিও এই অর্থনৈতিক নির্ভরতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আত্মনির্ভর হয়েছে এবং চরম দারিদ্র্য দূর করতে সক্ষম হয়েছে। তবে, বিদেশি সাহায্য নির্ভরতার কারণে বিভিন্ন সময় বিদেশিরা অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করার সুযোগ পেয়েছে।[৪৭] ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা বিশ্বব্যাংকের ঋণ সাহায্যের ব্যাপারে আলোচনা করলে তারা আটক পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের মুক্তি দিতে চাপ প্রয়োগ করে। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা অর্থনৈতিক সাহায্যের বিনিময়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে। ১৯৭৪ সালে খাদ্য সাহায্য পেতে হলে কিউবার সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে যুক্তরাষ্ট্র চাপ প্রয়োগ করে। যদিও কিউবা বাংলাদেশকে স্বল্প সময়ে স্বীকৃতিদানকারী বন্ধু রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু, যুক্তরাষ্ট্রের চাপে বাংলাদেশকে কিউবার সাথে বাণিজ্য বাতিল করতে হয়। ১৯৭৪ সালে বিভিন্ন কারণে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে খাদ্য সাহায্যের জন্য বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রমুখি হতে বাধ্য হয়। কিন্তু, যুক্তরাষ্ট্র খাদ্য সাহায্য বাতিল করে বাংলাদেশের দুঃসময়ে বন্ধুত্বের পরিচয় প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে। খাদ্য সাহায্য বাতিলের সিদ্ধান্ত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে টানাপোড়েন তৈরি করেছে। যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশ সরকারকে চাপ দেয়ার জন্য অর্থনৈতিক সাহায্যকে সরাসরি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে।[৪৮] অনেকের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সাহায্য ছিল ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য, স্বাধীন অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তারা সাহায্য করেনি এবং এ সাহায্যের নেপথ্যে ছিল সরকার বিরোধী কার্যক্রমকে উৎসাহদানের মাধ্যমে সরকারকে অস্থিতিশীল করা।[৪৯] যুক্তরাষ্ট্রের কিছু কার্যক্রম বৃহৎ দেশের সাথে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সম্পর্কের সীমাবদ্ধতাকে সামনে তুলে ধরেছে। রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশের সরকারকে হেয় করতে খাদ্য সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন সময়ে রাজনীতি করা হয়েছে বলে মনে করা হয়।

স্নায়ুযুদ্ধকালীন রাজনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে বিভিন্ন সময়ে প্রদানকৃত আর্থিক সাহায্য, ঋণ ও অনুদান প্রদানে গড়িমসি করা হয়। বিভিন্ন সময়ে ঋণ ও অনুদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও তা বণ্টনে অযথা বিলম্ব করা হয়। ফলে, আর্থিক বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি এবং ছাড়কৃত অর্থের হিসাবেও ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এরকম দ্বিচারিতার নেপথ্যে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করেনি তা বলা যায় না। অনেকে মনে করেন, বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে বাংলাদেশ 'খাদ্য রাজনীতি'র শিকার হয়েছে।[৫০] ১৯৭২ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল অনেকাংশে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য নির্ভর। দ্বিপাক্ষিক কিছু চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশে বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য নির্ভর কলকারখানায় যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য করলেও তা ছিল সামান্য। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপক বাণিজ্য ভারসাম্য ঘাটতি থাকলেও ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে এ ঘাটতি হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৭৬- ১৯৮১ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর শাসনামলের চেয়ে বিপরীতধর্মী অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করায় যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশসমূহের সাহায্য-সহযোগিতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। ঐতিহাসিক রাজনৈতিক কারণে মোশতাক ও জিয়াউর রহমানের আমলে তাদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সুদৃষ্টির ফলে ধারাবাহিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাথে আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে, ১৯৭৬ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য ঘাটতি ১৯৭১-৭৫

সালের তুলনায় অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। উক্ত সময়ে বাংলাদেশের মধ্যপন্থী পররাষ্ট্রনীতি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করেছে।[৫১]

উপসংহার

১৯৭১-১৯৮১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রকৃতি ছিল বহুমাত্রিক। এ সম্পর্ককে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়। প্রথমত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার তৎকালীন বাস্তবতা এবং বৈশ্বিক রাজনীতির প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে অর্থনৈতিক নীতি পরিচালনা করেছে। ফলে, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে না থাকলেও দেশ পুনর্গঠনে পশ্চিমা সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে। বঙ্গবন্ধু 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব কারো সঙ্গে বিদ্বেষ নয়'– এ মূলনীতিকে অনুসরণ করে অর্থনৈতিক কূটনীতি গ্রহণ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রর পরিবর্তিত নীতির আলোকে কৌশলগত কারণে বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ খাদ্য, ঋণ ও অনুদান প্রদান করে। তবে, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে পরাশক্তি হিসেবে ক্ষমতার প্রদর্শন করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কখনো কখনো বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সাহায্যকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে। বঙ্গবন্ধু পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সরকারগুলো পশ্চিমাদের অনুকূলে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করায় পশ্চিমা সাহায্য ও আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। তবে, এর নেপথ্যে রাজনৈতিক কারণ বিদ্যমান ছিল। সে সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়লেও দেশ আরো বেশি বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর হয়েছে। দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে টানাপোড়েন থাকলেও বঙ্গবন্ধুর শাসনামলেই বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তি রচিত হয়েছিল। সে ভিত্তির উপর ভর করেই পরবর্তীতে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক ৫০ বছর অতিক্রম করে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারে পরিণত হয়েছে।

তথ্যপঞ্জি

১. অনুবাদ লেখকের। মূল লেখার জন্য দেখুন - Sultan Mahmud, *Bilateral Relations Between Bangladesh and the United States of America,* 1971-1981, M.Phil Dissertation, Department of History, (Dhaka: Jahangirnagar University, 2009), p.133

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

৩. জগলুল আলম, *বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান ১৯৬৯-১৯৭৫ মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের দলিল* (ঢাকা: বাঙ্গালা গবেষণা প্রকাশনা, ২০২২), পৃ. ১৯৬

৪. অনুবাদ লেখকের। মূল লেখার জন্য দেখুন - Md. Sultan Mahmud, *Bilateral Relations between Bangladesh and the United States of America,* 1971-1981, p.137

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

৬. প্রাগুক্ত

৭. অনুবাদ লেখকের। মূল লেখার জন্য দেখুন - Hayder, Zaglul, (1989). *The Changing Pattern of Bangladesh Foreighn Policy- A comparative Study of the Mujib and Zia Regims* (Dhaka: The University Press limited, 2001), P.118

৮. প্রাগুক্ত

৯. প্রাগুক্ত

১০. অনুবাদ লেখকের। মূল লেখার জন্য দেখুন - Jayasree, Biswas, *US-Bangladesh Relations, A study of the Political and Economic Development During* 1971-81, India: Minerva Associates publications Pvt Ltd, 1984), P. 75.

১১. প্রাগুক্ত

১২. অনুবাদ লেখকের। মূল লেখার জন্য দেখুন-Talukder Maniruzzaman, Bangladesh in 1974: Economic Crisis and Political Polarization, *Asian Survey*, Vol-15, No- 2, Feb, 1975), PP. 117-118

১৩. অনুবাদ লেখকের। মূল লেখার জন্য দেখুন - K U Ahmad, 'New priorities and old Biases: THe First Budget of Bangladesh', *South Asian Review*, 6(1). (1972-73), PP. 1-5

১৪. মোঃ মাহবুবর রহমান, *আওয়ামী লীগের শাসনকাল* ১৯৭২-৭৫, পৃ. ১২৪

১৫. *দৈনিক প্রথম আলো* (অনলাইন) ৭ মার্চ, ২০২১

১৬. যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল আর্কাইভস, নিক্সন প্রেসিডেন্সিয়াল মেটেরিয়ালস, বক্স নং ৫৯১, স্টেট ডিপার্টমেন্ট, ডকুমেন্ট নং- ৪০৯। অন্ত. জগলুল আলম, বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান ১৯৬৯-১৯৭৫ মার্কিন স্টেট ডিপাটমেন্টের দলিল, পৃ. ১৯৭

১৭. প্রাগুক্ত

১৮. USA State Department Bulletin, 1972

১৯. জগলুল আলম, *বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান ১৯৬৯-১৯৭৫ মার্কিন স্টেট ডিপাটমেন্টের দলিল*, পৃ. ২০০

২০. অনুবাদ লেখকের। মূল লেখার জন্য দেখুন-Monaw-war Uddin Ahmed External Economic Relations of Bangladesh: An Overview in Muzaffer Ahmad and Abul Kalam (ed.) *Bangladesh Foreign Relations, Changes and Directions,* Dhaka: University Press Limited, 1989), PP. 114-115

২১. অনুবাদ লেখকের। মূল লেখার জন্য দেখুন- G. W. Chowdhury, India, Pakistan, Bangladesh and the Major Powers, Politics of a Divided Subcontinent (Newyork: The Free Press Publishers, 1975), P. 235

২২. অনুবাদ লেখকের। মূল লেখার জন্য দেখুন -*The United States and the Development Countries*, An Atlantic Council Policy Paperback (Coilorado: Western Press, 1977), PP. 3-4

২৩. অনুবাদ লেখকের। মূল লেখার জন্য দেখুন- Marcus Franda, *Bangladesh, The First Decade*, (New Delhi: South Asian Publishers Pvt Ltd, 1982), pp. 252-253

২৪. অনুবাদ লেখকের। মূল লেখার জন্য দেখুন- Md. Shariful Islam, Understanding Bangabandhu's Foreign Policy: Principles, Prioritues and Diplomatics Strategies, *BIISS Paper*, No 30, November 2021:01, P. 1

২৫. নুরুল ইসলাম, *বাংলাদেশ জাতি গঠনকালে এক অর্থনীতিবিদের কিছু কথা* (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৮), পৃ. ১১৭

২৬. *প্রাগুক্ত, পৃ.* ১১৭

২৭. মোহাম্মদ সেলীম, *বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০২২), পৃ. ২৩৩

২৮. অনুবাদ লেখকের। মূল লেখার জন্য দেখুন- A.K. Monaw-war Uddin Ahmed, *"External Economic Relations of Bangladesh: An Overview,"* P.118

২৯. *The Bangladesh Observer*, 21 November, 1975

৩০. অনুবাদ লেখকের। মূল লেখার জন্য দেখুন- M. A. Aziz, "Bangladesh in United States Foreign Policy." *Asian Affairs: An American Review* 9, no. 4 (1982), p. 225

৩১. অনুবাদ লেখকের। মূল লেখার জন্য দেখুন- The Annual Register World Events in 1971, Vol- 219, Ivison Macadam (Ed.), (London: Longman, 1978), P. 270

৩২. তারেক শামসুর রহমান, *নয়া বিশ্বব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি*, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০২), পৃ. ২১৫

৩৩. অনুবাদ লেখকের। মূল লেখার জন্য দেখুন- National Archives, RG 84, and Dhaka Embassy Files: Lot 79 F 54, Decentralized Subject Files 1976, POL 15 Bangladesh-United States 1976

৩৪. অনুবাদ লেখকের। মূল লেখার জন্য দেখুন- 'US loan for karnafuli power station' *The Bangladesh Times,* 17.09. 1976

৩৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ এপ্রিল, ১৯৭৭

৩৬. অনুবাদ লেখকের। মূল লেখার জন্য দেখুন- 'US will supply 2 lakh tons Wheat' *The Bangladesh Observer*, 8.8. 1978

৩৭. অনুবাদ লেখকের। মূল লেখার জন্য দেখুন- Jigir Kaur, *Foreign Policy of Bangladesh: Continuity and Change* 1951-96, PhD Dissertation, Jawaharlal Nehru University, India, 2000. p.111

৩৮. অনুবাদ লেখকের। মূল লেখার জন্য দেখুন- 'US to help improve telecom facilities' *The Bangladesh Observer,* 13.10. 1978

৩৯. অনুবাদ লেখকের। মূল লেখার জন্য দেখুন- Iftekhar A. Chowdhury, *Bangaldesh's External Relations: The Strategy of a Small Power in a Subsystem,* PhD Thesis, Australian National University, Australia, 1980. P. 188.

৪০. 'দুটি প্রকল্পের জন্য ১ কোটি ৪২ লক্ষ ডলার মার্কিন সাহায্য' *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯

৪১. অনুবাদ লেখকের। মূল লেখার জন্য দেখুন- '60 lakh US grant for agri-research' *The Bangladesh Times*, 9.3. 1979

৪২. *দৈনিক বাংলা*, ২৬ মার্চ, ১৯৭৯

৪৩. 'কৃষি গবেষণায় ৪ কোটি টাকার মার্কিন মঞ্জুরি' *দৈনিক বাংলা*, ৬ জুন, ১৯৮১

৪৪. অনুবাদ লেখকের। মূল লেখার জন্য দেখুন- Sanjay Kumar Bharadwaj, *Bangladesh-United States Relations*, 1971-98, PP. 120-125

৪৫. *প্রাগুক্ত*

৪৬. অনুবাদ লেখকের। মূল লেখার জন্য দেখুন- Abdul Bayes, Foreign Policy and External Economic Relations of Bangladesh: Direction Natureand Implications, In., Issues and Challanges Facing Bangladesh Foreign Policy M.G. Kabir & Shaukat Hassan, (Ed.), *Bangladesh Society of International Studies* (Dhaka: 1989), P. 177

৪৭. *প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮*

৪৮. অনুবাদ লেখকের। মূল লেখার জন্য দেখুন- Rehman Sobhan, Politics of Food and Famine in Bangladesh, *Economic and Political Weekly* (Bombay), 1 December, (1979). in Sarbjit Sharma, USBangladesh Relations: A Crictique, Dhaka: The University Press Limited, p. 50

৪৯. অনুবাদ লেখকের। মূল লেখার জন্য দেখুন- Virendra Narain, *Foreign Policy of Bangladesh* 1971-1981, P. 112.

৫০. মোহাম্মদ সেলীম, *বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি*, পৃ. ২৩২

৫১. অনুবাদ লেখকের। মূল লেখার জন্য দেখুন- Jigir Kaur, *Foreign Policy of Bangladesh: Continuity and Change* 1951-96, P. 113

BL College Journal
https://doi.org/10.62106/blc2024v6i1b7
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -VI, Issue-I, June 2024
Pp. 99-108

শুধু অভিশাপ নয়, গোপনীয়তাই নাট্যকৌশল
প্রসঙ্গ কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'

পারুল রানী বিশ্বাস

পারুল রানী বিশ্বাস
সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাউশি
ইনসিটু,সরকারি ব্রজলাল কলেজ
খুলনা, বাংলাদেশ
e-mail : parulranipc@gmail.com

সারসংক্ষেপ

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হলেন মহাকবি কালিদাস। বাণীর বরপুত্র কালিদাস মূলত কবি হলেও নাট্যরচনাতেও তাঁর কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। তাঁর রচিত 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটক সংস্কৃত সাহিত্যে তথা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে শ্রেষ্ঠ নাটক হিসেবে পরিগণিত। নাট্যকলার বৈচিত্র্যে, কাব্য শিল্পের মাধুর্যে, প্রেমের পবিত্রতায় কালিদাস তাঁর এই নাটকটিকে সমগ্রতায় পূর্ণ করে তুলেছেন। মহাভারতে বর্ণিত হস্তিনাপুররাজ দুষ্যন্ত ও আশ্রম বালিকা স্বর্গের অপ্সরা মেনকা এবং ঋষি বিশ্বামিত্র কন্যা শকুন্তলার প্রণয় ও পরিণয় কাহিনীই এই নাটকের উপজীব্য। কালিদাসের নাট্যপ্রতিভা দুষ্যন্ত-শকুন্তলার গোপন প্রেম, গোপন বিবাহ (গান্ধর্ব মতে), দুর্বাসার অভিশাপের কারণে দুষ্যন্তের আত্ম-বিস্মৃতি, শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান দৃশ্য এক অভিনব দক্ষতার পরিচয় বহন করে। প্রতিটি ক্ষেত্রে গোপনীয়তাকে আশ্রয় করে কবি সুকৌশলে ঘটনাপ্রবাহকে তাত্ত্বিক রূপদান করে নাটকের উৎকর্ষ সাধন করেছেন। দুর্বাসার অভিশাপ কালিদাসের অমর প্রতিভার অনবদ্য সৃষ্টি। অভিশাপের বিষয়টি যদি না থাকত তাহলে নাটকটি আরেকটি গতানুগতিক মিলনান্তক প্রেমকাহিনী হয়ে উঠত। কালিদাস দুর্বাসার অভিশাপ ও গোপনীয়তার বিষয়কে নাট্যকৌশল হিসেবে অবলম্বন করে অনুতাপ ও তপস্যার মধ্য দিয়ে আত্মপরিশুদ্ধির আদর্শ স্থাপন করেছেন। নাট্যকাহিনীকে সার্থকমণ্ডিত করতে নাট্যকারের নাট্যকৌশল অবলম্বনের সার্থক প্রয়াস সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে ।

মূলশব্দ

বিবাহ, গোপনীয়তা, অভিজ্ঞান, অভিশাপ, প্রত্যাখ্যান, পুনর্মিলন

ভূমিকা

মহাকবি কালিদাস তাঁর অমর সৃষ্টির দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্যকে এক সম্মানজনক প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যাস, বাল্মীকির পরে যে কবি অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভার আসনে অধিষ্ঠিত, তিনি হলেন কালিদাস।

তিনি ভারতের কবিকুল শিরোমণি,বাণীর বরপুত্র। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমালোচকগণ তাঁর কৃতিত্বকে এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। তাঁর বাস্তবজীবন, জন্ম-মৃত্যু ও কাল সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা না পেলেও তাঁর রচিত গ্রন্থে কবিমনের পূর্ণাঙ্গ ছবি সুন্দররূপে প্রতিফলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সেকাল' কবিতায় আক্ষেপ করে বলেছেন–

হায় রে,কবে কেটে গেছে
কালিদাসের কাল!
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে
লয়ে তারিখ সাল।[১]

বস্তুত কালিদাসের সঠিক সময়কাল নির্ণয়ে পণ্ডিতেরা এখনও একমত হতে পারেননি। জনশ্রুতি এই যে, কালিদাস খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে শকারী বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনীর রাজসভার নবরত্নের শ্রেষ্ঠতম সভাকবি ছিলেন। তাইতো বিশ্বকবি বলেছেন–

আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে
দৈবে হতেম দশম রত্ন
নবরত্নের মালে,
একটি শ্লোকে স্তুতি গেয়ে
রাজার কাছে নিতাম চেয়ে
উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে
কানন-ঘেরা বাড়ি।[২]

মহাকবি কালিদাস রচিত চারখানা কাব্য ও তিনখানা নাটকের মধ্যে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকটি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত। সপ্তম অঙ্কের এই নাটকটিতে প্রেম ও ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াস সুস্পষ্ট। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের মূল বিষয়বস্তু হল প্রেম। এ নাটকে কবির চেতনা বাস্তবনিষ্ঠ,সমাজ সচেতন ও উপমা নির্ভর । অপ্সরা কন্যা শকুন্তলা মানবীরূপে কণ্বমুনির আশ্রমে পালিতা। পিতা কণ্ব তাঁকে সন্ন্যাসিনী না করে সামাজিকভাবেই বড় করে তুলেছেন। সংসারী পিতার মতো কন্যাকে সৎপাত্রে পাত্রস্থ করার সংকল্প করেছেন- "গুণবতে কন্যকা প্রতিপাদনীয়া ইতি অয়ং তাবৎ প্রথমঃ সংকল্পঃ।"[৩] নাটকের শুরুতে পিতা কণ্ব সোমতীর্থে যান কন্যা শকুন্তলার দুর্দৈবশান্তির জন্য। আশ্রমমৃগকে অনুসরণ করতে করতে রাজা দুষ্যন্ত আশ্রমে প্রবেশ করেন। সৌন্দর্য-পিপাসু দুষ্যন্ত অন্তরাল হতে শকুন্তলার রূপদর্শনে মুগ্ধ হয়ে গান্ধর্ব মতে বিয়ে করেন। বিয়ের পর শকুন্তলাকে খুব তাড়াতাড়ি সসম্মানে নিজগৃহে নিয়ে যাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজের নাম লেখা আংটি উপহার দিয়েছিলেন। মূল নাটকীয়তা এই যে, দুর্বাসার অভিশাপের কারণে রাজা স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে গান্ধর্ব-বিবাহ[৪] এর কথা ভুলে গেলেন। শাপগ্রস্ত রাজা আত্মবিস্মৃতির জন্য সন্তানসম্ভবা শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। অত্যন্ত নাটকীয় তাৎপর্যপূর্ণতায় স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ আংটি প্রাপ্তি ও তা দর্শনে শাপমুক্তি অর্থাৎ পূর্বস্মৃতি ফিরে

পেলেন। নাটকের প্রায় প্রত্যেকটি ঘটনার সাথে গোপনীয়তার বিষয়টিকে কালিদাস মূলত নাট্যিক কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। রীতি ও আদর্শের খাতিরে কবি নাটকের পরিণামে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার শুভমিলন সাধন করেছেন।

উদ্দেশ্য

মহাকবি কালিদাস তাঁর রচনায় বাস্তবমুখী ও সমাজসচেতন ছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা বর্তমান সময়েও সমান উপযোগী ও প্রাসঙ্গিক। কালিদাসের প্রণয়কেন্দ্রিক নাটক 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'-এ বিশেষ করে নারীচরিত্রে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আত্মসম্মানবোধ ও অকুণ্ঠ আত্মপ্রকাশের প্রতিফলন দেখিয়েছেন তার সঙ্গে আধুনিক যুগের সমাজ চেতনার সাদৃশ্য কৌতূহল জাগায়। কেননা কালিদাস তাঁর যুগকে অতিক্রম করে যেন ভবিষ্যতের কথা জানতে বা বুঝতে পেরেছিলেন। দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার প্রেম-বিরহ-মিলন সবই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। শকুন্তলার প্রতি কণ্ব মুনির যে উপদেশাবলী তা বর্তমান সময়েও সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনের পক্ষে যথাযথ। ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন– "নাটকে নায়ক-নায়িকাকে মুখোমুখী দাঁড় করাইয়া, উভয়কে সত্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, উভয়ের নিকট উভয়কে দুর্বোধ্য করিয়া উভয়ের মধ্যে যে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি কালিদাস করিয়াছেন, তাহাই নাটকের চরম মুহূর্ত।"[৫] দুর্বাসার অভিশাপ ও গোপনীয়তা রক্ষার নাট্যকৌশল অবলম্বনে কালিদাস যে কতখানি সিদ্ধহস্ত 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের আলোকে তা অনুসন্ধানই এ গবেষণাপত্রের উদ্দেশ্য।

প্রকাশনা

মহাকবি কালিদাস ও তাঁর রচিত 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটক নিয়ে লেখার সংখ্যা অন্তহীন। তবুও কালজয়ী সাহিত্যিক ও তাঁর সাহিত্যকৃতি নিয়ে গবেষকদের নিত্য-নতুন চিন্তাধারা বহমান। অনেক প্রকাশনাতে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটক নিয়ে গবেষণাধর্মী রচনা প্রকাশিত হয়েছে। ডঃ সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, ডঃ প্রীতি মুখোপাধ্যায়, ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রবোধচন্দ্র সেন এর গবেষণা উল্লেখযোগ্য।

পদ্ধতি

বর্তমান প্রবন্ধটিতে বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেয়া হয়েছে।

বিশ্লেষণ

কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' একখানি মিলনান্তক নাটক। এই নাটকের মূল বিষয়বস্তু প্রেম। কালিদাসকে এজন্য প্রেমের কবিও বলা হয়ে থাকে। কেননা অশুভান্ত অর্থাৎ বিয়োগান্তক নাট্যরচনা ছিল তৎকালীন ভারতীয় রীতিবিরুদ্ধ। তথাপি এই নাটকে যে বিষয়টি মনকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দেয় সেটি হচ্ছে বহুপ্রণয়ী ভোগপরায়ণ নীতিবোধহীন দুষ্যন্তের কপটাচার এবং তাঁর ছলনার ফাঁদে পড়া সরলহৃদয়া শকুন্তলার করুণ পরিণতি। আদর্শ ও রীতির আলোকে কালিদাস নাটকের পরিণামে শুভমিলন ঘটিয়েছেন বটে, কিন্তু নাটকটি শেষ করবার পরেও যা আমাদের হৃদয়ে সবচেয়ে বেশি করে জেগে থাকে তা হচ্ছে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানের নিদারুণ দৃশ্য এবং শেষ

অঙ্কের সরল ও শুদ্ধশীলা শকুন্তলার করুণ মূর্তি–

বসনে পরিধূসরে বসানা
নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা
মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্তি ॥[৬]

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, যার ভোগাসক্ত প্রেমের ফলে শকুন্তলার এই দশা, সেই নিষ্ঠুর ভোগপরায়ণ কপট দুষ্যন্ত-চরিত্রের উপাদান কালিদাস পেলেন কোথায়? প্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছেন– "মনে হয় তৎকালীন সাম্রাজ্যবৈভবে নিমগ্ন ভোগপ্রমত্ত গুপ্তসম্রাটদের আচরণের মধ্যেই তিনি দুষ্যন্তচরিত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন। সম্ভবতঃ তাই তিনি তাঁদের সম্মুখে অনুতাপ-তপস্যার মধ্য দিয়ে আত্মপরিশুদ্ধির আদর্শ স্থাপন করেছিলেন।"[৭]

নাটকের প্রারম্ভেই সূত্রধর বিস্মরণ দিয়ে অভিনয়ের সূত্রপাত করেছেন। প্রথমেই তিনি জানালেন নাটকের নায়ক রাজা দুষ্যন্ত পশু শিকারে বের হয়ে ভুলক্রমে আশ্রমমৃগের পশ্চাৎ অনুসরণ করেছেন। মালিনী তীরবর্তী ঋষি কণ্বাশ্রমে প্রবেশের মুখেই রাজা দুষ্যন্ত ঋষিদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। বৈখানস জানিয়েছেন, এটি আশ্রমমৃগ একে বধ করা উচিৎ নয়- "রাজন্, আশ্রমমৃগোয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ।"[৮] রাজা তৎক্ষণাৎ বাণ সংবরণ করলেন। বৈখানস রাজার এমন আচরণে প্রীত হয়ে রাজাকে পুরুবংশের অনুরূপ বিনয়ভূষিত রাজচক্রবর্তী লক্ষণযুক্ত পুত্র লাভ করার আশীর্বাদ প্রদান করলেন–

জন্ম যস্য পুরোর্বংশে যুক্তরূপমিদং তব।
পুত্রমেবংগুণোপেতং চক্রবর্তিনমাপ্নুহি ॥[৯]

আশীর্বাদ প্রদানের সাথে তিনি রাজাকে কুলপতি কণ্বের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন– "ন চেদন্যকার্যাতিপাতঃ, প্রবিশ্য প্রতিগৃহ্যতামাতিথেয়ঃ সৎকারঃ।"[১০] তিনি এও জানালেন কণ্বমুনি কন্যা শকুন্তলার উপর অতিথিসেবার ভার দিয়ে তাঁরই দূরদৃষ্টের শান্তির জন্য সোমতীর্থে গেছেন। রাজাও নিমন্ত্রণ স্বীকার করে বিনীতবেশে তপস্বী-জনোচিত বিনা আড়ম্বরে শকুন্তলার মাধ্যমে মহর্ষি কণ্বের প্রতি ভক্তি নিবেদন করার জন্য আশ্রমে প্রবেশ করতে উদ্যোগী হলেন– "সা খলু বিদিতভক্তিং মাং মহর্ষেঃ কথয়িষ্যতি।"[১১] তিনি তপোবনের দিকে অগ্রসর হতেই তাঁর দক্ষিণবাহুর স্পন্দন অনুভব করলেন, যার ফল স্ত্রীলাভ। মনে মনে ভাবছেন ঋষির আশ্রমে এ কি করে সম্ভব! অতঃপর ভবিতব্যের দ্বার সর্বত্র খোলা-এই ভেবে তিনি অগ্রসর হলেন–

শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য ।
অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র ॥[১২]

শকুন্তলার রূপে আকৃষ্ট হয়ে মহর্ষি কণ্বের প্রতি ভক্তি নিবেদনের মহৎ কার্য ভুলে গেলেন। তপোবনে প্রবেশের মুখে প্রথমেই শকুন্তলা ও দুই সখীর বিশ্রম্ভালাপ শুনে রাজা দুষ্যন্ত নিজেকে বৃক্ষান্তরালে গোপন করলেন। তিনি নিজেকে লুকিয়ে রেখে গোপনে শকুন্তলার রূপসুধা পান করছেন। এই গোপনীয়তার মাঝেই প্রথম প্রেমের বীজ উপ্ত হয়েছিল। রাজা বল্কল পরিহিতা শকুন্তলার রূপের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন-পদ্ম যেমন শৈবালে

ঘেরা থাকলেও সুন্দর লাগে; চাঁদের কলঙ্ক মলিন হলেও তা তার সৌন্দর্য বাড়ায়, তেমনি শকুন্তলা বল্কল পরে থাকলেও তার সৌন্দর্য মোটেই কমেনি। বরং তাকে আরও বেশি ভালো লাগছে। অর্থাৎ আকৃতি যাদের সুন্দর- সবই তাদের অলংকার–

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্ ॥[১৩]

শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে পাবার বাসনা যতই জেগে উঠছে, ততই সন্দেহ হচ্ছে সে ক্ষত্রিয়ের বিবাহযোগ্য কি-না। এই সন্দেহের অবকাশ হলে রাজা নিজেই ভাবছেন যেহেতু আমার কর্তব্যনিষ্ঠ মন একে চাইছে, অবশ্যই এ কন্যার ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বিবাহ হতে পারে। যেসব ক্ষেত্রে সন্দেহ উপস্থিত হয়, সেক্ষেত্রে সৎলোকের অন্তঃকরণই প্রমাণ–

অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা যদার্য্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ।
সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ ॥[১৪]

দুষ্ট ভ্রমরের হাত থেকে শকুন্তলাকে রক্ষার অজুহাতে তাদের সামনে রাজা নিজেকে প্রকাশ করলেন। শকুন্তলা অপ্সরা মেনকা ও ঋষি বিশ্বামিত্রের কন্যা এবং কণ্বমুনির আশ্রমে পালিতা, দুই সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার কাছ থেকে জেনেছেন। পিতা কণ্ব তাকে যোগ্য বরে সম্প্রদান করবেন-এ বৃত্তান্তও জেনে নিলেন। শকুন্তলার প্রেমে এতই মুগ্ধ হলেন যে তপোবন ছেড়ে যেতে কিছুতেই মন চাচ্ছে না। তাই তিনি রাজধানী ফিরে না গিয়ে তপোবনের কাছেই কিছুদিন থেকে গেলেন। শকুন্তলাকে আবার দেখার জন্য বিদূষককে পুনরায় তপোবনে প্রবেশের উপায় খুঁজতে বলেছেন– "চিন্তয় তাবৎ কেনাপদেশেন সকৃদপ্যাশ্রমে বসামঃ।"[১৫] কিন্তু বিদূষক রাজকার্য ত্যাগ করে বনচরের বৃত্তি গ্রহণ করায় ক্ষোভের সাথে বললেন- এই যে হরিণ,এই যে শূকর,এই যে বাঘ- এই করে দুপুরবেলাতেও গ্রীষ্মকালের ছায়াহীন বনের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছুটে বেড়াতে হচ্ছে। গাছের পাতা পচে লাল হওয়া পাহাড়ি নদীর তেতো জল খেতে হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ে খাবার জোটে না-আর যা জোটে অধিকাংশ সময়েই তা হয় শূলে ঝলসানো মাংস– "অয়ং মৃগঃ অয়ং বরাহঃ অয়ং শার্দূল ইতি মধ্যাহ্নে অপি গ্রীষ্মবিরলপাদপচ্ছায়াসু বনরাজিষু আহিণ্ড্যতে অটবীতঃ অটবী। পত্রসংকরকষায়াণি কটূনি গিরিনদীজলানি পীয়ন্তে। অনিয়তবেলং শূল্যমাংসভূয়িষ্ঠ আহারো ভুজ্যতে।"[১৬]

কণ্বমুনিকে আশ্রম থেকে দূরে রাখা মহাকবি কালিদাসের নিখুঁত পরিকল্পনা। এই সময় যদি তিনি আশ্রমে থাকতেন তাহলে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার নির্বিঘ্ন প্রেমে বাধা ঘটত। নাট্যকারের এই নাট্যিক পরিকল্পনায় কণ্বমুনির অনুপস্থিতিতে ঋষিদের যজ্ঞানুষ্ঠানে রাক্ষসদের বিঘ্ন সৃষ্টির হাত থেকে রক্ষার জন্য আরও কিছুদিন দুষ্যন্ত রাজার আশ্রমে থাকার সুযোগ হল। যখন আর কোনো অজুহাতই খুঁজে পাচ্ছিলেন না– তখন এই কাজই আশীর্বাদ হল। এমন সময় রাজঅন্তঃপুর থেকে রাজমাতার নির্দেশ এলে তপস্বীদের সেবার জন্য রাজা আশ্রমে থেকে গেলেন এবং মায়ের সেবার জন্য বিদূষককে পাঠিয়ে দিলেন। যখন দুজনই পরস্পরের প্রতি কামনাসক্ত তখন

দুই সখীই বেতসকুঞ্জে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার গোপন বিবাহের ব্যবস্থা করেন। গান্ধর্ব মতে বিবাহে শকুন্তলা ভীত ছিলেন,কেননা পিতা কণ্ব এটা অনুমোদন করবেন কি-না এই আশঙ্কায়। রাজা তাকে আশ্বস্ত করলেন- মাননীয় কুলপতি কণ্ব সকল ধর্ম জানেন,তাই তিনি এ ব্যাপারে দোষ ধরবেন না–

গান্ধর্বেণ বিবাহেন বহ্ব্যো রাজর্ষিকন্যকাঃ।
শ্রূয়ন্তে পরিণীতাস্তাঃ পিতৃভিশ্চাভিনন্দিতাঃ ॥[১৭]

গান্ধর্ব মতে বিবাহ সম্পন্ন করে আশ্রমের যজ্ঞকার্যে রাক্ষস বিতাড়নের দায়িত্ব-পালন করার জন্য কিছুদিন আশ্রমে অবস্থান শেষে শকুন্তলাকে নিজের নাম লেখা আংটি দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেন, নাম গণনা শেষ হবার পূর্বেই তিনি তাঁকে রাজঅন্তঃপুরে নিয়ে যাবার জন্য শিবিকা পাঠাবেন-

একৈকমত্র দিবসে দিবসে মদীয়ং নামাক্ষরং গণয় গচ্ছসি যাবদন্তম্।
তাবৎ প্রিয়ে! মদবরোধ-গৃহ-প্রবেশং নেতা জনস্তব সমীপমুপৈষ্যতীতি ॥[১৮]

নাটকের তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত ঘটনাবলী যখন সুন্দরভাবে চলছিল ঠিক তখনই ঘটল অঘটন। এ নাটকের মূল নাট্যকৌশল দুর্বাসার অভিশাপ। সন্তানসম্ভবা শকুন্তলা এতই বিরহ-অনলে দগ্ধ ও অন্যমনস্কা ছিলেন যে ঋষি দুর্বাসার আহ্বান শুনতেই পেলেন না। অপমানিত হয়ে ঋষি দুর্বাসা অভিশাপ দিলেন- যার চিন্তা করতে গিয়ে তুই আমাকে চিনতে পারলি না সে-ই তোকে একদিন মনে করিয়ে দিলেও চিনতে পারবে না–

বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা
তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্ ।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব ॥[১৯]

শকুন্তলার এত ভাবনার পিছনে কী কারণ ছিল ? গোপন বিবাহই এত চিন্তার কারণ যা আমরা দুই সখীর থেকে জানতে পারি। অনসূয়ার ভাষায়-প্রিয়ংবদা, যদিও গান্ধর্ব মতে বিবাহ করে শকুন্তলা যোগ্য বর লাভ করেছে এবং এতে তার মঙ্গলই হয়েছে-সেজন্য আমার মন আশ্বস্ত। কিন্তু রাজধানীতে গিয়ে অন্তঃপুরের অন্যান্য মহিষীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি এই আশ্রমের ঘটনা মনে রাখবেন কি?– "প্রিয়ংবদে যদ্যপি গান্ধর্বেণ বিধিনা নির্বৃত্তকল্যাণা শকুন্তলা অনুরূপভর্ত্তৃগামিনী সং বৃত্তা ইতি নির্বৃতং মে হৃদয়ম্, তথাপি এতাবৎ চিন্তনীয়ম্। আত্মনঃ নগরং প্রবিশ্য অন্তঃপুরসমাগতঃ ইতোগতং বৃত্তান্তং স্মরতি বা ন বেতি।"[২০] প্রিয়ংবদার ভাষায়-স্বামীর চিন্তায় তার নিজের কথা পর্যন্ত খেয়াল নেই– "ভর্তৃগতয়া চিন্তয়া আত্মানম্ অপি ন এষা বিভাবয়তি।"[২১] আত্মবিস্মৃত শকুন্তলা দুর্বাসার অভিশাপ পর্যন্ত শুনতে পাননি, শুনেছেন দুই সখী। প্রিয়ংবদা ঋষির পায়ে পড়ে অভিশাপ খণ্ডনের উপায়ও জেনে নিলেন। স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ কোনো অলঙ্কার দেখাতে পারলে অভিশাপের অবসান হবে– "অভিজ্ঞানাভরণদর্শনেন শাপো নিবর্তিষ্যত ইতি মন্ত্রয়ন্ স্বয়ম্ অন্তর্হিতঃ।"[২২] কিন্তু সখীরা-নবমল্লিকার উপর উষ্ণ বারি সেচন হবে মনে করে শকুন্তলাকে সে সকল কথা গোপন করলেন– "কো নাম উষ্ণোদকেন নবমালিকাং সিঞ্চতি?"[২৩] এমনকি পতিগৃহে যাত্রাকালে শাপখণ্ডনের উপায় যে আংটি, সেটিকে সযত্নে রক্ষা করার জন্য শকুন্তলাকে বিশেষভাবে সতর্কও করে দিলেন না। এখানেও গোপনীয়তাকে সুকৌশলে আশ্রয় করা হয়েছে।

সমস্ত নদী যেমন সমুদ্রে এসে মিলিত হয়, তেমনি সব গোপনীয়তার বিষময় ফল একত্রিত হল নাটকের পঞ্চম অঙ্কে। অভিশাপের কারণে রাজা দুষ্যন্ত পূর্বস্মৃতি ভুলে গিয়ে অন্তঃসত্ত্বা শকুন্তলাকে পরস্ত্রী ভেবে প্রত্যাখ্যান করলেন। সখীরা শকুন্তলাকে অমঙ্গলের হাত থেকে বাঁচাতে যে কথা গোপন করলেন প্রকৃতপক্ষে তাতে তাঁর অমঙ্গল হ্রাস পায়নি। বরং শকুন্তলা অভিশাপের কথা জানলে আংটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে সচেতন থাকতে পারতেন। তাহলে শচীতীর্থে স্নানের সময় আংটি হারানোর সম্ভাবনা থাকতো না। তাতেই হয়তো প্রত্যাখ্যান দুঃখ এড়ানো যেত। যদিও যাবার বেলায় সখীরা সতর্ক করেছেন- যদি রাজা তোমাকে চিনতে না পারেন, তবে তাঁকে তাঁর নিজের নাম লেখা আংটিটি দেখিও– "সখি, যদি নাম স রাজা প্রত্যভিজ্ঞানমন্থরো ভবেৎ ততঃ তস্মৈ ইদম্ আত্মনামধেয়াঙ্কিতম্ অঙ্গুলীয়কং দর্শয়। "[২৪] কিন্তু শকুন্তলা যদি জানতেন আংটিই তাঁর গ্রহণ-প্রত্যাখ্যানের প্রমাণক, তবে সর্বদা সচেতন থেকে তা রক্ষা করতেন। আংটি দেখাতে পারলে শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাতা হতেন না। তাতে আর যাই হোক- এ নাটক 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা' হতো না। নাট্যকার অত্যন্ত নাটকীয়তার সাথে ঘটনা-প্রবাহকে গোপন রেখে নাটকের গতিকে ত্বরান্বিত করে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার পুনর্মিলন ঘটিয়েছেন ।

নাটকের শুরুতে আমরা দেখতে পাই তপোবনে প্রবেশের পথে রাজা দুষ্যন্ত যদি আত্মগোপন না করতেন তাহলে হয়তো তিনি মহর্ষি কণ্বের প্রতি ভক্তি নিবেদনের মহৎ কার্য বিস্মৃত হতেন না এবং শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ হয়ে তিনি ক্ষত্রিয়ের বিবাহযোগ্য কি-না এই বিষয়ে তাঁর মনোবাসনা আছে কি-না খোঁজ নিতে যেতেন না। আত্মগোপনতাই তাঁকে এ পথের নির্দেশ দিয়েছিল। তারপর তিনি প্রথম দর্শনেই শকুন্তলাকে ভালবেসে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করলেন এবং বিষয়টা সকলের কাছে গোপন করলেন। প্রিয় সুহৃদ বিদূষক অন্তঃপুরে গিয়ে অন্যান্য মহিষীদের কাছে বলে বসেন কি না-এই ভয়ে রাজধানীতে আগমনকালে তাকে বললেন, বাস্তবিকই শকুন্তলার প্রতি আমার কোনো অভিলাষ নেই এবং সখে পরিহাস করে যা বলেছি, তা সত্য বলে ধরে নিও না-"ন খলু সত্যমেব তাপসকন্যকায়াং মমাভিলাষঃ। পরিহাসবিজল্পিতং সখে পরমার্থেন ন গৃহ্যতাং বচঃ।"[২৫] সরল বিদূষক রাজাকে বিশ্বাস করে রাজধানীতে গিয়ে শকুন্তলা-প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন না। প্রকৃতপক্ষে এখানেই গোপনীয়তার বিষবৃক্ষের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। কেননা রাজা যদি বিদূষকের কাছে গোপন না করতেন, তবে রাজধানীতে গিয়েই তিনি শকুন্তলার সংবাদ নিতেন এবং নিজেই হয়ত শকুন্তলাকে আনার উদ্যোগ নিতেন। তাহলে হয়ত শকুন্তলা বিহ্বলচিত্তে চিন্তিত হতেন না এবং অভিশাপ-প্রাপ্তও হতেন না । অভিশাপ না থাকলে প্রত্যাখ্যানের ঘটনাও ঘটত না।

রাজা যে শুধু বিদূষককে গোপন করেছেন তা নয়, নিজের মাতাকেও শকুন্তলার বিষয়ে গোপন করেছেন। যে মাতা উপবাসব্রত পালনে একমাত্র পুত্রের অনুপস্থিতিকে মেনে নিয়ে ক্ষমা করেছেন। মাতা জানলে হয়ত আগেই শকুন্তলাকে অন্তঃপুরে আনার ব্যবস্থা করতেন অথবা প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলাকে রাজঅন্তঃপুরে রাখার ব্যবস্থা করতে পারতেন। নাট্যকারের এ কি নাটকীয়তা! কোনো ব্যবস্থাই সম্ভবপর হয়নি রাজার গোপনীয়তার জন্য।

মহাকবি কালিদাসের নাটকীয়তার চরম উৎকর্ষতা এই যে, কণ্বমুনির অনুপস্থিতিতে আশ্রমের কাউকে না জানিয়ে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার গোপন-পরিণয় ঘটানো। রাজা গোপনে বিয়ে না করে মুনির আগমনের প্রতীক্ষা করতে পারতেন অথবা হস্তিনাপুরে ফিরে গিয়ে মুনির নিকট প্রস্তাব পাঠাতে পারতেন। মুনি হয়ত না করতেন না। কেননা তিনি নিজেই কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করবেন বলে স্থির করেছেন– "গুরোঃ পুনঃ অস্যাঃ

অনুরূপবরপ্রদানে সংকল্পঃ।"[২৬] রাজা দুষ্যন্তের মতো শকুন্তলাও গোপনীয়তার আশ্রয় নিয়েছেন। দুই সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা তাঁদের গোপন-বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন। যখন লতাকুঞ্জে মিলনের সুযোগ করে দিয়েছিলেন তখন কণ্বভগিনী গৌতমী অসুস্থ শকুন্তলার শারীরিক কুশলাদি জানতে উপস্থিত হলে সখীরা রজনী-আগত বলে শকুন্তলাকে সাবধান করে দিলেন। তারা যদি মাতৃসমা গৌতমীকে শকুন্তলার মানসিক উদ্বেগজনিত অসুস্থতার সত্য কারণ গোপন না করে জানাতেন, তাহলে হয়ত তিনি স্নেহবশে তা সমর্থন করতেন এবং গোপন-পরিণয়ের কথা কণ্বমুনিকে জানাতে পারতেন। তিনি শকুন্তলাকে নিয়ে রাজসভায় উপস্থিত হয়ে রাজাকে ক্ষোভের সাথে বলেছেন-আপনারা দুজনে গুরুজন ও আত্মীয়-স্বজন কাউকে কিছু না জানিয়ে গোপনে বিবাহ করেছেন–

নাপেক্ষিতো গুরুজনোনয়া ন ত্বয়া পৃষ্টো বন্ধুঃ।
একৈকমেবং চরিতে ভণামি কিমেকৈকম্ ॥[২৭]

পিতা কণ্ব সোমতীর্থ থেকে আশ্রমে ফিরে আসার পর তাঁর কাছে শকুন্তলার বিবাহের কথা গোপন করা হয়েছিল। যদিও পিতা কণ্ব এক অশরীরী ছন্দোময়ী বাণীতে সে সকল ঘটনা অবগত হয়েছেন– "অগ্নিশরণং প্রবিষ্টস্য শরীরং বিনা ছন্দোময্যা বাণ্যা।"[২৮] কিন্তু অভিশাপের বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞাত রইলেন। তিনি যদি জানতেন তাহলে কোনো শিষ্যকে দিয়ে আংটিটি রাজার কাছে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করতে পারতেন। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময় যদি সখীরা মাতা গৌতমী, শার্ঙ্গরব বা শারদ্বতকে দুর্বাসার অভিশাপ এবং তা খণ্ডনের উপায় স্বরূপ আংটিটির কথা জানাতেন, তাহলে তারাও হয়ত সেটি সতর্কতার সাথে রক্ষা করে রাজাকে দিতে পারতেন। তাহলে আত্ম-বিস্মৃত রাজার আংটি দেখে সব ঘটনা মনে পড়ত এবং শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করতেন না।

শকুন্তলার প্রতি রাজার ভালবাসায় ও প্রেমে কোনো ছলনা ছিল না। কেননা পাছে তিনি অবজ্ঞা করেন কি না-এই আশঙ্কায় যখন শকুন্তলা ভীত তখন রাজা শকুন্তলাকে বললেন– "তুমি,যাহার অবজ্ঞাভয়ে ভীত হইতেছ, সে এই, তোমার সমাগমের নিমিত্ত, একান্ত উৎসুক হইয়া রহিয়াছে; তুমি কি জান না, রত্ন কাহারও অন্বেষণ করে না, রত্নের অন্বেষণ সকলে করিয়া থাকে।"[২৯] এতটা ভালবাসা ও মূল্যায়ন থাকা সত্ত্বেও তাঁদের দুঃখের কারণ ছিল দুর্বাসার অভিশাপ ও গোপনীয়তা।

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকে দুর্বাসার অভিশাপ কবি কল্পনার এক অভিনব সৃষ্টি। বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের সাথে গোপনীয়তা রক্ষা মূলত নাট্যকারের নাট্যিক অগ্রগতির একটা কৌশল। অভিশাপের অনলে পুড়ে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার চরিত্র আরও অমলিন, আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। অভিশাপ না থাকলে দুষ্যন্তের সঙ্গে শকুন্তলার বিবাহ ও তাঁকে পতিগৃহে প্রেরণের দ্বারাই নাটকের আঙ্গিক পরিসমাপ্তি ঘটত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুর্বাসার অভিশাপ ও গোপনীয়তা এই গতানুগতিক ঘটনাকে একেবারে ওলট-পালট করে দিয়েছিল । প্রত্যাখ্যান, বিরহ ও অনুতাপে পর্যবসিত হয়ে নতুন ঘটনার সমাবেশে নাটকের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অঙ্কে সন্নিবিষ্ট হবার অবকাশ করে দিল। ড. প্রীতি মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়– "রামচন্দ্র যদি সোনার হরিণের পশ্চাদ্ধাবন করে সীতা অপহরণের সুযোগ না এনে দিতেন তবে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচিত হ'ত কিনা সন্দেহ। এখানেও তেমনি আশ্রমমৃগটি রাজাকে পথ ভুলিয়ে আশ্রমে না নিয়ে এলে সপ্ত অঙ্কের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটক রচিত হ'ত একথা কল্পনাতীত। মায়াবী হরিণ রামকে সীতার কাছ হতে দূরে সরিয়ে দিয়ে কার্যের সমাপ্তি করেছে, এখানে মৃগটিও রাজাকে

আশ্রমে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তার কার্য শেষ করেছে।"[৩০] মারীচের আশ্রমে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার পুনর্মিলনের বেলায় শাপবৃত্তান্ত জ্ঞাত হলে তাঁরা উভয়ে বেদনার ভার লাঘব করে সংশয়বিরহিত পূর্ণতার মধ্যে পরস্পর মিলিত হলেন। নাটকটিও যথার্থ সার্থকতায় মণ্ডিত হয়ে উঠল।

উপসংহার

কালিদাসের সাহিত্যকৃতিতে যে-সব চরিত্র এসেছে, তারা সবাই দোষে-গুণে গড়া। তিনি কিন্তু দোষকে প্রশ্রয় দিয়ে, তার পরিণতি দুঃখের কালিমার ছবি এঁকে, তাঁর রচনার ইতি টানেননি। চিত্তসংস্কারের মাধ্যমে, আত্মশুদ্ধির দ্বারা সমস্ত কালিমা ধুয়ে-মুছে চরিত্রগুলি নির্মল করে, তবেই তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন। মানবচরিত্র অনুধাবনে অন্তর্জগতকে তিনি যেন প্রত্যক্ষ দেখেছেন। তাই তাঁর সাহিত্যকৃতিতে বারবার অভিশাপের কথা এসেছে, বিরহের কথা এসেছে। শাপগ্রস্তের শাপমুক্তি ঘটিয়েছেন– যে শাপ তাতে বর্তেছিল পাপের কারণে, তাকে দূর করে কবি আনন্দ লাভ করেছেন এবং নাটকীয়তার গতি সঞ্চার করেছেন। তবে অভিশাপই কালিদাসের সাহিত্যের তাৎপর্য নয়-তাৎপর্য অভিশাপ মোচনে। এই নাটকে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার প্রেম, বিরহ ও পুনর্মিলন সবই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। সমগ্র নাটকই প্রকৃতির সঙ্গে মানবজগতের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের পটভূমিকায় রচিত ও লালিত হয়েছে। পিতৃগৃহ ত্যাগ করে কন্যার পতিগৃহে যাওয়ার সময়ের করুণদৃশ্যের আবেদন সর্বকালের, সর্বজনের। পতিগৃহে যাত্রাকালে শকুন্তলার প্রতি মহর্ষি কণ্বের চিরন্তন উপদেশবাণী-পতিগৃহে গিয়ে গুরুজনদের সেবা করবে; সপত্নীদের সাথে প্রিয়সখীর মতো ব্যবহার করবে; স্বামী বিরুদ্ধ আচরণ করলেও রাগের বশে স্বামীর বিরুদ্ধ হবে না; ধন-সম্পদে গর্বিত হবে না-এইরকম ব্যবহারের দ্বারাই যুবতীরা প্রকৃত গৃহিণীর মর্যাদা পায়। যারা এর বিপরীত আচরণ করে তারা সংসারের যন্ত্রণার কারণ হয়–

শুশ্রূষস্ব গুরুন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ ॥[৩১]

পতিগৃহে নববধূর আচরণীয় কর্তব্যনির্দেশ মহর্ষি কণ্ব যেভাবে করেছেন-তার চিরন্তন মূল্য আছে এবং তা আজও আদর্শ বহন করে। শকুন্তলার পরীক্ষা, দুষ্যন্তের অনুশোচনা, মর্তের কামনাকে স্বর্গীয় প্রেমে পরিণত করে কালিদাস অপূর্ব মহিমায় 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকটি রচনা করে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।

তথ্যসূত্র

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ক্ষণিকা*, বুকস্ ফেয়ার,ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১৫, পৃ. ৪৫

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

৩. ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী (সম্পা.), *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা, পরিবর্ধিত ষষ্ঠ সংস্করণ, ২৭ শে জুলাই ২০০৬, পৃ.২৩২, ৪.১

৪. 'গান্ধর্ব-বিবাহ' একপ্রকার প্রাচীন হিন্দু বিবাহরীতি যা ধর্মশাস্ত্রসম্মত। মনুসংহিতায় আট প্রকার বিবাহ-পদ্ধতির বর্ণনা আছে। যেমন- ব্রাহ্ম, প্রজাপত্য, আর্য, দৈব, আসুরিক, গান্ধর্ব, পৈশাচ ও রাক্ষস বিবাহ। সাধারণ অর্থে গান্ধর্ব

বিবাহ মানে গোপন বিবাহ। নর-নারীর মধ্যে পরস্পর প্রতিশ্রুতি দিয়ে পিতামাতার অনুমতির অপেক্ষা না করে মালা বিনিময়ের মাধ্যমে যে বিবাহ হয়,তাই গান্ধর্ব-বিবাহ।

৫. ড. বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য, *সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা*, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ১৯৭২, পৃ.৯৭

৬. ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ.৫১৮, ৭.২৪

৭. প্রবোধচন্দ্র সেন, *ভারতাত্মা কবি কালিদাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃ.৮৩

৮. ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ.৪০, ১.১০

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪, ১.১২

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬, ১.১২

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮, ১.১৩

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩, ১.১৪

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৬১, ১.১৭

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৬৮, ১.১৯

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৩, ২.১৪

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ.১১৪, ২.১

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ.২১৯, ৩.১৭

১৮. ড. প্রীতি মুখোপাধ্যায়, নূতন ভাবনায় কালিদাস, গুপ্ত প্রেশ, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ-২০ শে এপ্রিল ১৯৯৯, পৃ.৭

১৯. ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬, ৪.২

২০. প্রাগুক্ত, পৃ.২৩২, ৪.১

২১. প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৯, ৪.৩

২২. প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৮, ৪.৩

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৯, ৪.৩

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৫, ৪.২৫

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৮, ২.২০

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৯৪, ১.২৬

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪২, ৫.১৫

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ.২৫২, ৪.৬

২৯. মুহম্মদ আব্দুল হাই (সম্পা.), *বিদ্যাসাগর-রচনাসংগ্রহ*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, দশম সংস্করণ, ১৯৬৮, পৃ .১৩৯

৩০. ড. প্রীতি মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ.১১

৩১. ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০, ৪.২৩

ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -VI, Issue-I, June 2024

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

ISSN: 2664-228X (Print)
ISSN: 2710-3684 (Online)

Government Brajalal College
Khulna
Bangladesh

Contents

English Section

- Characterizations of Correlation Coefficient
  Anwar H. Joarder & Md Forhad Hossain 111-127
- Human-Nature Connection: Eco-ethical Reading of Louise Gluck's *The Wild Iris*
  Toya Nath Upadhyay & Janak Paudyal 128-141
- Romanticizing Sufism: Tracing Spiritual Echoes of the Divine between Sufism and Romanticism
  Roxana Khanom 142-152
- Crisis of Humanism, Failure of American Dream, and Quest for Global Harmony in Fitzgerald's *The Great Gatsby*
  Raj Kumar Gurung, Ph.D. 153-165
- The Folk Performing Arts Containing Four Art Forms of Assam and Its Present Status
  Dr. Sudarshana Baruah 166-176
- Mythical Realities in Nepali Writings Mahabharata Mythic in Krishna Dharabasi's Radha
  Mani Bhadra Gautam, Ph. D 177-188
- An Exploratory Study on Status, Prospects and Challenges of Tourism Industry in Telangana State, India
  Dr. Sukanta Sarkar 189-202

Volume -VI, Issue-I, June 2024

BL College Journal
https://doi.org/10.62106/blc2024v6i1e1
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -VI, Issue-I, June 2024
Pp. 111-127

Characterizations of Correlation Coefficient

Anwar H. Joarder

Md. Forhad Hossain

Abstract

The probability density function of correlation coefficient conditional of chi-square variables has been derived. Then the pdf of the correlation coefficient has been easily derived. The conditional moments of correlation coefficient have been derived. The well known moments of correlation coefficient can be easily and quickly derived from the conditional moments. The intermediate steps of the derivation in terms of conditional distributions or moments seem to be worth recording and will be instructive to learners and instructors. A random decomposition of sample correlation coefficient has been discussed. An algorithm has been presented to calculate sample correlation coefficient by using only sample variance.

Anwar H. Joarder
Department of Mathematics
School of Science and Engineering
Al Akhawayn University in Ifrane
Ifrane 53000, Morocco
e-mail : a.joarder@aui.ma

Md. Forhad Hossain
Vice Chancellor
Mawlana Bhashani Science
and Technology University
Santos, Tangail 1902,
Bangladesh
e-mail : forhad.ju88@yahoo.com

Keywords

Correlation coefficient, Conditional moments of correlation coefficient; Random decomposition of correlation coefficient

Introduction

For a historical account of linear correlation coefficient between two random variables, say X and Y, we refer to Rodgers, J.L. and Nicewander, W.A. (1988) and Stigler (1989). In this paper present a mathematical tutorial of the linear correlation coefficient based on a random sample of size $n \geq 2$.

Let $(X_{1j}, X_{2j}),\ j=1,2,...,n,$ where $n \geq 2$ be independent samples from a bivariate normal distribution with $a_{ii} = mS_{ii} = mS_i^2 = \sum_{j=1}^{n}(X_{ij} - \bar{X}_i)^2,\ m = n-1, (i=1,2)$ and $a_{12} = \sum_{j=1}^{n}(X_{1j} - \bar{X}_1)(X_{2j} - \bar{X}_2)$ which can also be written as $a_{12} = mS_{12} = mRS_1S_2$ where the quantity

$$R = \frac{S_{1,2}}{S_1 S_2} = \frac{a_{12}}{(a_{11}a_{22})^{1/2}}$$

is the sample product moment correlation coefficient. The pdf (probability density function) of a_{11}, a_{22} and a_{12} is given by

$$f_1(a_{11}, a_{22}, a_{12}) = \frac{\left(1-\rho^2\right)^{-m/2}(\sigma_1\sigma_2)^{-m}}{2^m\sqrt{\pi}\Gamma(m/2)\Gamma((m-1)/2)}\ \left(a_{11}a_{22} - a_{12}^2\right)^{(m-3)/2}$$

$$\times \exp\left(\frac{-a_{11}}{(2-2\rho^2)\sigma_1^2}\right)\exp\left(\frac{-a_{22}}{(2-2\rho^2)\sigma_2^2}\right)\exp\left(\frac{\rho a_{12}}{(1-\rho^2)\sigma_1\sigma_2}\right), \quad (1.1)$$

where $a_{11} > 0, a_{22} > 0, -\infty < a_{12} < \infty, -1 < \rho < 1,\ m \geq 1, \sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0$. See e.g. Anderson (2003, 252).

Under the transformation $a_{11} = ms_1^2, a_{22} = ms_2^2, a_{12} = mrs_1s_2$ in (1.1) with Jacobian $J((a_{11}, a_{22}, a_{12}) \to (s_1^2, s_2^2, r)) = m^3 s_1 s_2$, the pdf of S_1^2, S_2^2 and R is given by

$$f_2(s_1^2, s_2^2, r) = \left(\frac{m}{2\sigma_1\sigma_2}\right)^m \frac{(1-\rho^2)^{-m/2}}{\sqrt{\pi}\Gamma(\frac{m}{2})\Gamma(\frac{m-1}{2})}\ (1-r^2)^{(m-3)/2}(s_1s_2)^{m-2}$$

$$\times \exp\left(-\frac{ms_1^2}{2(1-\rho^2)\sigma_1^2} - \frac{ms_2^2}{2(1-\rho^2)\sigma_2^2} + \frac{m\rho r s_1 s_2}{(1-\rho^2)\sigma_1\sigma_2}\right). \quad (1.2)$$

By making the transformation $ms_1{}^2 = \sigma_1{}^2 u,\ ms_2{}^2 = \sigma_2{}^2 v,$ keeping r intact, with Jacobian $J\left(s_1{}^2, s_2{}^2 \to uv\right) = \left(\sigma_1\sigma_2 / m\right)^2$, we have

$$f_{U,V,R}(u,v,r) = \frac{(1-\rho^2)^{-m/2}(u_1u_2)^{(m-2)/2}(1-r^2)^{(m-3)/2}}{2^m\sqrt{\pi}\ \Gamma\left(\frac{m}{2}\right)\Gamma\left(\frac{m-1}{2}\right)}\exp\left(-\frac{u+v}{2(1-\rho^2)} + \frac{\rho r\sqrt{uv}}{1-\rho^2}\right), \quad (1.3)$$

where $u > 0, v > 0, -1 < r < 1, -1 < \rho < 1$ and $m \geq 1$.

The probability density function of correlation coefficient (R) has been derived by Fisher (1915). Recently Provost (2015) has derived a compact expression of the pdf of R which is better than that by Hotelling (1953). Romero-Padilla (2016) has derived moments of R by a Density Identity Technique due to Joarder (2006). El-Houssainy, Fergany and Edrees (2005) have derived raw and centered moments of R that are easy to approximate for large samples compared to others including Ghosh (1966).

Over more than a century hundreds of research papers have been published of which most have dealt with the application of correlation coefficient in almost all branches of science, engineering, medicine, business etc. Some have dealt with the approximation of moments, confidence intervals and tests. Since the availability of computational facilities, particularly the special functions of mathematics in computer packages, it is important to have exact expressions of moments and other characteristics. In this respect, the contribution by Provost (2015) is indeed significant. But usually the details of the proofs of the derivation of moments are not available. We have developed a systematic derivation of joint probability density functions, conditional probability density functions, conditional moments, marginal moments etc. so that the learning of these things becomes enjoyable in the sense that the level of rigor is milder. We believe this paper will fulfil the leap of inference and benefit learners and instructors in learning important mathematical aspects of correlation coefficient.

The probability density function of correlation coefficient conditional on chi-square variables has been derived in Section 3. The conditional moments of correlation coefficient of positive even and odd orders have been derived in Section 4 and Section 5 respectively. The well-known moments of correlation coefficient are also derived from the conditional moments with much ease. The intermediate steps of the derivation seem to be worth recording and will be instructive to learners and instructors. A random decomposition of sample correlation coefficient has been discussed in Section 6. An algorithm has been presented in Section 7 to calculate sample correlation coefficient by using only sample variance.

2. Mathematical Preliminaries

We will also be using the following mathematical results:

$$a_{\{k\}} = a(a+1)\cdots(a+k-1), \quad a_{\{0\}} = 1. \tag{2.1}$$

$$\Gamma(2x)\sqrt{\pi} = 2^{2x-1}\Gamma(x)\Gamma\left(x+\frac{1}{2}\right),\ x \neq 0,-\tfrac{1}{2},-1,-\tfrac{3}{2},.... \tag{2.2}$$

Multiplying both sides of (2.2) by $2x$ we have

$$(2x)!\sqrt{\pi} = 2^{2x}x!\Gamma\left(x+\tfrac{1}{2}\right), \qquad x \neq 0,-\tfrac{1}{2},-1,-\tfrac{3}{2},.... \tag{2.3}$$

Since $(2x+1)! = \Gamma\{2(x+1)\}$, from (2.3), we have

$$(2x+1)!\sqrt{\pi} = 2^{2x}x!\Gamma\left(x+\tfrac{3}{2}\right),\ x \neq 0,-\tfrac{1}{2},-1,-\tfrac{3}{2},.... \tag{2.4}$$

The hypergeometric function ${}_pF_q(a_1,a_2,\cdots,a_p;b_1,b_2,\cdots,b_q;z)$ is defined by

$${}_pF_q(a_1,a_2,\cdots,a_p;b_1,b_2,\cdots,b_q;z) = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(a_1)_{\{k\}}(a_2)_{\{k\}}\cdots(a_p)_{\{k\}}}{(b_1)_{\{k\}}(b_2)_{\{k\}}\cdots(b_q)_{\{k\}}}\frac{z^k}{k!}, \tag{2.5}$$

where $a_{\{k\}}$ is defined in (2.1). See for example Gradshteyn and Ryzhik (1994).

The beta function is defined by

$$B(a,b) = \int_0^1 y^{a-1}(1-y)^{b-1}dy, \tag{2.6}$$

which can be evaluated to be

$$B(a,b) = B(b,a) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}. \tag{2.7}$$

Lemma 2.1 Let $I(a;m) = \int_{-1}^{1} r^{k+a}(1-r^2)^{(m-3)/2}dr$ for any non-negative integer k. Then

$$I(a;m) = \frac{1}{2}[(-1)^{k+a}+1]\,B\left(\frac{k+a+1}{2},\frac{m-1}{2}\right). \tag{2.8}$$

Proof. The integral can be written as

$$I(a;m) = \int_{-1}^{0} r^{k+a}(1-r^2)^{(m-3)/2}dr + \int_0^1 r^{k+a}(1-r^2)^{(m-3)/2}dr.$$

By substituting $r^2 = y$ so that $r = \mp\sqrt{y}$, we have

$$I(a;m)=\int_{-1}^{0}(-\sqrt{y})^{k+a}(1-y)^{(m-3)/2}\frac{-dy}{2\sqrt{y}}+\int_{0}^{1}(\sqrt{y})^{k+a}(1-y)^{(m-3)/2}\frac{dy}{2\sqrt{y}},\ \text{or,}$$

which simplifies to the following:

$$I(a;m)=\frac{1}{2}[(-1)^{k+a}+1]\int_{0}^{1}y^{(k+a-1)/2}(1-y)^{(m-3)/2}dy.$$

Then (2.8) follows by beta integral from (2.7).

3. The Conditional Distributions of Correlation Coefficient

The following theorem has been derived by Fisher (1915). We provide a brief sketch of the proof with modern notations for the broad spectrum of readers.

Theorem A Let U,V and R have a joint pdf given by (1.3). Then the pdf of R is given by

$$f_R(r)=\frac{2^{m-2}(1-\rho^2)^{m/2}(1-r^2)^{(m-3)/2}}{\pi(m-1)!}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}(2\rho r)^k\ \Gamma^2\left(\frac{m+k}{2}\right), \tag{3.1}$$

where $m\geq 1$ and $-1<\rho r<1$.

Proof. By integrating (1.3) over v, we have

$$f_{U,R}(u,r)=\frac{(1-\rho^2)^{-m/2}(u)^{(m-2)/2}(1-r^2)^{(m-3)/2}}{2^m\sqrt{\pi}\ \Gamma\left(\frac{m}{2}\right)\Gamma\left(\frac{m-1}{2}\right)}\exp\left(-\frac{u}{2(1-\rho^2)}\right)I(u),$$

where $I(u)=\int_{0}^{\infty}v^{(m-2)/2}\exp\left(-\frac{v}{2(1-\rho^2)}\right)\exp\left(\frac{\rho r\sqrt{uv}}{1-\rho^2}\right)dv.$

Since $I(u)=2^{m/2}(1-\rho^2)^{m/2}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}\left(\frac{\rho r\sqrt{2u}}{\sqrt{1-\rho^2}}\right)^k\ \Gamma\left(\frac{k+m}{2}\right),$

$$f_{U,R}(u,r)=\frac{u^{(m-2)/2}(1-r^2)^{(m-3)/2}}{2^{m/2}\sqrt{\pi}\ \Gamma\left(\frac{m}{2}\right)\Gamma\left(\frac{m-1}{2}\right)}\exp\left(-\frac{u}{2(1-\rho^2)}\right)\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}\left(\frac{\rho r\sqrt{2u}}{\sqrt{1-\rho^2}}\right)^k\Gamma\left(\frac{k+m}{2}\right). \tag{3.2}$$

By integrating out u, we have

$$f_R(r)=\frac{(1-r^2)^{(m-3)/2}}{2^{m/2}\sqrt{\pi}\ \Gamma\left(\frac{m}{2}\right)\Gamma\left(\frac{m-1}{2}\right)}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}\left(\frac{\rho r\sqrt{2}}{\sqrt{1-\rho^2}}\right)^k \quad \Gamma\left(\frac{k+m}{2}\right)J(k),$$

where $J(k)=\int_0^{\infty}u^{(m+k)/2-1}\exp\left(-\frac{u}{2(1-\rho^2)}\right)du.$

Since $J(k)=\{2(1-\rho^2)\}^{(m+k)/2}\Gamma\left(\frac{m+k}{2}\right)$, by using (2.2) and (2.3), the above pdf simplifies to (3.1).

By using properties of generalized hypergeometric function, Provost (2015) has proved the following expression which is more compact expression than that by Hotelling (1953):

$$f_R(r)=\frac{(m-1)}{2^{m+2}\pi B(m,m+1)}B\left(\frac{m}{2},\frac{m+1}{2}\right)(1-\rho^2)^{m/2}(1-r^2)^{(m-3)/2}\,{}_2F_1\left(m,m;m+\frac{1}{2};\frac{1+\rho r}{2}\right), \quad (3.3)$$

where $m\geq 1,\ -1<r<1,\ -1<\rho<1$ and ${}_2F_1(a_1,a_2;\ b_1;\ z)$ is defined in (2.5).

Theorem 3.1 Let U,V and R have a joint pdf given by (1.3). Then Conditional pdf of R and U given $V=v$ is given by

$$f_{U,R|v}(u,r\,|\,v)=\frac{(1-\rho^2)^{-m/2}u^{(m-2)/2}(1-r^2)^{(m-3)/2}}{2^{m/2}\sqrt{\pi}\ \Gamma\left(\frac{m-1}{2}\right)}\exp\left[-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(u+v\rho^2-\rho r\sqrt{uv}\right)\right], \quad (3.4)$$

where $u>0, v>0, -1<r<1, -1<\rho<1$ and $m\geq 1$.

Proof. The conditional pdf of $(U,R\,|\,V=v)$ is given by

$$f_{R,U|v}(u,r\,|\,v)=\frac{f_{U,V,R}(u,v,r)}{f_V(v)}$$

where $f_{U,V,R}(u,v,r)$ is given by (1.3) and $f_V(v)$ is the pdf of V. Since $V\sim\chi^2_m$, the above simplifies to (3.4).

Theorem 3.3 Let then Conditional pdf of R and U given $V=v$ is given by (3.4). Then the Conditional pdf of R given the chi-square variables $U=u$ and $V=v$ is given by

$$f_{R|u,v}(r\,|\,u,v)=\frac{(1-\rho^2)^{-m/2}}{B\left(\frac{m-1}{2},\frac{1}{2}\right)}\exp\left[-\frac{\rho}{2(1-\rho^2)}\left\{(u+v)\rho-2r\sqrt{uv}\right\}\right](1-r^2)^{(m-3)/2}, \tag{3.5}$$

where $u>0, v>0, -1<r<1, -1<\rho<1$ and $m\geq 1$.

Proof. The conditional pdf of $(R\,|\,U=u, V=v)$ is given by

$$f_{R|u,v}(r\,|\,v,u)=\frac{f_{U,R|v}(u,r\,|\,v)}{f_U(u)}$$

where $f_{U,R|v}(u,r\,|\,v)$ is given by (3.4) and $f_U(u)$ is the pdf of U. Since $U\sim\chi^2_m$, the above then simplifies to (3.5).

Theorem 3.3 Let U and R have a joint pdf given by (3.2). Then Conditional pdf of R given $U=u$ is given by

$$f_{R|u}(r\,|\,u)=\frac{(1-r^2)^{(m-3)/2}}{\sqrt{\pi}\;\Gamma\left(\frac{m-1}{2}\right)}\exp\left(-\frac{u\rho^2}{2(1-\rho^2)}\right)\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}\left(\frac{\rho r\sqrt{2u}}{\sqrt{1-\rho^2}}\right)^k\Gamma\left(\frac{k+m}{2}\right), \tag{3.6}$$

where $u>0, -1<r<1, -1<\rho<1$ and $m\geq 1$.

Proof. By definition, we have

$$f_{R|u}(r\,|\,u)=\frac{f_{U,R}(u,r)}{f_U(u)}$$

where $f_{U,R}(u,r)$ is given by (3.2) and $f_U(u)$ is the pdf of U. Since $U\sim\chi^2_m$, the above simplifies to (3.3).

Theorem 3.4 Let the conditional pdf of R given $U=u$ is given by (3.6). Then conditional pdf of R given $U=u$ is given by (3.1).

Proof. By definition $f_R(r)=E_U\left[f_{R|u}(r\,|\,U)\right]$ where $U\sim\chi^2_m$ where $f_{R|u}(r\,|\,U)$ is given by (3.6). Then

$$f_R(r)=\int_0^{\infty} f_{R|u}(r\,|\,u)f_U(u)du$$

which simplifies to

$$f_R(r)=\frac{2^{m/2-2}(1-r^2)^{(m-3)/2}}{\Gamma(m-1)\pi}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}\left(\frac{\rho r\sqrt{2}}{\sqrt{1-\rho^2}}\right)^k\Gamma\left(\frac{k+m}{2}\right)\int_0^{\infty}u^{(m+k)/2-1}\exp\left(-\frac{u}{2(1-\rho^2)}\right)du,$$

where we have used (2.2). The proof then completes by the evaluation of the gamma integral and a little bit of algebraic simplification.

4. Positive Even Moments of Conditioned Correlation Coefficient

Theorem 4.1 Let the Conditional pdf of R given the chi-square variables $U=u$ and $V=v$ is given by (3.5) and a be a positive number. Then the a-th conditional moment of R given the chi-square variables U and V is given by

$$E(R^a\,|\,u,v)=\frac{\Gamma(m/2)(1-\rho^2)^{-m/2}}{2\sqrt{\pi}}\exp\left(-\frac{(u+v)\rho^2}{2(1-\rho^2)}\right)$$
$$\times\sum_{k=0}^{\infty}[(-1)^{k+a}+1]\frac{1}{k!}\left(\frac{\rho\sqrt{uv}}{1-\rho^2}\right)^k\frac{\Gamma\left(\frac{k+a+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{k+a+m}{2}\right)}. \tag{4.1}$$

where $u>0, v>0, -1<r<1, -1<\rho<1$ and $m\geq 1$.

Proof. By definition, it follows from (3.5) that

$$E(R^a\,|\,u,v)=\int_{-1}^{1}r^a f_{R|v,u}(r\,|\,v,u)dr,$$

which can be expressed as the following:

$$E(R^a\,|\,v,u)=\frac{\Gamma(m/2)(1-\rho^2)^{-m/2}}{\sqrt{\pi}\;\Gamma\left(\frac{m-1}{2}\right)}\exp\left(-\frac{u\rho^2}{2(1-\rho^2)}\right)\exp\left(-\frac{v\rho^2}{2(1-\rho^2)}\right)$$
$$\times\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}\left(\frac{\rho\sqrt{uv}}{1-\rho^2}\right)^k I(a;m),$$

where $I(a;m)=\int_{-1}^{1}r^{k+a}(1-r^2)^{(m-3)/2}dr$ is defined in Lemma 2.1. The proof is then completed by algebraic simplifications.

Theorem 4.2 Let the conditional pdf of R given the chi-square variables $U=u$ and $V=v$ be given by (3.5) and a be a positive even number. Then the a-th conditional even moment of R given the chi-square variables U and V is given by

$$E(R^a \mid v,u) = \frac{\Gamma(m/2)}{(1-\rho^2)^{m/2}} \exp\left(-\frac{(u+v)\rho^2}{2(1-\rho^2)}\right) {}_1F_2\left(\frac{a+1}{2}; \frac{a+m}{2}, \frac{1}{2}; \frac{\rho^2 uv}{4(1-\rho^2)^2}\right), \tag{4.2}$$

where $u>0, v>0, -1<r<1, -1<\rho<1, m\geq 1$ and ${}_1F_2(a_1;\ b_1, b_2;\ z)$ is defined in (2.5).

Proof. By definition,

$$E(R^a \mid v,u) = \int_{-1}^{1} r^a f_{R|u.v}(r \mid u,v)dr$$

where $f_{R|u.v}(r \mid u,v)$ is given by (3.5).

Let a be an even number. Then we split the resulting generalized hypergeometric series into two, one with $k=2j$ and another $k=2j+1$ where $j=0,1,2,...$ so that the set

$$\{k : k=0,1,2,3,4,...\} = \{k : k=0,2,4,....\} \cup \{k : k=1,3,5,....\}$$

is rewritten as

$$\{k : k=0,1,2,3,4,...\} = \{2j : j=0,1,2,3,4,.....\} \cup \{2j+1 : j=0,1,2,3,4,.....\}.$$

Then $(-1)^{k+a}+1 = (-1)^{2j+a}+1 = 2$ and $(-1)^{k+a}+1 = (-1)^{2j+1+a}+1 = 0$

$$E(R^a \mid v,u) = \frac{\Gamma(m/2)(1-\rho^2)^{-m/2}}{2\sqrt{\pi}} \exp\left(-\frac{(u+v)\rho^2}{2(1-\rho^2)}\right)$$

$$\times \left[\sum_{j=0}^{\infty} [(-1)^{2j+a}+1] \frac{1}{(2j)!} \left(\frac{\rho\sqrt{uv}}{1-\rho^2}\right)^{2j} \frac{\Gamma\left(\frac{2j+a+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{2j+a+m}{2}\right)} \right.$$

$$\left. + \sum_{k=0}^{\infty} [(-1)^{2j+1+a}+1] \frac{1}{(2j+1)!} \left(\frac{\rho\sqrt{uv}}{1-\rho^2}\right)^{2j+1} \frac{\Gamma\left(\frac{2j+1+a+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{2j+1+a+m}{2}\right)} \right].$$

so that by (3.5), we have

If a is even, then $2j+1+a$ will be odd, so that $(-1)^{2j+1+a}=-1$, and hence $(-1)^{2j+1+a}+1=-1+1=0$. Then we have

$$E(R^a\,|\,v,u)=\frac{\Gamma(m/2)(1-\rho^2)^{-m/2}}{2\sqrt{\pi}}\exp\left(-\frac{(u+v)\rho^2}{2(1-\rho^2)}\right)$$
$$\times\left[\sum_{j=0}^{\infty}2\times\frac{1}{(2j)!}\left(\frac{\rho\sqrt{uv}}{1-\rho^2}\right)^{2j}\frac{\Gamma\left(\frac{2j+a+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{2j+a+m}{2}\right)}+0\right]$$

which simplifies to the following:

$$E(R^a\,|\,v,u)=\frac{\Gamma(m/2)(1-\rho^2)^{-m/2}}{\sqrt{\pi}}\exp\left(-\frac{(u+v)\rho^2}{2(1-\rho^2)}\right)\sum_{j=0}^{\infty}\frac{1}{(2j)!}\left(\frac{\rho\sqrt{uv}}{1-\rho^2}\right)^{2j}\frac{\Gamma\left(\frac{2j+a+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{2j+a+m}{2}\right)}.$$

By using (2.3), (2.4) and (2.5), we have (4.2).

Theorem 4.3 Let U,V and R have a joint pdf given by (1.3). Also let a be a positive even number. Then the a-th conditional moment of R given the chi-square variable $U=u$ is given by

$$E(R^a\,|\,u)=\frac{\Gamma\left(\frac{a+1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)}{\sqrt{\pi}\,\Gamma\left(\frac{a+m}{2}\right)}\exp\left(-\frac{u\rho^2}{2(1-\rho^2)}\right){}_2F_2\left(\frac{a+1}{2},\frac{m}{2};\frac{a+m}{2},\frac{1}{2};\frac{\rho^2u}{2(1-\rho^2)}\right),\qquad(4.3)$$

$u>0, v>0, -1<r<1, -1<\rho<1,\ m\geq 1$ and ${}_2F_2(a_1,a_2;\ b_1,b_2;\ z)$ is defined in (2.5).

Proof. By definition, we have

$$E(R^a\,|\,u)=\int_{-1}^{1}r^a\,f_{R|u}(r\,|\,u)dr.$$

where $f_{R|u}(r\,|\,u)$ is given by (3.6). Then by (2.5) and some algebraic simplifications, we have (4.3).

Theorem 4.4 Let a be positive even number and the a-th conditional moment of R given the chi-square variable $U = u$ is given by (4.3). Then the a-th moment of R is given by

$$E(R^a) = \frac{(1-\rho^2)^{m/2}}{\sqrt{\pi}} \frac{\Gamma\left(\frac{a+1}{2}\right)\Gamma^2\left(\frac{m}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{a+m}{2}\right)} {}_3F_2\left(\frac{a+1}{2}, \frac{m}{2}, \frac{m}{2}; \frac{a+m}{2}, \frac{1}{2}; \frac{\rho^2}{1+\rho^2}\right), \quad (4.4)$$

where $-1 < r < 1, -1 < \rho < 1,\ m \geq 1$ and ${}_3F_2(a_1, a_2, a_3;\ b_1, b_2;\ z)$ is defined in (2.5).

Proof. By definition, $E(R^a) = E_U\left[E(R^a \mid U)\right]$ where $U \sim \chi^2_m$. Then (4.4) follows from (4.3) by virtue of (2.5).

The above moment is the equation (20) of Provost (2015) and equation (15) of Romero-Padillo (2016). Provost has proved that the above moment takes much less time than the moment available in Anderson (1984).

The second raw moments of the correlation coefficient R is given by

$$E(R^2) = \frac{(1-\rho^2)^{m/2}}{m} {}_3F_2\left(\frac{m}{2}, \frac{m}{2}, \frac{3}{2}; \frac{m}{2}+1, \frac{1}{2}; \frac{\rho^2}{1+\rho^2}\right), \quad (4.5)$$

where $-1 < \rho < 1,\ m \geq 1$ and ${}_3F_2(a_1, a_2, a_3;\ b_1, b_2;\ z)$ is defined in (2.5). The above moment matches with expression (18) of Romero-Padilla (2016). The fourth raw moment of R is given by

$$E(R^4) = \frac{3(1-\rho^2)^{m/2}}{m(m+2)} {}_3F_2\left(\frac{m}{2}, \frac{m}{2}, \frac{5}{2}; \frac{m}{2}+2, \frac{1}{2}; \frac{\rho^2}{1+\rho^2}\right), \quad (4.6)$$

where $-1 < \rho < 1,\ m \geq 1$ and ${}_3F_2(a_1, a_2, a_3;\ b_1, b_2;\ z)$ is defined in (2.5).

There are two forms of $E(R^4)$ in expression (20) of Roemro-Paddilla (2016). The first one matches with the above expression in (4.6) but there is an additional 2 in the denominator of the second form.

5. Positive Odd Moments of Conditioned Correlation Coefficient

Theorem 5.1 Let pdf of R given the chi-square variables $U = u$ and $V = v$ be given by (3.5). Also let a be a positive odd number. Then the a-th conditional odd moment of

R given U and V is given by

$$E(R^a \mid v,u) = \frac{2\Gamma(m/2)\rho}{\sqrt{\pi}(1-\rho^2)^{(m+2)/2}} \frac{\Gamma\left(\frac{a}{2}+1\right)}{\Gamma\left(\frac{m+a+1}{2}\right)} \sqrt{uv}\ \exp\left(-\frac{(u+v)\rho^2}{2(1-\rho^2)}\right) \times {}_2F_1\left(\frac{a}{2}+1, \frac{m+a+1}{2};\ \frac{3}{2};\ \frac{\rho\sqrt{uv}}{2(1-\rho^2)}\right), \tag{5.1}$$

where $u>0, v>0, -1<r<1, -1<\rho<1, m\geq 1$ and ${}_2F_1(a_1,a_2;\ b_1;\ z)$ is defined in (2.5).

Proof. By definition,

$$E(R^a \mid v,u) = \int_{-1}^{1} r^a f_{R|u.v}(r \mid u,v)dr$$

where $f_{R|u.v}(r \mid u,v)$ is given by (3.5).

Let a be an odd number. Then we split the resulting generalized hypergeometric series into two, one with $k=2j$ and another $k=2j+1$ where $j=0,1,2,...$ so that the set

$\{k: k=0,1,2,3,4,...\} = \{k: k=0,2,4,....\} \cup \{k: k=1,3,5,....\}$ is rewritten as

$\{k: k=0,1,2,3,4,...\} = \{2j: j=0,1,2,3,4,.....\} \cup \{2j+1: j=0,1,2,3,4,.....\}$.

Then $(-1)^{k+a}+1 = (-1)^{2j+a}+1 = 0$ and $(-1)^{k+a}+1 = (-1)^{2j+1+a}+1 = 2$ so that from (3.5), we have

$$E(R^a \mid v,u) = \frac{\Gamma(m/2)(1-\rho^2)^{-m/2}}{2\sqrt{\pi}} \exp\left(-\frac{(u+v)\rho^2}{2(1-\rho^2)}\right) \times \left[\sum_{j=0}^{\infty}[(-1)^{2j+a}+1]\frac{1}{(2j)!}\left(\frac{\rho\sqrt{uv}}{1-\rho^2}\right)^{2j} \frac{\Gamma\left(\frac{2j+a+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{2j+a+m}{2}\right)} + \sum_{j=0}^{\infty}[(-1)^{2j+1+a}+1]\frac{1}{(2j+1)!}\left(\frac{\rho\sqrt{uv}}{1-\rho^2}\right)^{2j+1} \frac{\Gamma\left(\frac{2j+1+a+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{2j+1+a+m}{2}\right)}\right].$$

The above simplifies to the following:

$$E(R^a \mid v,u) = \frac{\Gamma(m/2)(1-\rho^2)^{-m/2}}{2\sqrt{\pi}} \exp\left(-\frac{(u+v)\rho^2}{2(1-\rho^2)}\right) \times \left[0 + \sum_{j=0}^{\infty}(2)\frac{1}{(2j+1)!}\left(\frac{\rho\sqrt{uv}}{1-\rho^2}\right)^{2j+1} \frac{\Gamma\left(\frac{2j+1+a+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{2j+1+a+m}{2}\right)}\right].$$

Simplifying the factorial notations in the above expression by (2.3) and (2.4), and then using (2.5) with some algebraic simplifications, we have (5.1).

Theorem 5.2 Let the pdf of R given U be given by (3.6) and a be a positive odd number. Then the a-th conditional odd moment of R given the chi-square variable U is given by

$$E(R^a \mid u) = \frac{2\sqrt{2}\ \rho\sqrt{u}}{\sqrt{\pi(1-\rho^2)}} \exp\left(-\frac{u\rho^2}{2(1-\rho^2)}\right) \frac{\Gamma\left(\frac{a}{2}+1\right)\Gamma\left(\frac{m+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{m+a+1}{2}\right)} \times {}_2F_2\left(\frac{a+2}{2}, \frac{m+1}{2}; \frac{m+a+1}{2}, \frac{3}{2}; \frac{\rho^2 u}{2(1-\rho^2)}\right), \quad (5.2)$$

where $u > 0, -1 < r < 1, -1 < \rho < 1,\ m \geq 1$ and ${}_2F_2(a_1, a_2;\ b_1, b_2;\ z)$ is defined in (2.5).

Proof. By definition

$$E(R^a \mid u) = \int_{-1}^{1} r^a f_{R|u}(r \mid u)\, dr$$

where $f_{R|u}(r \mid u)$ is given by (3.6). By using (2.7), it follows that the above moment is given by (5.2).

Theorem 5.3 Let $E(R^a \mid u)$ be given by (5.2) where a is a positive odd number and U is a chi-square variable with m degrees of freedom. Then the a-th moment of R is given by

$$E(R^a) = \frac{2\rho(1-\rho^2)^{m/2}}{\Gamma(m/2)\sqrt{\pi}} \frac{\Gamma\left(\frac{a}{2}+1\right)\Gamma^2\left(\frac{m+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{m+a+1}{2}\right)} {}_3F_2\left(\frac{a}{2}+1, \frac{m+1}{2}, \frac{m+1}{2}; \frac{m+a+1}{2}, \frac{3}{2}; \rho^2\right), \quad (5.3)$$

where $-1<\rho<1$, $m\geq 1$ and ${}_3F_2(a_1,a_2,a_3;\ b_1,b_2;\ z)$ is defined in (2.5).

Proof. By definition $E(R^a)=E_U\left[E(R^a\,|\,U)\right]$. Since $U\sim\chi^2_m$, it follows from (5.2) that $E(R^a)$ is given by (5.3).

The above moment is the equation (19) of Provost (2015) and equation (16) of Romero-Padillo (2016). Provost has proved that the above moment takes much less time than the moment available in Anderson (1984). The first raw moment of R is given below:

$$E(R)=\frac{2\rho(1-\rho^2)^{m/2}}{m\Gamma^2(m/2)}\Gamma^2\left(\frac{m+1}{2}\right){}_3F_2\left(\frac{m+1}{2},\frac{m+1}{2},\frac{3}{2};\frac{m}{2}+1,\frac{3}{2};\rho^2\right), \tag{5.4}$$

where $-1<\rho<1$, $m\geq 1$ and ${}_3F_2(a_1,a_2,a_3;\ b_1,b_2;\ z)$ is defined in (2.5). There are 3 forms of $E(R)$ in the expression (17) of Romero-Padilla (2016). The first one matches with the above expression in (5.4). The last two expressions have typographical errors. The third raw moment of R is given by

$$E(R^3)=\frac{6\,\Gamma^2\left(\frac{m+1}{2}\right)\rho(1-\rho^2)^{m/2}}{m(m+2)\,\Gamma^2(m/2)}\ {}_3F_2\left(\frac{m+1}{2},\frac{m+1}{2},\frac{5}{2};\ \frac{m}{2}+2,\frac{3}{2};\ \rho^2\right), \tag{5.5}$$

where $-1<\rho<1$, $m\geq 1$ and ${}_3F_2(a_1,a_2,a_3;\ b_1,b_2;\ z)$ is defined in (2.5). The moment $E(R^3)$ appearing at (19) of Romero-Padilla (2016) have two expressions; the first one matches with the above expression in (5.5). The second one has typographical errors.

6. A Random Decomposition of Sample Correlation Coefficient

We present here a random decomposition of sample correlation coefficient.

Theorem 6.1 Let $Z_1\sim\chi^2_m$ and $Z_2\sim\chi^2_m$ be statistically independent but $U_1=\frac{mS_1^2}{\sigma_1^2}\sim\chi^2_m$ and $V_2=\frac{mS_2^2}{\sigma_2^2}\sim\chi^2_m$ are statistically dependent. Then the sample correlation coefficient has the following random decomposition:

$$R=\frac{m(1+\rho)Z_1}{2\sqrt{U_1V_2}}-\frac{m(1-\rho)Z_2}{2\sqrt{U_1V_2}} \tag{6.1}$$

where $-1<\rho<1$ and $m\geq 1$.

Proof. The random sample covariance $S_{1,2}$ has the following representations:

$$S_{1,2} = \frac{1}{2}\left[(1+\rho)Z_1 - (1-\rho)Z_2\right]\sigma_1\sigma_2,$$

where $\sigma_1 > 0$ and $\sigma_2 > 0$. See for example, page 600 of Johnson, Kotz and Balakrishnan (1995). We also have

$$S_1 = \sqrt{U_1}\ \frac{\sigma_1}{\sqrt{m}} \text{ where } U_1 = \frac{mS_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi_m^2 \text{ and } S_2 = \sqrt{V_2}\ \frac{\sigma_2}{\sqrt{m}} \text{ where } V_2 = \frac{mS_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi_m^2.$$

Then we have

$$R = \frac{S_{1,2}}{S_1 S_2} = \frac{(1+\rho)Z_1\sigma_1\sigma_2/2}{\sqrt{U_1}\ \frac{\sigma_1}{\sqrt{m}}\sqrt{V_1}\ \frac{\sigma_2}{\sqrt{m}}} - \frac{(1-\rho)Z_2\sigma_1\sigma_2/2}{\sqrt{U_1}\ \frac{\sigma_1}{\sqrt{m}}\sqrt{V_1}\ \frac{\sigma_2}{\sqrt{m}}},$$

which simplifies to (6.1).

7. An Algorithm for Numerical Calculation of Correlation Coefficient

Based on a sample of two variables

x	x_1	x_2	...	x_n
y	y_1	y_2	...	y_n

we present the following algorithm to calculate sample correlation coefficient:

STEP 1 Prepare the following table:

$x-a$	x_1-a	x_2-a	...	x_n-a
$y-b$	y_1-b	y_2-b	...	y_n-b
$x+y=w$	w_1	w_2	...	w_n
$w-c$	w_1-c	w_2-c	...	w_n-c

where $\min(x) = a,\ \min(y) = b,\ x+y = w,\ \min(w) = c,$

If the sample size is more than 10, the above table may be arranged in four columns.

STEP 2 Calculate Variances

We may ignore the third row while calculating variance. Store the transformed data of the first, second and the fourth row in the calculator sequentially, and calculate variance every time. These would be s_1^2, s_2^2 and s_w^2 respectively as tabulated in the following

table:

Transformed Data	Variance
$x-a$	s_1^2
$y-b$	s_2^2
$w-c$	s_w^2

The reason of transformation of data is to reduce the size of each observation of a variable. This does not change the sample variance as it does not depend on the origin. For example the variables x and $x-a$ have the same sample variance.

STEP 3: Calculate Sample Covariance

$$s_{1,2} = \frac{1}{2}(s_w^2 - s_1^2 - s_2^2).$$

STEP 4: Calculate Correlation Coefficient

$$r = \frac{s_{1,2}}{s_1 s_2}.$$

8. Conclusion

We have tried to present the rigorous mathematical aspects of correlation coefficient in a milder way by introducing conditionality principle both in deriving pdf and moments. We believe this will motivate, benefit and encourage learners and instructors to embark research in the area.

References

Anderson, T.W. (1984). An Introduction to Multivariate Statistical Analysis; Wiley: New York, NY, USA.

El-Houssainy, A.R.; Fergany, H.A. and Edrees, A.M. (2005). An easy was to calculate the moments of sample correlation coefficient. *Communications Faculty Sciences University Ankara,* Series A1, 54(1), 21-28.

Fisher, R.A. (1915). Frequency distribution of the values of the correlation coefficient in samples from an indefinitely large population. *Biometrika*, 10, 507-521.

Ghosh, B.K. (1966). Asymptotic expansions for the moments of the distribution of correlation

coefficient. *Biometrika*, 53, 258-262.

Gradshteyn, I.S. and Ryzhik, I.M. (1994). *Table of Integrals, Series and Products*, Academic Press.

Hotelling, H. (1953). New light on the correlation coefficient and its transforms. *Journal of Royal Statistical Society,* Series B, 15, 193-232.

Joarder, A.H. (2006). Product moments of a bivariate Wishart distribution. *Journal of Probability and Statistical Science*, 4(2), 233 - 244.

Johnson, Kotz and Balakrishnan (1995). *Continuous Uuniivariate Distributions, v2,* John Wiley and sons, New York

Provost, S.B. (2015). Closed-form representations of the density function and integer moments of the sample correlation coefficient. *Axioms*, 4, 268-274.

Rodgers, J.L. and Nicewander, W.A. (1988). Thirteen ways to look at correlation coefficient. *American Statistician*, 42(1), 59-66.

Romero-Padilla, J. (2016). Product Moments of Sample Variances and Correlation for Variables with Bivariate Normal Distribution. *Journal of Mathematics and Statistics*, 12(1), 12–22.

Stigler, S.M. (1989). Francis Galton's account of the invention of correlation. *Statistical Science*, 4(2), 73-86.

BL College Journal
https://doi.org/10.62106/blc2024v6i1e2
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -VI, Issue-I, June 2024
Pp. 128-141

Human-Nature Connection: Eco-ethical Reading of Louise Gluck's *The Wild Iris*

Toya Nath Upadhyay

Janak Paudyal

Toya Nath Upadhyay
Central Department of English, TU, Nepal
e-mail : Toya771@gmail.com

Janak Paudyal
Ratna Rajyalaxmi Campus
TU, Nepal
e-mail : janakpaudel.2@gmail.com

Abstract

Relationship connotes a power relation of one reaping the benefits at the expense of the other; where connection demands mutual respect and benefits on both sides. In a transactional and utilitarian view, nature has been conceptualized as a source on which humanity consumes. However, ecofeminists believe that there is another way possible that offers mutual coexistence and respect. This brings us to understand nature is neither a source nor only a victim; it is an entity that deserves ethical behavior from human beings. This paper finds a sense of such ethicality in Louise Gluck's poetry collection 'The Wild Iris' (1992) where her use of images reinvents human-nature connectivity through humanity's realization of its mortality and the natural world's infinite spiritual renewal and potential for regeneration. Reading her poetry from an ecofeminism perspective by applying the insights of Val Plumwood, this paper claims that environmental ethics is a profit-loss calculation, thus representing humanity's relationship to nature, where eco-ethical reading demands subtle ways of forging interconnection between humans and nature.

Keywords

Relationship, Connection, Ecofeminism, Eco-ethical

Introduction

Louis Gluck's poetry, *The Wild Iris* (1992), explores identity, solitude, and introspection within humanity and its existential anxiety. Through a critique of human hubris and proclivity to the destruction of nature, Gluck engages with the theme of interconnectedness between the natural environment and human beings as an antidote to correct it. As ecofeminism "asserts the fundamental interconnectedness of all life" Gluck's ecofeminist text seeks a mutual connection between humans and all the living organisms (Gaard 2). While reading Gluck's poetry from the perspective of ecofeminism, this paper finds that the poet stresses that the pleasing relationships between humans and non-humans do not operate on the binary basis of self and other but rather on the solid foundation of connection and mutuality. The political reading of Gluck's poems may reveal that relationship will mean transactional give and take between nature and humans whereas connectedness will mean a more equitable and ethical relation between these two organisms: human and nature resulting in mutual respect and coexistence. This paper argues that nature and humans enjoy a happy, balanced, and sustainable life not by maintaining a relationship but by forging an interconnection between them. The paper is a qualitative and interpretative text-based research, and it uses the theoretical insights of ecofeminist critic Val Plumwood who advocates for the "ethical responsibility" of humans in forging interconnectedness between humans and nature.

Gluck's poetry has appealed to critics from across the fields representing diverse, often opposed communities of interpretations. While awarding the Nobel Prize in 2020, the judges remarked that Gluck has an "unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal." Indeed, her voice expresses the hope and promise of the regeneration of all humans. This theme of universality represents a unique voice in contemporary poetry. Ira Sadoff traces the version of Romanticism in Gluck's poetry, especially the versions of Keats and Dickinson. She notes, "Gluck's particular versions of the Romantic sublime pursues both the Keatsian ecstasy of the heightened moment and Dickinson's darker, more annihilating flight from the material world" (82). William V. Davis on the other hand observes the implied vision of apocalypticism in Gluck's poetry. He points out a debate between the divine and the human character. In the discussion, there is no possibility of any resurrection beyond the human realm. He notes, "The dominant dialogue, however, is carried on

between the divine and human protagonist/antagonist . . . . The 'debate' alone centers on the impossibility of any resurrection beyond the human, earthly realm—as in a garden" (48). Different from all the above critics, Brian Glasser interprets that Gluck's The Wild Iris constructs/implies readers who are mentally depressed. Glasser states, "[Her poems] demonstrate the way a depressed implied reader leads the speaker of the poems to a moment of transformation" (201). According to Glasser, this depressed implied reader in turn leads the speaker of the poems towards transformation.

Daniel Morris highlights the myriad of Gluck's thematic treatment stressing that her poetry offers the readers an opportunity to enjoy a range of thematic uses of the "persona poem to blunt confessionalism" (1). Morris calls it a "heteroglossic text" for carrying multiple themes such as spirituality, love, creativity, loss, death, nature, and so on (191). Morris depicts that the source of her themes, characters, and motifs comes from the "Biblical creation myths" (4). However, her purpose is not religious; it is spiritual. The myth comes to articulate and manifest the pain of consciousness that stems from the experiences of pain and suffering which she assigns to different speakers in her poems. Another feature of her poetry is the celebration of motherhood as a never-ending source of regeneration. The recurring maternal figure, in her poetry, is either imagined as a flower, rescuer, or goddess. In certain instances, they appear indifferent to the loss of children such as in 'The Drowned Children' or else are represented as the source of the children's suffocation such as in The Triumph of Achilles (1985). Morris further explains that *The Wild Iris* recalls "the nature lyrics from The House on Marshland" but displaces the monologue perspective of the traditional lyric form" (7). Gluck employs three kinds of voices: of the flowers, of nature, representing god, and of the author.

This way, different critics have read Gluck's poetry from dissimilar perspectives, but human-nature interconnection is yet to be done. Although Morris has touched upon the voice of nature, his research does not focus much on human-nature mutuality. Thus this article attempts to do that.

An Ethical Connection between Humans and Nature

As said above, Gluck's poetry engages three speakers. The third one is an authorial persona, the poet or a commentator on the things around. In fourteen flower poems,

flowers "speak to" the poet, about their situation, aspirations, and desires.

The second speaker speaks about the anxiety of a creator. It may be a poet-gardener expressing anxieties, or despair, it often criticizes the poet too. What the flower says may be considered an externalization of the poet's mood, attitude, misgiving, or concern in which the voice of divinity critiques the speaker—and humanity in general—for the frivolous nature of human endeavors, as well as for the unreasonable desire for immortality or rebirth.

Gluck uses a dual strategy in *The Wild Iris*: first, her speakers are the objects from the natural world and her subject matter is domesticity. It appears that her speakers are the natural version of human beings. By blending the outer world of nature with domesticity, she proposes a renewed connection between humans and nature that rejects the transactional relationship: human beings are the primary benefactor of the natural world even at the latter's expense. Her verse reverses this relationship and emphasizes the interconnectedness.

A renewed connection appears when the third speaker criticizes humans for their avarice, hubris, and self-centeredness. Gluck uses different personas to establish a new connection between humans and nature: the bond appears like a tendon between the creator and creation, man and nature, and artist and art. In the title poem, *The Wild Iris* and other poems—Trillium", "Lamium" or "Snowdrop"—Gluck employs a flower as a speaker. In other poems like "Scillia," "The Hawthorn Tree" and "Ipomea", the speaker is a tree, bush, or grass. Gluck equates the human and natural world as subjective entities: nature and humans have their existential concerns; pain and problems. Moreover, these poems are about nature and God; creator and creation as observed from a domestic location. Moreover, Gluck talks about her love for domestic life, in her acceptance speech of the Nobel Prize: "Always domestic life soothed me and teaching excited me, unnerved me. Always I liked the day to end among people."

In *Snowdrops* a seed buried underground all along the winter is a speaker and it asks a rhetorical question: "Do you know what I was, how I lived?" (1). The speaker's world is excluded, John Hutton Landis states, "with a strenuous sense of exclusion" (141). The persona becomes an excluded self and her role becomes a routine issue and message of survival. The speaker dissociates herself from the surroundings, where

spring is in full bloom and the speaker remembers: "I did not expect to survive" because the "earth [was] suppressing me" 4-5). The plight of the seed appears so painful that it "didn't expect / to waken again, to feel / in damp earth /. . . [and] respond again" (5-8). This desire to respond again is, in Val Plumwood's terms, "the treatment of nature in . . . ethical terms" (2). Plumwood emphasizes that "Western culture has treated the human/ nature relation as a dualism." This ethical dilemma, she argues, "explains many of the problematic features of the West's treatment of nature which underlie the environmental crisis, especially the Western construction of human identity outside nature" (2). Gluck uses her poetry to resonate with Plumwood's insights. In her poetry, this dualism runs deep.

The inner and the external worlds are described in opposite imagery; the resolution of the opposite will be the goal to achieve. The visual beauty of the surroundings comes as a direct contrast to her inner self which is dark and sad. The external world of freedom and joy is contrasted with the world of domesticity by employing the images of the inner and outer world. The inner world is dark and psychological where the outer world is brighter and vivid. The inner one is the human world, and the outer world is the world of nature.

One of the attributes in Gluck's poetry has been the depiction of nature as a subjective entity. However, "to be defined as 'nature' . . . is to be defined as passive," argues Plumwood for it is understood as "non-agent and non-subject" (4). However, in Gluk's poetry, nature is a speaking subject, it has a voice: the seed and the flowers speak their voice. To do that, she uses myths and stories of creation, and her speakers speak in hymns and songs. In one of the poems, "Martins," the speaker addresses the creator:

You want to know how I spend my time?

> I walk the front lawn, pretending
> to be weeding. You ought to know
> I'm never weeding, on my knee, pulling
> clumps of clover from the flower beds. (1-5).

The clover weed just does not accept that it is a thing to be dismissed as 'weed'; it has a larger significance in the whole structure of changing seasons where "sick trees" go first "turning brilliant yellow" yet the clover remains there. Gluck wants to check

this fragility and she "subjects herself to adversarial power regimes and a repetition of flight, ironic defense, denial, and prohibition" (Sadoff 87). "Snowdrops", another poem, captures this selfless sense through rhetorical question: "Do you know what I was, how I lived? / You know what despair is; then / Winter should have meaning for you" (1-3). Thus, the world of nature is not just passive and mute.

Human's world and nature's world are different. By rendering "a mode of existence completely different from human" Gluck creates a world of two existences. The other existence is the floral world, it has so much to teach to humanity. At least, it can teach the difference between the world of creators and protectors. A mother as the seed in "Snowdrops" can go to any length of pain to give birth. The world of plants is blue. In this poetic image, Gluck is silently asserting the value of the creator. Through the flower speaker, the poet in "Jacob's Ladder" talks about human problems:

> Trapped in the earth, wouldn't you too want to go
> to heaven? I live
> in a lady's garden. Forgive me, lady;
> longing has taken my grace. (1-5)

The poet creates a contrast between garden and heaven; or more precisely between earth and heaven, and by implication between the human world and the world of nature. The images of earth and heaven are images of domesticity and outer world.

> I too desire
> knowledge of paradise—and now
> your grief, a naked stem
> reaching the porch window. (8-12).

The single flowering plant, Jacob's ladder's desire to reach out to the porch manifests the yearning to move out of the world of the human world and enjoy the "knowledge of paradise". Similarly, at the poem's end, the speaker addresses with sympathy that their tears are the tears of yearning. The speaker's open question "Wouldn't you too want to go to heaven?" (2) is more a request, or an exclamation of despair than a question. As Ira Sadoff argues, Gluck presents speakers "trapped by cultural roles and feeling of powerlessness" and she "relies on myth to reverse time, to comfort, and to stabilize a conflict" (87). The speaker in the poem "Clear Morning" shows culturally trapped

women, and she muses on:

> I've submitted to your preferences, observing patiently
> the things you love, speaking
> through vehicles only, in
> details of earth, as you prefer,
> tendrils of blue clematis, light
> of early evening—
> you would never accept
> a voice like mine, indifferent
> to the objects you busily name. (3-12)

Piotr Zazula argues that Gluck's lyrics are dedicated to God, the creator. She puts her words as: "The speaker is tired of communicating with people in the only language they can understand—the ones of signs. Too busy with naming material objects as they appear before them, human beings are unable to embrace God's grace" (172). However, the poem aims at the world of men and their desire for a submissive world. The speaker protests: "I've submitted to your preferences" (3) and despite such a dutiful act, the men have taken:

> "it is your right
> to dispute my meanings:
> I am prepared to force
> clarity upon you" (23-26).

The clear message is: it is enough now. And now is the time to "force clarity" upon you. The idea of forcing clarity demands the equal right. Since the speaker had submitted herself and despite that, the other has "cast it aside/. . . thinking matter could not absorb your gaze" (17-18). She has realized it is time to speak up against the world of discriminatory patriarchy.

The natural world becomes a site where death and decay work as a transformative and regenerative power. In the poem, "End of Winter" the anticipation is so high: "Over the still world, a bird calls/waking solitary among the black boughs" and the promise has been delivered: "You wanted to be born; I let you be born" (1-3). The creator is addressing the seed and his promise which he has fulfilled by letting it be born makes

a perfect ideal world where "all sound that means good-bye, good-bye// [is] the one continuous line/that binds us to each other" (21-23). In the poem "Clear Morning" the speaker, the creator speaks in clear language about the ways nature goes:

> And all this time
> I indulged your limitation, thinking
> you would cast it aside yourselves sooner or later,
> thinking matter could not absorb your gaze forever—
> obstacles of the clematis painting
> blue flowers on the porch window—
> I cannot go on
> restricting myself to images. (15-22)

Perhaps it is Gluck's way of depicting the human world with all its limitations. Yet it has hubris of superiority. Thus, the creator who appears to be talking to the butter-cup flowers, directly aims for the human world.

In "Retreating Wind," the speaker takes the role of divine voice that rebukes the human speaker for what He considers their unreasonable demand, their avarice for "the one gift / reserved for another creation" (13-14). The duality of the world—reserved for the other creation—is enough to talk about the human and nonhuman world. The speaker is too furious over the ever-increasing human avarice: "When I made you, I loved you. / Now I pity you" (1-2). The chiding goes on:

> I gave you every gift,
> Blue of the spring morning,
> time you didn't know how to use—
> you wanted more, the one gift
> reserved for another creation. (10-14)

The speaker's dialogue with the divine force— that speaks as a wind—is especially "prominent in her desire to set herself free from a domineering Jewish God, but only by invoking His covering powers, only by revealing her dependence on God as the object of her desires for recognition and rebirth through the apostrophic addresses to the "You," or "Dear Father" (Morris 189). The position the speaker creates is that of a creator Himself. The mother with the power of a garden is a creator. She replaces God's

providence with mothers. The division and reservation of gifts for one or the other vexes the speaker. She even does not realize that she is the other, for whom there are different kinds of gifts, and for others the gifts are different.

With the device of personification, Gluck grants a voice to a flower. Now the flower has a consciousness and feeling in it and displays an emotional range that includes the wish for transcendence—as well as an awareness of the gardener's paradoxical urge both to experience human love and to transcend her body. The use of this device suggests how freely Glück mixes immanent and transcendent conceptions of divinity. The flower's namesake recalls the ladder, with angels trafficking both up and down its rungs which evokes mythical undertones.

Other poems with flower speakers, such as "Scilla", mock the poet-gardener for fantasizing about an exclusive relationship with a personal God. The flowers believe that nature is all of the holiness, and that claim to uniqueness suggess the sin of pride:

> Not I, you idiot, not self, but we, we—waves
> of sky blue like
> a critique of heaven: why
> do you treasure your voice
> when to be one thing
> is to be next to nothing?
> Why do you look up? To hear
> an echo like the voice
> of god? You are all the same to us
> solitary, standing about us, planning
> your silly lives: you go
> where you are sent, like all these things,
> where the wind plants you,
> once or another of you forever
> looking down and seeing some image
> of water, and hearing what? Waves,
> and over waves, birds singing. (1-17)

One of fourteen flower-speakers that appear throughout the volume, as if the wind

scattered them into various positions, Scilla, which speaks as if it were part of the chorus in a Greek tragic theater, represents a pagan perspective in which the spirits or gods are believed to inhabit places or things

In the title poem, *The Wild Iris* an iris flower is the speaker. The poem informs the reader that the speaker suffered a lot. Yet the suffering will eventually, the speaker believes, lead to "a door" (2) to the natural world. The speaker explains how she lived there. The seed of the flower that lived under the earth, still she could feel the happening: "Overhead, noises, branches of the pine shifting. / Then nothing. The weak sun / flickered over the dry surface (5-7). It is obvious that the speaker is not dead because she can feel what is going around overhead. In this sense, it is about her world. The knowledge of trees, which are pine, shows she has a good knowledge of the surroundings. Yet, it is overhead, which means it is just a feeling. The event takes place outside her realm. Hers is indoor, private just like a seed inside the earth. Gluck provides a reason for her inability to experience the outer world: "It is terrible to survive/as consciousness/ buried in the dark earth" (8-10). The seed, like consciousness, is a source from where "a great fountain" and the source "of my life" flows. Thus, the woman, the speaker, the seed come to be the same thing: bounded within limited space yet having unbounded potential.

The meaning of winter, in Gluck's poem, is death, however, it is not the "good-bye, good-bye" it is a promise for regeneration. For the speaker in the poem, death is not an end, it's a promise and possibility for another: "At the end of suffering/there is a door" is what the iris, the flower announces (1-2). Thus, Gluck's use of vivid images from the natural world comes to assert the boundless regeneration found in the women, in the garden, and in the "center of my life came/ a great foundation, deep blue / shadow on azure seawater" (21-231). The reference of center and azure can lead to the reproduction and its process. It is a reproduction that perpetuates the existence. In *The Wild Iris* the iris is personified and it assures human, human readers, that death is not the end of life. Death is a stepping stone for a mysterious transformation. Recounting its own experience of dying and then being reborn with a whole new voice, Iris informs that death is not wholly frightening. The poem dramatizes the sense of pain and fear of death.

The function of images in her poem, as Landis argues, "pervades objects, seasons, relationships, expectations" (140) of all sorts and takes the reader to a fantastic world of the green but poisonous field landscape. The result effect of such images becomes a shift, a new "paradigm most often initiated by the course of events, by human feelings." Such feelings and experiences of men's world and women's world are different. These worlds can be called, domesticity and independence. The former is represented as a garden, seed, and woman. The outer world comes as a skylight, fig trees, and branches overhead. Critics have dominantly marked these worlds and earth and heaven, and the world of men and God. An entire new reading of her poem results in a "dark, central fact against which the sensibility constructs its strategies of survival, it chastened remembering of Eden and of an innocence irretrievable but of momentous import" (140). After all, it goes down to survival. Landis further comments:

The Wild Iris coordinates an eclectic grab bag of multicultural resources. She transforms these resources into a series of meditative religious poems, in which (following Wordsworth) the main human speaker experiences intimations of immortality, not a profound overwhelming vision. The Wild Iris marks a structural advance in Glück's career, as the author transforms the sequential gathering of related lyrics into a polyphonic theater. (140)

The Wild Iris has three sets of poems, thus three sets of speakers: a flower and plants, a gardener, and a divine speaker. These three sets of speakers exploit different subject matters for example, the divine speaker talks about time, season, change, and weather. In the poem, "Whose speakers are flowers or plants," Reena Sastri argues "conspicuously stage their own coming into being" (192). These speakers' attempts are existential "to be heard and to be seen" (192). Such an attempt will liberate women from the boundary of garden and domesticity.

Gluck complicates or blurs issues of identity, especially that of God, in two different but complementary ways. For one thing, much of what He says in displeasure, disappointment, condescension, pity, and anger sounds remarkably human, sounds (in fact) like the kind of thing a gardener might say to, or think of, her garden or a parent might say to her children. He sounds, in other words, like Glück herself, the volume's human character. His words duplicate what she often says. What I call a shared voice

is best exemplified in the book's antepenultimate poem September Twilight, the last one spoken by a person, not a flower. It sounds primarily like the speech of a gardener, acknowledging with wearied frustration the end of her labors:

Pride of women as creators comes as a central argument in *The Wild Iris*. However, for critics like Plumwood, "women's inclusion in the sphere of nature has been a major tool in their [men's] oppression" (19). Contrary to this point, Gluck's speakers point to the necessity of connecting it. In another poem, "Scilla," the flower mocks the poet-gardener for over-romantic affection to the human world. And, it urges the readers to consider the holiness of the flower and garden. Not only holy, but the garden is also a unique space worthy of pride:

> Why do you look up? To hear
> an echo like the voice
> of god? You are all the same to us,
> solitary, standing above us, planning
> your silly lives. (7-11)

The concept of two worlds occurs in the direct address. The poem is addressed to others who are like the speaker looking heavenwards for some inspiration. But, such a search for something absent is readily downplayed: "You are all the same." Perhaps this is addressed to the other world, men's world, heaven, or outside garden. These others are silly, not aware of the female power, and planning their silly lives, where the true source of life rests in the women.

Nature's world becomes vivid in the poem, "Violets" where the speaker speaks about the hidden world:

> Because in our world
> something is always hidden,
> small and white,
> small and wheat you call
> pure, we do not grieve. (1-6).

The natural world is hidden, not with much detail. The world comes to the reader in the form of hidden images like white, small hands under "the hawthorn tree" (12). The speaker feels

in all your greatness knowing
nothing of the soul's nature
which is never to die: poor sad good
either you never have one
or you never lose one. (16-20).

The hidden world and hidden nature of the soul become one in the image of violets. This is also a message of survival. In total, the effect is a form of regeneration. Garden as an extension of the woman world, brings the message of coexistence. In other words, the world of humans becomes the world of nature or creation just like that of God.

Conclusion

After analyzing Louis Gluck's *The Wild Iris* from the ecofeminist perspective using the insights of Val Plumwood, this paper concludes that the promise of regeneration and renewal is possible only through an ethical connection between the world of nature and the world of men. It has been analyzed that Gluck uses three forms of addresses and speakers befitting to each address to stress the importance of the harmonious connection between humans and nature. This connection becomes necessary to counter the excessive greed and limitless rationality of the human world. With the clear and distinct images of these two worlds, Gluck gives a peregrination of the two worlds, their beauty and limitations. The meandering into these two worlds exposes readers to different experiences and thus forces them to rethink the existing relationship and nudge for a renewed connection with one another.

It is possible to understand the images of the human world as the world of domesticity as a woman's world where she is both creator and creation. Like nature, woman gives life, and bears pain and suffering in the winter to persevere the very power of regeneration. In this sense, the whole idea becomes all symbolic. However, like the iris flower from where the flow of life opens up and sustains, nature has that promise of regeneration all along. This is the spirit that Gluck's poetry carries. It is the spirit of hope, the promise of regeneration, and the need for ethical treatment of nature by humans. Emphasizing this spirit, this paper expects to open up a new avenue in the attitude of treating nature.

Works Cited

Davis, William V. "'Talked to by Silence': Apocalyptic Yearnings in Louise Gluck's The Wild Iris." Christianity and Literature, vol. 52, no. 1, 2002, pp. 47–56. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/44313176. Accessed 20 Apr. 2024.

Gaard, Greta, editor. Ecofeminism: Women, Animals, Nature. Temple University Press, 1993.

Glaser, Brian. "The Implied Reader and Depressive Experience in Louise Gluck's The Wild Iris." Amerikastudien / American Studies, vol. 60, no. 2/3, 2015, pp. 201–13. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/44071905. Accessed 20 Apr. 2024.

Gluck, Louis, *The Wild Iris*, Eco Press, 1992.

---. "Biographical." NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2024. Tue. 30 Apr 2024. <https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2020/gluck/biographical/>

Landis, John Hutton. "The Poems of Louise Gluck." Salmagundi, 36, 140-48. JSTOR, www.jstro.org/stabl/40546980.

Morris, Daniel. The Poetry of Louise Gluck: A Thematic Introduction. U of Missouri P, 2008.

Plumwood, Val. Feminism and the Mastery of Nature. Routledge, 1993.

Sadoff, Ira. "Louise Gluck and the Last Stage of Romanticism." New England Review, vol. 22, no. 4, 2001, pp. 81-92. JSTOR, www.jstor.org/stable/40244581.

Sastri, Reena. "Louis Gluck's Twenty-First-Century Lyric." PMLA, vol.129, no. 2, 2014, pp. 188-203. www.pmla.org/artilce/pdf

Zazula, Piotr. "To Love Silence and Darkness:" Uneasy Transcendence in Louise Gluck's Poems." Brno Studies in English, vol. 38, no.1, 2012, pp. 159-77. DOI: www.doi.org/10.5817/BSE2012-1-11.

BL College Journal
https://doi.org/10.62106/blc2024v6i1e3
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -VI, Issue-I, June 2024
Pp. 142-152

Romanticizing Sufism: Tracing Spiritual Echoes of the Divine between Sufism and Romanticism

Roxana Khanom

Abstract

The paper is a comparative study exploring the shared spiritual resonances between Sufism, a mystical branch of Islam, and Romanticism, a Western intellectual movement. Sufism, originating within Islam in the 7th century, seeks divine truth through direct personal experience, while Romanticism, emphasizing emotion and individual expression, emerged in the West. This research investigates how these seemingly disparate traditions echo similar themes of transcendence, love, and mystical experience. Through a comparative analysis of literary, philosophical, and historical sources, the study uncovers their interconnectedness, shedding light on mutual influences and contributions to spiritual discourse. By examining key texts and poetry, this research aims at deep understanding of the universal quest for divine connection while offering unique perspectives on this eternal pursuit.

Roxana Khanom
Associate Professor
Department of English
Government Brajalal College
Khulna, Bangladesh
e-mail : roxanarahmanshipu@gmail.com

Keywords

Sufism, Romanticism, Intellectual, Divine connection

Objectives

- Analyzing key philosophical and literary texts from both Sufism and Romanticism
- Exploring the historical and cultural contexts of Sufism and Romanticism
- Investigating the methods of spiritual expression employed by Sufis and Romantic poets.

- Examining the influence of Sufi mysticism on Romantic thought and vice versa.
- Evaluating the impact of Sufism and Romanticism on contemporary discourse.

Methodology

The methodology for 'Romanticizing Sufism: Tracing Spiritual Echoes of the Divine between Sufism and Romanticism' employs a multifaceted approach drawing from primary and secondary sources. It involves rigorous source selection based on reliability and relevance, followed by an extensive literature review to identify key debates and trends. Literary textual analysis is used to inspect primary texts from both traditions, focusing on shared themes and stylistic elements. Contextual investigation delves into the historical and socio-cultural contexts of Sufism and Romanticism while a comprehensive comparative study juxtaposes their spiritual ideals and philosophical foundations. The research aims at contributing nuanced insights into the enduring dialogue between these traditions, enriching contemporary spiritual and cultural discourse.

Literature Review

The exploration of the spiritual resonances between Sufism and Romanticism encompasses a multidimensional analysis drawing from a variety of secondary sources. Scholars have traced profound parallels between the philosophical underpinnings of Sufism and Romanticism. Green's (2020) work, 'Sufi Mysticism and the Sufi Orders: Sufism's Many Paths,' provides a comprehensive overview of Sufi thought and practices, highlighting the multifaceted nature of Sufi spirituality. Barks' (1995) translation of 'The Essential Rumi' introduces readers to the poetic brilliance of Jalaluddin Rumi showcasing the mystical dimensions of Sufi poetry. Similarly, Jamal's (2010) translation in 'The Penguin Anthology of Classical Sufi Poetry' offers a rich collection of classical Sufi poetry allowing for a deeper understanding of the spiritual themes prevalent in Sufi literature. Wilson's (1993) "Sacred Drift: Essays on the Margins of Islam" delves into the marginal aspects of Islamic spirituality, providing insights into the esoteric and mystical traditions within Islam. In opposition, Faflak and Wright's (2012) 'The Romanticism Handbook' and Ferber's (2010), 'Romanticism: A Very Short Introduction' offer critical examinations of Romanticism as a literary and philosophical movement, contextualizing its themes of nature, emotion, and imagination. Schimmel's

(2011) 'Mystical Dimensions of Islam' and Nicholson's (2004) 'The Mystics of Islam' provide scholarly insights into the mystical dimensions of Islam, exploring the historical development and philosophical underpinnings of Sufism. Deen's (1997) biography, 'A Sufi Saint of the Twentieth Century: Shaikh Ahmad al-Alawi,' offers a glimpse into the life and teachings of a prominent Sufi figure, shedding light on the practical manifestations of Sufi spirituality. Moreover, Abrams' (1953) 'The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition' and Bloom's (1971) 'The Visionary Company: A Reading of English Romantic Poetry" provide critical examinations of Romantic theory and poetry, offering insights into the philosophical and aesthetic dimensions of Romanticism. Collectively, these works contribute to a nuanced understanding of the spiritual echoes between Sufism and Romanticism, enriching our appreciation of the intersections between these two traditions.

Introduction

The spiritual echoes between Sufism and Romanticism unveil parallels in their rejection of conventional norms and embrace of the transcendent. Sufi thought, epitomized by concepts like Ishq (love) and Fana (self-annihilation), mirrors Romantic ideals of passionate love and the dissolution of the ego. Both traditions' poetry, embodied by luminaries like Rumi and Wordsworth, reverberates with themes of love, yearning, and the search for the divine, often symbolized through nature's beauty. Artistic expressions, such as Artistic expressions such as Sufi whirling and Romantic poetry exemplify shared themes of spontaneity and creative vitality. The reciprocal influence between Sufism and Romanticism extends beyond the realm of art, shaping broader cultural landscapes. Sufi teachings left an indelible mark on the Romantic imagination, while Romanticism's fascination with mysticism fostered a Western appreciation for Sufi philosophy. Through a meticulous analysis of diverse sources, this research illuminates the enduring conversation between Sufi mysticism and Romantic aesthetics, offering profound insights into the timeless pursuit of the divine and the sublime (Green, 2020; Barks, 1995; Jamal, 2010; Wilson, 1993; Faflak & Wright, 2012).

Analysis and Description

The fascinating link between Sufism and Romanticism offers a captivating journey into spiritual resonance and artistic expression. Sufism, rooted in Islamic mysticism, focuses

on the inner quest for divine unity, while Romanticism, a liberated movement in art and literature, celebrates emotion, imagination, and the sublime. Sufism originated in Persia and grew into a well-established movement by the 11th century, later spreading to India in the 11th and 12th centuries. Meanwhile, Romanticism emerged in Europe during the late 18th and early 19th centuries. This investigation takes an unbiased comparative approach, delving into historical contexts, philosophical foundations, shared themes, creative execution, and the enduring impact of both traditions.

Historical Context

The historical context of Sufism and Romanticism provides a foundation for understanding their mutual ideas. Sufism, emerging within the early centuries of Islam, embodies a mystical response to the rigidity of religious orthodoxy, emphasizing the inward journey towards divine union. (Sufi Mysticism and the Sufi Orders: Sufism's Many Paths - Nile Green, 2020) Conversely, Romanticism, flourishing in Europe during the late 18th and early 19th centuries, represents a reaction against the Enlightenment's rationalism, privileging emotion, imagination, and the sublime. (Romanticism: A Very Short Introduction - Michael Ferber, 2010)

Philosophical Foundations

Both Sufism and Romanticism share a rejection of conventional norms and an embrace of the transcendent. Sufi thought, characterized by concepts such as Ishq (love), Tawhid (unity), and Fana (self-annihilation), resonates with Romantic ideals of passionate love, the interconnectedness of all existence, and the dissolution of the ego in the face of the sublime. (The Essential Rumi - translated by Coleman Barks, 1995) This parallelism extends to the experience of divine intoxication (Sukr) in Sufism, akin to the Romantic notion of the sublime, wherein the individual encounters overwhelming awe and ecstasy. (The Romantic Sublime: Studies in the Structure and Psychology of Transcendence - Thomas Weiskel, 1976)

Themes and Ideas in both Sufism and Romanticism

Themes of love, longing, and the quest for the divine pervade the poetry and literature of both romantic and Sufi traditions. Sufi poets such as Rumi, Hafez, and Attar, alongside Romantic luminaries like Wordsworth, Coleridge, and Keats, explore the depths of human emotion, devotion, and the yearning for spiritual fulfillment. (The Penguin

Anthology of Classical Sufi Poetry - translated by Mahmood Jamal, 2010) Nature serves as a prominent theme in both Sufi and Romantic literature, symbolizing the divine presence and reflecting the interconnectedness of all creation. (The Romantics and the Volcano: Nature, Morality, and Self-Constitution - G. Gabrielle Starr, 2010)

Artistic Expressions of Sufism and Romanticism

The artistic expressions of Sufism and Romanticism manifest in various forms, including poetry, music, and visual arts. Sufi whirling, a form of devotional dance, parallels the Romantic emphasis on spontaneity and the unleashing of creative energy. (Sacred Drift: Essays on the Margins of Islam - Peter Lamborn Wilson, 1993) Similarly, the mystical music of Sufi Qawwali shares affinities with the Romantic belief in the transformative power of music to transcend earthly limitations and induce spiritual ecstasy. (Music, Mysticism, and Magic: A Sourcebook - Joscelyn Godwin, 1986)

Romanticism in Poetry

Romanticism, a literary movement that emerged in the late 18th century and flourished throughout the 19th century, is characterized by an emphasis on emotion, imagination, and individualism, as well as a rejection of traditional forms and conventions. As William Wordsworth, a prominent figure of the Romantic era, proclaimed, poetry should arise from 'the spontaneous overflow of powerful feelings.' Romantic poets sought to break away from the rationalism and restraint of the Enlightenment period, instead embracing the subjective experience and the beauty of nature. One of the defining features of Romantic poetry is its celebration of nature as a source of inspiration, solace, and spiritual renewal. Wordsworth's Lines Composed a Few Miles above Tintern Abbey reflects this sentiment as he finds solace and connection with nature, describing it as

---And I have felt

A presence that disturbs me with the joy
Of elevated thoughts; a sense sublime
Of something far more deeply interfused,
Whose dwelling is the light of setting suns,
And the round ocean and the living air,
And the blue sky, and in the mind of man: (Tintern Abbey; 96-101)

Wordsworth's pantheistic philosophy aligns him with Sufi poets. His belief in the divine presence in nature parallels Sufi mysticism's reverence for the divine in all creation. Like Sufi poets, Wordsworth finds spiritual transcendence in the natural world, emphasizing unity between the self, nature, and the divine. Similarly, Samuel Taylor Coleridge's 'The Rime of the Ancient Mariner' utilizes nature as a backdrop for the supernatural and the sublime, emphasizing its power and mystery.

> The ice was here, the ice was there,
> The ice was all around:
> It cracked and growled, and roared and howled,
> Like noises in a swound! (The Rime of the Ancient Mariner, 59-62)

Romanticism also championed the imagination and the supernatural, as seen in the Gothic elements of Coleridge's Kubla Khan or the visionary symbolism of William Blake's The Tyger. Moreover, Romantic poetry often explores the individual's quest for freedom, truth, and self-discovery. In Percy Bysshe Shelley's 'Ode to the West Wind,' the poet calls upon the wind to be his 'trumpet' and 'lyre' as he seeks inspiration and liberation.

> Oh! lift me as a wave, a leaf, a cloud!
> I fall upon the thorns of life! I bleed! (Ode to the West Wind; 53-54)

Likewise, John Keats's Ode to a Nightingale searches into the themes of mortality and immortality, as the speaker longs to escape the constraints of the human condition and merge with the eternal beauty of nature.

> Fade far away, dissolve, and quite forget
> What thou among the leaves hast never known,
> The weariness, the fever, and the fret
> Here, where men sit and hear each other groan; (Ode to a Nightingale: 21-24)

Lord Byron, a quintessential Romantic poet, embodied the movement's themes of individualism, emotion, and rebellion. His works, such as Childe Harold's Pilgrimage, resonate with Sufi ideals of spiritual quest and transcendence. Byron's exploration of inner turmoil and longing for divine union aligns with Sufi mysticism's emphasis on love and spiritual journey.

> By the deep Sea, and music in its roar,
> I love not man the less, but nature more (Childe Harold's Pilgrimage, Canto. IV)

Overall, Romantic poetry reflects a profound shift in literary sensibilities, prioritizing the expression of emotion, the exploration of nature, and the quest for individual freedom and truth.

Sufism in Poetry

Sufism, a mystical dimension of Islam, finds profound expression in poetry through its pursuit of divine love, spiritual enlightenment, and union with the Divine Beloved. Central to Sufism is the concept of 'Tawhid,' or the oneness of God, which emphasizes the intimate relationship between the individual and the Divine. Sufi poets often employ metaphors of love to convey this mystical union, drawing parallels between earthly love and the yearning for spiritual closeness to God. For instance, in the works of Rumi, one of the most renowned Sufi poets, love serves as a metaphor for the soul's journey towards God. Rumi's verses abound with imagery of the Beloved, symbolizing the divine presence permeating all existence. In The Essential Rumi, he writes, 'I have no companion but Love, no beginning, no end, no dawn.' (Rumi 1995) This profound devotion to the Divine transcends religious boundaries and speaks to the universal human longing for spiritual fulfillment. Regarding religion, Rumi says, 'I belong to no religion. My religion is love. Every heart is my temple'.(Rumi 1995)

Moreover, Sufi poetry often emphasizes the importance of spiritual introspection and detachment from worldly attachments as means to attain union with God. The poetry of Hafiz, another revered Sufi poet, reflects this theme of inner contemplation and surrender to the Divine Will. Hafiz expressed in poetry love for the divine, and the intoxicating oneness of union with it. Hafiz, along with many Sufi masters, uses wine as a symbol of love. The intoxication that results from both is why it is such a fitting comparison. Hafiz spoke out about the hypocrisy and deceit that exist in society, In The Gift, Hafiz writes, 'I wish I could show you, when you are lonely or in darkness, the astonishing light of your own being.' Here, Hafiz urges the seeker to look inward and discover the divine light within oneself, echoing the Sufi principle of 'fana,' or annihilation of the ego in the Divine Presence.

Furthermore, Sufi poetry often employs allegorical language and symbolism to convey spiritual truths and mystical experiences. Attar, a Persian Sufi poet, epitomizes the essence of Sufism through his mystical poetry. Abū Ḥāmid bin Abū Bakr Ibrāhīm (c. 1145 – c. 1221 is better known by his pen-names Farīd ud-Dīn and ʿAṭṭār of Nishapur. Attar means apothecary. He was an Iranian poet, theoretician of Sufism, and hagiographer from Nishapur who had an immense and lasting influence on Persian poetry and Sufism. He wrote a collection of lyrical poems and a number of long poems in the philosophical tradition of Islamic mysticism, His works, notably The Conference of the Birds, explore themes of spiritual journey, love, and divine union. Attar's writings delve into the inner quest for truth, the annihilation of the ego (fana), and the longing for union with the Divine Beloved. Through allegorical tales and rich symbolism, Attar elucidates Sufi concepts of spiritual transformation and the path to enlightenment. His profound insights into the human soul and its longing for God continue to resonate with seekers of spiritual wisdom across cultures and generations.

Fakir Lalon Shah was a mystic, philosopher, and lyricist from Bengal in the 19th century. While he is primarily associated with the Baul tradition, which has roots in both Hinduism and Sufism, Lalon's teachings and poetry resonate strongly with Sufi philosophy. 'If you have a profound love for humans, you will become a golden person. Without people, you will lose your roots' or 'What race were you when you arrived? From what caste did you come? What caste will you be at the time of departure?' (Sai Lalon 1774). Lalon often quoted Baul's philosophy seems to merge with Sufism. He preached equality, simplicity, and the unity of all beings, transcending religious boundaries.

Thus, Through its rich symbolism, profound devotion, and universal themes of love and spiritual transformation, Sufi poetry continues to inspire seekers of truth and lovers of God across cultures and centuries, embodying the timeless essence of the mystical path.

Influence and Inheritance of Romanticism and Sufism

The influence of Sufism on Romanticism, and vice versa, extends beyond the realms of literature and art. Scholars have traced the dissemination of Sufi texts and ideas through translations and travelogues, shaping the Romantic imagination and inspiring thinkers such as Goethe and Emerson. (The Romanticism Handbook, edited by Joel

Faflak and Julia M. Wright, 2012) Concurrently, Romanticism's fascination with the exotic and the mystical contributed to a broader Western appreciation of Sufism and Islamic spirituality. (The Orient of the Boulevards: Exoticism, Empire, and Nineteenth-Century French Theater - Angela C. Pao, 2015). The analysis and description of the spiritual resonances between Sufism and Romanticism illuminate a rich tapestry of shared ideals, philosophical affinities, and artistic expressions.

Sufi Soul, Romantic Heart: Exploring Shared Mystical Themes

The intersection of Sufism and Romanticism offers a captivating exploration of spiritual resonance and artistic expression. Rooted in Islamic mysticism, Sufism emphasizes the inner journey towards divine union, while Romanticism, a European movement of the late 18th and early 19th centuries, celebrates emotion, imagination, and the sublime.

Scholars have traced profound parallels between the philosophical foundations of Sufism and Romanticism. Concepts such as love (Ishq), unity (Tawhid), and the dissolution of the self (Fana) in Sufi thought resonate with Romantic ideals of passionate love and transcendental experience. This shared philosophical framework forms the basis for a deeper exploration of their thematic convergences.

Themes of love, longing, and the quest for the divine permeate the poetry and literature of both traditions. Sufi poets like Rumi, Hafez, and Attar, alongside Romantic luminaries such as Wordsworth, Coleridge, and Keats, dig out the depths of human emotion and the yearning for spiritual transcendence. Nature serves as a prominent theme in their works, symbolizing the divine presence and reflecting the interconnectedness of all creation.

Artistic expressions further illustrate the affinity between Sufism and Romanticism. Sufi whirling, a form of devotional dance, mirrors the Romantic emphasis on spontaneity and the unleashing of creative energy. Similarly, the mystical music of Sufi Qawwali shares affinities with the Romantic belief in the transformative power of music to evoke spiritual ecstasy.

The influence of Sufism on Romanticism, and vice versa, extends beyond literature and art, shaping broader cultural and intellectual landscapes. The dissemination of Sufi texts inspired Romantic thinkers like Goethe and Emerson, while Romanticism's fascination with the mystical contributed to a Western appreciation of Sufism and Islamic spirituality. The exploration of spiritual echoes between Sufism and Romanticism offers insights

into the enduring dialogue between these two traditions, inviting further study into the timeless quest for the divine and the sublime.

Conclusion

In essence, the exploration of Romanticizing Sufism illuminates a profound harmony between the spiritual essence of Sufism and the artistic fervor of Romanticism. Through this synergy, we witness a symphonic interplay of mysticism and aestheticism, uniting disparate cultures and epochs in a sonata of shared yearning for the divine. This research underscores the timeless allure of Sufi teachings, echoing through the corridors of Romantic thought. When delving deeper, readers will find not only a convergence of ideals but also a celebration of human creativity and spiritual enlightenment. In this interwoven tapestry, readers discover a boundless wellspring of inspiration, inviting them to embrace the beauty of the mystical journey.

Works Cited

- Green, Nile. "Sufi Mysticism and the Sufi Orders: Sufism's Many Paths." Cambridge University Press, 2020.
- Barks, Coleman (translator). "The Essential Rumi." HarperOne, 1995.
- Jamal, Mahmood (translator). "The Penguin Anthology of Classical Sufi Poetry." Penguin Classics, 2010.
- Wilson, Peter Lamborn. "Sacred Drift: Essays on the Margins of Islam." City Lights Publishers, 1993.
- Faflak, Joel, and Julia M. Wright (editors). "The Romanticism Handbook." John Wiley & Sons, 2012.
- Ferber, Michael. "Romanticism: A Very Short Introduction." Oxford University Press, 2010.
- Schimmel, Annemarie. Mystical Dimensions of Islam. University of North Carolina Press, 2011.
- Nicholson, Reynold A. The Mystics of Islam. Routledge, 2004.
- Deen, Mawil Y. A Sufi Saint of the Twentieth Century: Shaikh Ahmad al-ʿAlawi. University of California Press, 1977.
- Abrams, M. H. The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition.

Oxford University Press, 1953.

- Bloom, Harold. The Visionary Company: A Reading of English Romantic Poetry. Cornell University Press, 1971.
- Rumi, Jalaluddin. The Essential Rumi. Translated by Coleman Barks, HarperOne, 1995.
- Wordsworth, William. Selected Poems. Edited by Stephen Gill, Oxford University Press, 2008.
- Emerson, Ralph Waldo. The Essential Writings of Ralph Waldo Emerson. Edited by Brooks Atkinson, Modern Library, 2000.
- Attar, Fariduddin. The Conference of the Birds. Translated by Sholeh Wolpé, W. W. Norton & Company, 2017.
- Keats, John. Selected Poems. Edited by Elizabeth Cook, Penguin Classics, 2009.

BL College Journal
https://doi.org/10.62106/blc2024v6i1e4
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -VI, Issue-I, June 2024
Pp. 153-165

Crisis of Humanism, Failure of American Dream, and Quest for Global Harmony in Fitzgerald's *The Great Gatsby*

Raj Kumar Gurung, Ph.D.

Raj Kumar Gurung, Ph.D.
Associate Professor of English
Ratna Rajya Laxmi Campus
Tribhuvan University, Nepal
e-mail : gurung.rajkumra@gmail.com

Abstract

This paper explores the crisis of humanism, the quest for global harmony and honesty, and the failure of the American Dream in Fitzgerald's novel 'The Great Gatsby'. The American dream means prioritizing money, whereas the failure of American dream means becoming unsuccessful in making money, and inhumanity has increased. It is Jay Gatsby whose financial condition was alarming, but because of his excellent earnings, his present life has become prosperous. The society regards him as a person of high status. None investigates his past life. Therefore, the study prioritizes global harmony, humanity, and honesty rather than money. There are nominal research works on this site. Because of money and a money-minded mentality, human relations have deteriorated. Modern man, like Gatsby, just accounts for the money. He has a mindset of no benefit of being honest and humane. The loss and profit game has mechanicalized modern life. It has become too much calculative. One man does not contact another man, as the ozone layer has depleted his friendship environment. The study's findings show that the more dishonest and inhumane you become, the more benefits you get. The new generation after two great wars is a kind of lost generation. So, this research sheds light on how to amend the humanitarian ground. The study analyzes the novel using Gertrude Stein's lost generation theory and explanatory methods. The research focuses on why modern men have become over-money-minded. Why have harmony, honesty, and humanity been in crisis?

Keywords

Failure of American dream, Humanism, Lifestyle, Lost generation, Money, Over-greed

Introduction

This paper explores the crisis of humanism and the quest for global harmony, honesty, and the failure of American Dream in Fitzgerald's novel, *The Great Gatsby.* The American dream means prioritizing money and happiness through money, whereas the failure-American dream means failure in earning money and losing humanity, honesty, dignity, morality, and global harmony. Modern man is ready to put all these things at stake for money. This is what Gertrude Stein called the lost generation. Modern man does not count the past and future, just the present. This study is explanatory research based on causes, effects, and solutions. The research explains the causes of over selfish and corruption, showy and hypocritical presentation. The effects are no good relations between humans. There has been an icy relationship between parents and children, brothers and brothers, sisters and sisters, friends and friends, and so on. Poudel argues, 'The modernist crisis of humanism is caused by the growing individualism, materialism . . . the growing dehumanization of humans due to uncertain and unfavorable situation' (250). In the modern age, individualism has become a matter of concern rather than mass, 'I' not 'we'. Materialism means prioritizing only matters like money or profits and benefits. In terms of grabbing the opportunity, dehumanizing the opponents is common. Similarly, Gatsby prioritizes individualism and matter. So, he has been living alone in a vast mansion.

Jay Gatsby's financial condition was alarming, but his excellent income has made his life lubricated and fantastic. The society regards him as a person of high status. The Society does not know him only it knows of him. Poudel states, 'Humanistic values that incorporate happiness, freedom, desires, expectations, cooperations, and other fundamental characteristics are a far cry in the modern world consequently, humanism is in crisis' (254). He clarifies that happiness, freedom, desires, expectations, cooperation, and other fundamental characteristics are critical in the modern world. There is a contradiction between money and humanism. Money is a necessary evil, whereas humanism is a mandatory and permanent solution. Modern man is against the permanency, he wants to make money, and become overnight rich. Alternatively,

he is in favour of momentary. Make money anyhow as fast as possible and enjoy life. Modern man does not have the patience to wait. The future is uncertain. This is the principle of every man in the lost generation.

Everyman has a crazy schedule as he is busy making money. Man pursues happiness, freedom, desires, and many other dreams, but his attempt seems idle. Money has become a measuring rod of human values. This has been like a cart pulling the horse. The world seems to go the reverse way. Humanity and honesty have become the social stigmas or hindrances of progress in life in the modern age. There is an unhealthy competition and hatred game in terms of making money. This helps deteriorate humanism. Who earned how is not accounted for, but who has what (new car) is well accounted for. Modern has become the age of WHAT but not 'why' and 'how'. Does this system ever account for humanism? Never. How did Gatsby become the great? Dickstein argues, 'Gatsby's origins are shadowy. His background and real identity are not to be revealed till late in the novel. We never learn much about how he made his money'. (6) Except for money, nothing is accounted for in the modern age. This over-money-minded trend has shadowed global harmony, humanity, honesty, morality, and dignity. Therefore, the study aims to balance between all these things and money for a better future and sustainable development.

Results and Discussion

There are few researches or works in this area. The researchers have also become money-minded. There are few readers for this type of research. The University Grants Commission (UGC) promotes research works a great deal, but there is nominal budget for humanities and social sciences. Compared to this discipline, other disciplines have more than a hundred times the budget granted or allocated by the UGC. The UGC is investing in the results-oriented area. In the modern age, the immediate result is a matter of concern. Immediate benefits for the masses, for instance, the mayor of Dharan sub-Metropolitan City, Harka Sampang, did this by bringing the water from the Kokah stream (42 kilometers away) within one year of his tenure. Similar consequences of Balen Shah in Kathmandu Metropolitan City. This is what modern people want. The UGC also entertains allocating and granting the budget in result-oriented areas rather than Humanities and Social Sciences. Although this research does not propose proportionate research grants in all the faculties, there should be balance. This might be

one foremost solution. This is the scenario of Nepal. Therefore, the researchers do not shed light on such issues.

Modern man, like Gatsby, just accounts for the money. He has a mindset of no benefit of being honest and humane. Daisy 'eventually broke off their relationship' (Maurer 77) with Gatsby. The relationship between either a love couple or friends is always in crisis. It can be easily broken off at any time. This crisis is what crisis in humanism. It has become very fragile. The loss and profit have mechanicalized modern life. It has been too much calculative. This deteriorated the entire human relations and prestige/ morals. The study's findings show that the more dishonest and inhumane you become, the more benefits you get. This over-selfish nature has been dominant. So, this research sheds the light on the humanitarian ground. The research focuses on why modern men have become over-money-minded. Why have harmony, honesty, and humanity been in crisis?

In the modern age, many things are ignored except for money, and people go ahead with the idea of how to grab money-oriented opportunities. The contradiction, as Robert Beuka assures, is "not only in terms of a conflict between morality and corruption but also psychoanalytically, as the playing out of the conflict between what Freud called the 'reality principle' and the 'pleasure principle' (42). The reality principle is in a pathetic condition, whereas the pleasure principle is at the extreme point. There is a conflict between morality and corruption. Morality does not make a man as glamorous and prosperous as corruption does. So, man is ready to corrupt to fulfill his fascinating life. He is fully guided by the pleasure principle rather than the reality principle. According to the reality principle, he has to be strict in morality, humanity, honesty, and dignity. He just dramatizes these things because the lost generation principle guides him. His bank account cannot be swelled by these nasty things like morality and humanity. Beuka further says, 'The apparent immorality of a tale filled with booze, illicit love affairs, gaudy parties, car crashes, violence, and murder' (48) is widespread in the modern age. Modern man enjoys these things in their life without any hesitation. Criminal activities such as murder and mass shootings have been shared as they have the war impacts of two great wars. This is what they are losing. Having booze, illegal love affairs with other married wives, showy parties, violence, and murder, as well as scamming girls or children or human trafficking, have been prevalent.

Nepal's government is taking action against figures like ex-ministers Balkrishna Khan and Top Bahadur Rayamajhi, as well as many others, for abusing the authorities. They are under police investigation now. They did this because they were guided by the pleasure principle, as remarked by Freud, and over-ambitious trends, immorality, and dishonesty. So, 'shallowness, hypocrisy, immorality' (Beuka 73) have been the significant characteristics of modern people. The more he gets, the more he wants principle has knocked them down toward degeneration. He is never satisfied what he has with. This is the failure of the American dream. "A man may take to drink because he feels himself to be a failure, and then fail all the more completely because he drinks" (Orwell 69). How much he earns does not matter; how much he is satisfied matters. Everyone is complaining about something; someone is complaining against his family; someone is complaining against the institute; someone is complaining against the government, and someone is complaining against himself. Is there anyone who is without complaints? This shows that this is the age of big complaints. The human satisfaction level is almost none. This alienated the person from his self at last. Moreover, he gets ready to commit suicide as Durand did in Strindberg's "Facing Death" and Willy Loman did in Miller's "Death of a Salesman." Durand took the poison and threw himself into the fire set on his house just before some time, and Loman crashed his car and killed himself. The loss of their lives is expected in the lost generation.

This paper explores the failure of the American Dream in Fitzgerald's novel, The Great Gatsby. The modern man has neither become happy from his job nor will he ever be happy in the days to come. Happiness is momentary. The most remarkable thing in the modern age is that the satisfaction level of humans is low or at the bottom. This proves that the American dream has failed. Man has become unnecessarily selfish, immoral, dishonest, inhumane, cruel, opportunist, sadist, scammer, cheater, rapist, and unethical just for momentary happiness. Ultimately, he has not become as wealthy as he wishes, nor wise and intellectual, moral, social and philosophical. Then, he chooses death. After all, death is the last satisfaction and salvation for all. In this sense, modern man is neither fully man nor a monster. He seems to be eighty percent monster and twenty percent man. His instinct drive is cannibal. Therefore, what a modern's eyes see is money. It is money, he thinks, and deals with everything in the modern age. Fitzgerald states, 'Money in The Great Gatsby is inherited or derives from the mysteries of high finance or comes from crime' (xiv). Criminal activities are a great source of money.

This instigates man even to commit whatever kind of crime if there is money. Does ever money come from the mysteries? What is that? Mysteries mean not the white money. Whatever business one does, it does not matter; how much he has earned matters. This is the actual scenario of the American dream.

Another dangerous thing is having excessive pride and discriminating against and othering people whose income level is not good. Dominating, dehumanizing, behaving with mean behaviour, and challenging as such things are the major characteristics of a modern man. He does not count anyone. The level of his arrogance swoops up, so there is a chance of Icarus's fall. Godin mentions, 'Just south of the Greek island of Samos lies the Icarian Sea. Legend has it that this is where Icarus died—a victim of his hubris' (13). Icarus was asked not to fly as high as he could. His father, 'Daedalus warned Icarus not to fly too close to the sun' (13). Nevertheless, he ignored his father's instruction and flew close to the sun. His wings were attached to the wax, and they melted down. He lost his wings as soon as he approached the sun and fell. Because of his excessive pride and arrogance, he fell into the sea. It was a pitfall. This is how people are facing the situation. Although 'there is a lesson to be learned from the hubris of Icarus, from his impatient desire to fly high without understanding the implications of his actions' (Godin 81), man is ready to risk anything before money. This is what Gatsby did to make money. There is no difference between his and Icarus's deaths.

While analyzing Arthur Miller's 'Death of a Salesman', Bloom points out, 'Willy Loman never made much money. His name was never in the paper. He is not the finest character that ever lived. But he is a human being, and a terrible thing is happening to him' (4). The modern man is not satisfied with the money he makes. This dissatisfaction is the dissatisfaction of all modern people. After all, what everybody wants is like the character of Miller's Death of a Salesman. It is Happy, the character, who expresses his desire 'All I can do now is wait for the merchandise manager to die. And suppose I get to be merchandise manager? He's a good friend of mine . . . But then, it's what I always wanted. My apartment, a car, and plenty of women' (12). Everyone has this selfish desire for someone's death if there is a benefit for him. There is no count of anything as Bloom claims that the 'time is money' principle is what the modern man implements.

Although man runs in pursuit of money as a deer runs in pursuit of a mirage, he cannot earn even to support his necessary expenses. Dickstein discloses that Fitzgerald himself faced the alarming condition of scarcity:

In the mid-1930s, Fitzgerald reached his nadir. Between 1935 and 1937, he wrote nine stories that no one would publish, and he constantly begged Harold Ober for money. His drinking became so bad that he finally had to be hospitalized. Hemingway offered to have his friend killed so that Zelda and Scottie would receive insurance money. (15)

As an established writer, Fitzgerald begged Harold Ober for money to publish the stories he had written between 1935 and 1937. He must have regretted doing this write-up. He was frustrated, and his drinking became so bad that he finally had to be hospitalized. What a pathetic condition! His friend, Hemmingway, offered to have his friend killed so that Fitzgerald's relatives, Zelda and Scottie, would receive insurance money, and they would publish the nine stories. Several people have been facing this problem in the modern world.

Wilson kills Jay Gatsby while he is at the swimming pool. Gatsby's former girlfriend runs over Wilson. This shows that the ending or death of such people as Great Gatsby is not a happy death or ending. Strindberg presents a similar incident in his one-act play, "Facing Death." Jay Gatsby is the protagonist in Fitzgerald's novel, and Durand is the protagonist in Strindberg's one-act play. As Gatsby has an unnatural death, Durand has an unnatural death. This is symbolic that the persons who are corrupted have such deaths. Strindberg shows the unnatural death of Durand because he has been bankrupt. Although he tried his best, he could not sort out his financial problems. The situation becomes so strong that he cannot defeat it, rather gets defeated. Strindberg's protagonist comes to this condition, 'DURAND: Six hundred francs if I sell it, and five thousand if I die' (287). Durand's financial condition has deteriorated, and he runs the lodge in his house but cannot earn well. He has fire insurance for his house. After his death, he gets less money by selling his house than his daughters. So, he puts fire in his house, takes poison, and dies. This shows that man is even ready to sacrifice his life for money. Durand sacrificed his life for five thousand Swiss francs, and Willy Loman sacrificed his life for 20,000 dollars for the sake of daughters by Durand and sons by Loman.

Jay Gatsby's past life was financially alarming, but his excellent earnings made his present life sound. Now, the society regards him as a person of high social status. The modern age seems to ignore the past and future but is concerned with the present. Society evaluates him based on the lubricated lifestyle he has. The study is about the non-American Dream, which is about the priority of humanity rather than just money.

This type of research has not been done yet. No religion is above humanity. It is being attacked from several sides and has been on the verge of extinction. Everyone has become money-minded in the present-day world, so the humanitarian ground has been eroded and barren. The modern man has a deserted heart and just sees what money is, not what humanity is. The study focuses on the principle that no religion is above humanity and honesty.

Because of this, honesty and humanity have become meaningless now, as there is no benefit to being honest. The study's findings show that the more dishonest you become, the more benefits you get. Betrayal, deception, disloyalty, and disobedience benefit modern man. This principle has worked well in the modern age. However, this research does not shed light on this side, it sheds light on the humanitarian ground at the base level. The study employs document analysis methods and explanatory techniques to analyze the text. The research concerns why modern men have become over-money-minded. Why have honesty and humanity been in crisis?

It is all because man has become selfish and more than necessary, and he has started doing whatever business it is, but if it is money-oriented, he does not account for anything. What he counts is money. This thought has been the dominant factor. This applies to Jay Gatsby in the novel but to almost all modern men in real life. Gatsby's choice of "Off-whites, brass and variants of yellow, symbolize money, greed, corruption" (Bloom 97). There is no limit to human greed, and being corrupted is a kind of culture developed in the modern world. 'In The Great Gatsby, the foul dust of the valley of ashes functions symbolically as a ubiquitous memento mori, the symbolic contradiction of Gatsby's belief that a man might wipe clean the corruption of the past and begin anew as innocent as a virgin child' (Bloom 93). Possible? No. However, human mentality is what Gatsby thought. Corruption is a social stigma that can never be washed out, but most people do not think that corruption is a sin or crime. They have begun to think that it is a common culture. Veblen states:

'Yet public anger against the questionable means by which millionaires grasped their wealth continued to be coupled with avid interest in the Big Money men who lived Big Lives surrounded by lavishly uniformed servants, pure-bred racehorses, sleek yachts, and expensive wives in Big Houses along New York's Fifth Avenue, Big Cottages at Newport, and Big Estates in Tuxedo Park.' (xiv)

Modern life has been the victim of such unhealthy competition that people have begun to play dirty games for money. The human eyes do not see prestige, dignity, honesty, humanity, morality, rationality, or harmony but only money. Only the money, the modern man sees. Where will the world end with this trend?

The leading cause of dishonesty, disharmony, immoral, and inhumane is human greed, which is more than necessary. 'Thorstein Veblen did not concur that the practice of greed is a good thing under any guise' (xiv). Human greed has demoralized several people who cannot have come out of the vault of corruption, scamming, and many more. Many people seem to have been ready to put their lives at stake if there is a benefit. The line of Jay Gatsby is also the same. Although he is called the Great Gatsby, he is not fully satisfied with what he has. There is unhealthy competition for a high class or status in today's world. Lifestyles have become very challenging day by day in one hand. On the other hand, people have begun to be over-showy after earning something either by doing hard work or by applying their talents, some new ideas, or other sources. Therefore, Lehman pinpoints:

'The rich bought Packard, Pierce Arrow, Stutz, Cadillac, and Chrysler cars that were beautifully designed, colourful, powerful, and expensive, indicating high social status. Very expensive imported automobiles came from Belgium, France, and Germany. The less wealthy bought the cheapest—the black utility Model T produced by Henry Ford.' (Lehman n. p.)

Based on income, different people began to buy different brands of vehicles so that their social status was maintained. Those with money bought expensive vehicles, and those with less bought less quality ones. This became the measuring rod of social status. The quality of life became a man's purchasing capacity. Those with good purchasing capacity have been labelled as a high class, and those whose purchasing capacity is nominal have been labelled as a low class. This matters.

Callahan seems to say that modern man 'is between property' and the 'pursuit of happiness' (379), swinging like a pendulum. In the end, neither does he get property nor does he have happiness. He has to face death without any hesitation, like that of Durand. This also reflects the reality of everyone in the modern age. Callahan clarifies, 'Gatsby pursues Daisy knowing that her sense of happiness and the good life depends

on money and property' (380-381). Is it white money Gatsby is talking about here? His money is black. Everyone's sense of happiness and the good life depends on money and property. Yes. But how long does it last? Why did not Jay Gatsby's happiness last long? This is because he is in the lost generation. Bloom points out, 'Enjoying living was learning to get your money's worth and knowing when you had it' (37). Enjoying life means enjoying your money's worth. This applies to all the people. Once your money is no more, your happiness is no more, almost no more with you.

So, man is ready to do whether the thing is hatred or so. 'Indeed, some people were prepared to do anything to achieve their aim' (Bonnin 358). This is a moral decline and humiliation, but man must do anything (requesting, begging or appealing, risking even murdering). He is already lost in the void because he is in the lost generation. Gertrude Stein is the first person to entertain this term, 'the lost generation.' Hemmingway made it by writing a novel around it. Alternatively, Hemmingway made it famous. After World War I, about twenty million people died, and the casualties were the same. This indicates the lost generation as those who were war veterans were mentally disturbed looking at the dead people.

Conclusion

This research was carried out to examine and explore the crisis of humanism, the quest for global harmony and honesty, and the failure of the American Dream in Fitzgerald's novel, The Great Gatsby. The American dream means earning as much money as possible, but the ceiling level of human satisfaction is increasing. How high can you fly in the open sky telling other nonsense bye-bye? It is never going to be fulfilled. Jay Gatsby has earned much more than his father or forefather. He has become the Great Gatsby now, but how much he is with what he has is not accounted for. The trend of prioritizing money has become the craziest activity of everyone. After earning something society can see, he starts derogating and challenging everyone, even the devil, as we find in Doctor Faustus by Cristopher Marlow. This is not the courage and confidence but the unnecessary overconfidence, arrogance, and ignorance. Moreover, still, human happiness cannot have come out of ground level. In the money-earning race, his inhumanity immediately sprouts when one becomes unsuccessful. This is what the American dream is.

It is Jay Gatsby whose financial condition was alarming, but because of his excellent earnings, his present life has become fantastic. The society regards him as a person of high status. The Society does not account for his past life, nor is it ready to see his future. The present world is selfish and opportunist. To promote humanity and global harmony, the research works should be promoted open-heartedly without bias. The University Grants Commission calls for proposals from different researchers, and scholarship is awarded accordingly. However, it does not grant an excellent budget to Humanities and Social Sciences scholars. Though this research does not propose a proportionate budget for all the faculties, it should be balanced and justifiable. The budgeting for other faculties is about a hundred times higher than the budgets granted for Humanities and Social Sciences. This correction is a must. The UGC should increase the amount of budgets in this area, calling the appropriate proposals for big budgets and significant projects in the Humanities. This activity should be carried out all over the world. The scholars will actively participate in the research. Then, humanity and global harmony will be enhanced gradually. This may make the lost generation gain generation, which helps prioritize global harmony, humanity, honesty, and dignity.

Moreover, the course designers should prescribe one paper of five credit hours in every technical field in universities like science, medicine, commerce, and business. There are nominal research works on this site because of a nominal budget. Because of money-minded mentality and tendency, harmony, humanity, honesty, morality, and dignity have been on the verge of extinction in today's world or almost in the dead condition, as it is the lost generation. Modern man, like Gatsby, just accounts for the money. He has a mindset of no benefit of being honest and humane. Modern life has been mechanicalized by the plus and minus or loss and profit motive. It has been too much calculative. This deteriorated the entire human relations and prestige/morals. The modern man wants immediate results as Harka Sampang did in Dharan sub-Metropolitan City and Balen Shah in Kathmandu Metropolitan City. Mr. Sampang successfully brought water to Dharan from the Kokah stream, 42 kilometers away. Balen Shah successfully monitored the overloaded political anarchic activities and kept the city clean, neat, and tidy. The study's findings show that the more dishonest and inhumane you become, the more benefits you get. This over-selfish nature has been dominant in the modern age. Jay Gatsby does the same. So, this research sheds the light on the humanitarian ground. The study employs document analysis methods and explanatory techniques to analyze

the play. The research focuses on why modern men have become over-money-minded. Why have harmony, honesty, and humanity been in crisis?

Works Cited

Aldridge, John Watson. After The Lost Generation: A Critical Study of the Writers of Two Wars. Arcole Publishing, 2019.

Beuka, Robert. American Icon: Fitzgerald's The Great Gatsby in Critical and Cultural Context. Camden House, 2011.

Bloom, Harold. Bloom's Guides: The Great Gatsby. Edited by Harold Bloom. Chelsea House Publisher, 2006.

- - -. Arthur Miller's Death of a Salesman. (Bloom's Modern Critical Interpretations). Chelsea House Publications, 2006.

- - -. Earnest Hemmingway's The Sun Also Rises (Bloom's Guide). Bloom's Literary Criticism Books, 2007.

Bonnin, Michel. The Lost Generation: The Rustication of China's Educated Youth (1968-1980). Chinese University Press, 2013.

Callahan, John F. "F. Scott Fitzgerald's Evolving American Dream: The 'Pursuit of Happiness' in Gatsby, Tender Is the Night, and The Last Tycoon." Twentieth Century Literature, 42(3), 1996, 374–95. JSTOR, https://doi.org/10.2307/441769. Accessed 23 June 2023.

Dickstein, Morris. "On The Great Gatsby." Critical Insights: The Great Gatsby. Edited by Morris Dickstein. Salem Press, 2010

Fitzgerald, F. Scott. The Great Gatsby. Wordsworth Classics. 1999.

Godin, Seth. The Icarus Deception: How High Will You Fly? Penguin. 2012.

Lehman, LaLonnie. The Fashion in the Time of the Great Gatsby. Shire Publications, 1925.

Maurer, Kate. Fitzgerald's The Great Gatsby. Hungry Minds, 2013.

Miller, Arther. Death of a Salesman: Certain Private Conversations in Two Acts and a Requiem. Penguin Books, 1998.

Moyn Samuel. "Human Rights and the Age of Inequality." English Grade 12. Curriculum Development Centre. 2021.265-271.

Orwell, George. "Politics and the English Language." Academic Writing Argumentation. TU

Book Center, 2020. 69-80.

Poudel, Uttam. "Humanism in Crisis: Ironizing Panopticism and Biopower in W. H. Auden's "The Unknown Citizen." International Journal of English Literature and Social Sciences Vol-6, Issue-5; Sep-Oct, 2021.

Strindberg, August. "Facing Death." English Grade 12. Government of Nepal Ministry of Education, Science and Technology, Curriculum Development Centre, 2021. 279-292.

Veblen, Thorstein. The Theory of the Leisure Class. Edited by Martha Banta. Oxford University Press, 2007.

BL College Journal
https://doi.org/10.62106/blc2024v6i1e5
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -VI, Issue-I, June 2024
Pp. 166-176

The Folk Performing Arts Containing Four Art Forms of Assam and Its Present Status

Dr. Sudarshana Baruah

Abstract

Assam is a place of different cultures and languages. Here many communities, and sub-communities' are living together. Different cultures assimilated together in Assam.

It has resulted from the long-drawn process of integrating numerous groups and communities, which can better be understood in the cultural and historical context of Assam. In the ancient period, common people expressed their feelings through simpler tunes, which are known as folk music. The Assamese people observed various calendar festivals, seasonal festivals, and limited participation festivals on different occasions. These festivals feature folk dance, music, drama, instrument playing, and other activities. The performing arts range from vocal and instrumental music, dance, theatre, mime, etc. These include numerous cultural expressions of people that reflect human creativity and are found in all cultural heritages among the people in the world.

Dr. Sudarshana Baruah
Lecturer
DIET (Art Education)
e-mail : sudarshana.baruah83@gmail.com

Keywords

Music, Performing arts, Folk Performing arts of Assam

Introduction

In general, the songs which come from generation to generation among common people adopting oral tradition are based on shruti (pleasing sound) and smriti (which is remembered) and are known as folk songs. It means the songs and traditions which are

flowing through generations orally are called folk culture. Folk culture has flourished and lived in folk people's hearts. It isn't found in writing and even the writer is unknown in folk music.

Humans first began utilizing signs and symbols to communicate in the prehistoric era. They began speaking and expressing their emotions through various body movements.

When humans were in their primitive or early state, they eventually heard various sounds of nature such as animals, rain, wind, etc, and they were very curious about and drawn, attracted to the sounds of nature. Due to their enthusiasm, they followed the sound and attempted to speak it themselves. By striking two sticks or bamboo, animal bones, they attempted to sense the tone of rhythm. Thus, individuals began to follow diverse sounds in the primitive age.

Early humans were afraid of natural disasters, pandemics, fatal diseases, rain, storms, and earthquakes. They believed that a superpower may have been controlling them. To appease the supernatural force, they sacrificed many things and began to pray to trees rocks, and other things of nature. When praying to these natural objects, they made numerous rhythmic and vocal sounds (beat) with body movement and hand gestures. This way later on in different periods, humans have developed various musical notes, melodies, rhythms, and also instruments. Under the cover of the devotional faith of human beings, music was brought up and took its standard and purist form. This way various types and forms of folk music have been developed in different times by humans.

As people became more civilized in times and began to live in societies, they progressively developed distinct cultures, religions, and different forms of music. The music developed by the common people was known as deshi music or loka Sangeet in India. In English, it is known as Folk Music. According to Indian scholar Pt Sarangadeva (13th century) in his book Sangeet Ratnakara (written in the Sanskrit language), he asserts that songs, dance, and instruments are together known as Sangeet in Indian concept. But in the present scenario, music refers to songs and instrumental music, and dance is considered an independent art form. However, according to the text Natyashastra written by Bharatha(approximately in between the 1st-5th century), he states that Drama, Music, Dance, and Playing instruments were performed together in that period.[1]

Folk literature is part of every folk culture. It is divided into two parts– prose and verse. The verse folk literature is based on poetic sense and aesthetic way of presentation. The word Katha in the Assamese language means oral folk literature. Folk literature is written in prose.[2] These are not bound by creeds or customs. Folk songs are mostly based on love, devotion, story songs, labor songs, children's songs, etc. These folk songs are mostly based on folk stories, puran katha (myths of Purana), mythological stories, heroic stories history-based stories, etc. The prayer songs are found in both the form of prose and verse style in Assam. The people of hills and plains both have special characteristics, culture, and literature. The folk literature of various communities and other groups of people is vast and incredible. Folk literature is flowing verbally from generation to generation. When folk people started performing folk literature through the medium of musical notes, they started following some common rules which are followed by folk people and they perform it traditionally. Folk people sometimes use folk instruments in their songs and dances. Sometimes they clap in their hands with footwork to maintain rhythm. Some folk performing arts have contained song, dance, playing of musical instruments, and semi-acting. Folk songs speak about the beliefs, customs, costumes, food habits, and lifestyles of people living in different periods.

Performing arts and its Characteristics

Artists who participate in performing arts in front of an audience are called performers. Examples of these include actors, comedians, martial arts, storytelling, recitation, dancers, magicians, circus artists, musicians, and singers. Performing arts are also supported by workers in related fields, such as song writing, choreography, and stagecraft. Performers often adapt their appearances, such as costumes and stage makeup, stage lighting, and sound.

Performing arts may include dance, music, opera, theatre and musical theatre, magic, illusion, mime, spoken word, puppetry, circus arts, professional wrestling, etc. It is a medium of creative self-expression. Dance, though very complex may be described simply as ordered bodily movements, performed with music. Without musical sound and instruments, dance is incomplete. Apart from its physical aspect, the rhythmic movements, steps, and gestures of dance often express a sentiment or mood or illustrate a specific event or daily act. For example- religious dances and those representing hunting, warfare, marriage ceremonies, rituals, etc. express various moods and emotions and the

song or the musical compositions give life to the dance performance. Traditional folk theatre performances usually combine acting, singing, dancing, dialogue or narration, and recitation. It may include puppetry and other folk dramas too. The instruments like Sitar, Tabla, Sarod, and folk instruments of different states are artifacts of cultural expression.

Folk Performing Arts

Performing arts which are prevalent traditionally in oral form among the common people are known as folk performing arts. Song, dance, drama, instruments, puppetry, mime, etc., which are performed by the folk people or common people are known as folk performing arts. It is connected to folk people's emotions. The Assam state of India has a rich cultural heritage. The lifestyle, beliefs, traditions, rituals, creeds, food habits, attires of people, and language all are visible through the arts and the performing arts of a region.

Folk Music

Music is perhaps the most universal of the performing arts. Music (songs and instrumental) can be found in the most diverse contexts: sacred, classical, and closely connected to work or folk people, elite music, popular music, modern or light music, etc. There may also be a political economic and historical dimension that is connected and reflected through music. For example, it can recount a community's history through the lyrics of traditional songs the people have performed. Folk stories or folk tales, stories of a powerful king, historical incidents, etc. have been expressed and evident through folk music.

Folk Music of Assam

Folk songs are prevalent in different places in Assam. Here, a variety of communities, sub-community, and tribal people live. They observe various rituals and other observances throughout the year. They perform dance, music, drama, playing instruments as well as other activities during various occasions. People of Assam have distinctive ways of expression through artistic language. Although the purpose and attributes of creating art in different cultures are the same, but way of expression is different. The tribal community and other communities in the northeast celebrate various occasions distinctively and in their very own style. The people of Assam celebrate various

occasions and perform music. The Mising, Karbi, tiwa, moran, mattak, and Kachari people celebrate their festivals and ceremonies differently. 'Bihu' is one of the most important festivals of Assam's people where people perform Bihu songs. Different communities in Assam, observe the Bihu festival in their way. These are other varieties of folk songs and dances that are performed at various festivals and special occasions in Assam. For instance, Hussori, Bonghosha, Bihunaam, Posotir geet, Barmahi geet, Nichukoni geet, Phakuwa geet, Phoolkuwar-Manikuwar geet, Kamrupi lookgeet, Gowalporiya lookgeet, Dihanaam,Tukari geet.[3]

In the lower part of Assam known as Kamrup (now called Dispur), people of various castes and creeds coexisted. They perform folk songs like Mohoho geet, Gorokhiya geet, Mahutor geet, Puppetry songs, Mallita, Akhayan geet, and Dhuliya geet are a few examples of Assamese folk performing art. Assam is very rich in terms of folk theatre. The prominent folk theatre forms of Assam are Ojapali, Kamrupi Dhulia, Puppetry, Khulia Bhaona, Bhari gaan, Kushan gaan, Dhulia Bhaona, Dhura nat, Pala gan, puppetry.

On the other hand, some semi-folk drama theatres are also practiced in Assam. These are Dhepadhulia, Mohoho, Matheni, Pasoti, Kalipuja, Kali Chandi dance, Charak Puja, Nagara naam etc. are the semi folk drama of Assam. There are folk performing arts where artists perform through music, dance, drama, and playing instruments together in groups. These forms have their specialty or characteristics. According to place, language, and faith different communities celebrate their festival differently. So, although the purpose of artistic expression is the same, the expression is different. The traditional folk performing arts may have contained four art forms: dance, drama, songs, and instruments. The traditional folk performing art containing dance, songs, theatre art, and instrumental music has been divided into two parts as follows:

History of Folk-performing Arts Containing Four Arts of Assam

The folk performing arts containing four art forms in Assam is very ancient. It has been prevalent since ancient times and there are many pieces of evidence found that supported the truth.

According to writer Tirthanath Sarma, 'the tradition of Vasudeva puja (rituals)had been performed in Assam (earlier named Kamrup) from 3rd to 4th century'.[4]

An ancient Pandit Vaidacharya Samvatsar mentioned the Jagar puja(ritual)and Jagor geet in his book 'Smriti Ratnakar' in the 13th century. It is said about the ritual meant for Lord Vishnu that, 'The Gandharvas(ancient musicians) must present devotional song and dance with tala and musical instruments in Jagar Puja(ritual)".[5]

Here, again the term 'Gandharva' has been used instead of 'Ojapali' music in the above-mentioned book. Ojapali is a religious music form containing four art forms similar to the 'Gandharva' music of the ancient age. The ancient word 'Jagor geet which is found in 'Smriti Ratnakara' written by Samvatsara in the 13th century, found about rituals related to Vasudev, Shiva, and Shakti puja(ritual). In these rituals in around the 13th century, Ojapali was performed by the performers.[6]

According to scholars the term 'Byas sangeet' was also found in the ancient age. According to Acharya Manoranjan Shastri, 'The period of Palakapya, the author of Hastryuved is regarded between 5th to 6th century, his father was a Sama singer, whose Ashram was situated in Assam'.[7]

Similarly, references to the art forms containing songs, musical instruments, dance, acting, and dialogues in respect of religious episodes, such as 'sama gayan' or 'sama vedic music' and 'Gandharva' music have been found in ancient treatises. Sama music or Vedic music was also sung in choral form with a lead singer called udgata in the Vedic period. The evidence says that after performing Vedic chants, laukik or desi music was performed with dance, songs, and instruments by the local artists in the Vedic age. The Gandharva music was popular at that period among the folk people. The kings of ancient Assam honoured dance, song, and other art forms.

Based on the copper inscriptions found in the 9th century (period of King Van Mal Dev) it is proved that music combining four arts was prevalent in that period for religious purposes. The worship of Lord Shiva in Hataksuleen Shiva temple is mentioned in the Tejpur inscription, and here found that the prayers were performed with songs, musical instruments, and dance.[8]

The term 'Daluhangna' has also been mentioned in ancient copper inscriptions found in Assam, and it refers to the 'Devdasi dance'. The word, Deodhoni dance, which is performed in Suknnani Ojapali, expresses the same meaning. Certain artworks belonging to the 10th century have also been recovered in Assam, which depict the

dancers playing instruments, such as 'haul' (Percussion Instrument) and 'Bhaurtal' in Assam (a folk musical instrument made of bronze- Ideophone).[9]

The routine singing tradition containing songs, instrumental music, dance, and acting was prevalent in the temples of ancient times in Assam. Songs with instrumental music, dance, and other art forms were presented in the ancient temples of Hajo Parihareshwar in Assam while worshipping on different occasions.

From the above evidence we can understand that folk performing arts containing four art forms have been prevalent in Assam since the ancient period.

Traditional Folk-performing Art (contains songs, dance, theatre, and musical instruments)

The traditional folk performing arts is divided into two parts. These are Ritual ideology dependent and Satire-dependent folk performing arts. Both forms have various sub-divisions.

1. Ritual ideology dependent
a. Epic dependent
b. Mythology dependent

2. Satire dependent
a. Folk tale Dependent
b. History Dependent
c. Social topic dependent–Romantic and Heroic
d. Comedy Dependent

Putola Nach or puppetry, Dhooliya Nach, Ojapali, Khuliya Bhaona, Bhari Gaan, Kushan Gaan, Pala Gaan or Bhaona, and Dhura Nach, are a few examples of Assamese folk performing art including acting or drama. The subject matter of traditional folk performing arts may be divided into two major parts and there are other sub-divisions. Following are the folk performing arts prevalent among the Assamese people of Assam.

Puppetry

The puppet play-act, known as putola nach is practiced all around the world. Puppetry is a folk theatrical art consisting of four art forms. These are song, dance, drama, and playing instruments.

The puppets are controlled by a stick or rope. Here, some stories have been told using Putola, which is why it is also known as 'Putola nach' (Puppet Play). The presentation method can be compared to a proscenium stage. According to the wishes and instructions

of the director known as Sutradhar, the Putolas (puppets) perform their roles. However, in a human drama, the players portray their roles by the storyline or the theme of the play as directed by the director. Puppetry is done on a variety of subjects, such as the Mahabharata, the Ramayana, the Purana stories, and others.

Putola Nach comes in four different varieties. Those are as follows:

1. Shadow Puppet.
2. Puppet using a stick
3. A puppet guided by a string
4. Playing the puppet by hands.

According to the ancient book "Kalika Purana" the place of Assam called Pragjyotishpur, the custom of puppet play has persisted since the ninth century. Srimanta Sankardeva (Vaishnavite saint of Assam) introduced Chaya Putola, also known as Shadow Putala, in Assam. There are putala plays and dances that are operated by strings. Kuhila, bamboo sticks, and cow dung are the materials used to make puppets. The utilization of clothing and accessories depends on the needs of the character. In Putola nach or puppetry, the playing of musical instruments like the khool and flute are frequently employed. The Putola nach performance is run by the lead artist or narrator called Sutradhara.

Dhooliya Nach

Kamrup district has seen the emergence of Dhooliya Nach or Bhaona. The performers are called Dhooliya, and they have appeared at weddings, functions, festivals, and other events. They have also engaged in circus-style acrobatics. Dhooliya Nach often comes in two varieties.

1. Myth.
2. Current events based on humour.

Along with dancing and music, acting is a component of Dhooliya Nach. There are various kinds of Dhooliyas, including those who perform during puja (rituals), festivals, and meetings. Dhulia artists perform at gatherings, meetings, and other social events. A musical instrument called the Dhol is played by 40–50 people, while the symbols are played by 20–25 people and the Kali is played by 10–12 people. Dhooliya artists are categorized under several names:

1. The leader is termed Ghai Dhooliya
2. Dhooliya
3. Baya or Bayan
4. Gayak or Gayen (singer)
5. Taloyai (Cymbolsplayer)
6. Bhawariya or Bhaira
7. Ariya Dhora
8. Accrobetic Dhooliya
9. Kaliya Player

There is another part named "Chong" included in their performance, which is performed by the character called Bhawariya or Bhaira. The Bhawariya here consists of stories or situations of current affairs prevailing in the society. At the end of the Dhooliya performance, the Bhawariya performs this Chong piece. Generally, the stories of the Dhooliya Bhaona are taken from mythological stories like Sitaharan (Ramayana), Abhimaniyur bodh (Mahabharata), etc. It also included historical stories like Jaimoti (Local historical nonfiction), Bharat-China yudha (India-China war story), etc.

Kushan Gaan

The Gowalpara district of Assam is the birthplace of Kushan Gaan. It combines song, dance, and drama. Other names for it include Benagaan and Ravangaan. The leader, known as Mul or Gittal, is accompanied by 15 to 16 people while reciting the Purana and the Ramayana poems. The leader solicits assistance from a different performer known as Dawari or Dohari.In addition to throwing dialogues and acting, they also sing and dance. Male participants in this dance are referred to as Chengra or Chokra, and female performers are referred to as Chukri. The musicians play Khool, Bena, and cymbal instruments. Starting with a Saraswati Vandana, Kushan gaan artists start their performances. At the beginning of the concert, the lead artist Gittal begins singing and playing with the musical instrument called Bena.

Bhari Gaan

The Gowalpara district of Assam also has a traditional drama called Bhari Gaan. It combines music, dance, and theatre. The Assamese Rabha community still performs this traditional dance. The Ramayana and the Mahabharata are the two stories on

which the theatre is based. In Bharigan, music is more significant than acting. Mul or Gayonia, are the principal performers, accompanied by a group of actors. These supporting performers are wearing wooden masks. Ketwa is a comedic figure who appears in Bharigan. The lead artist holds a Suwar (made from yak tail). The attire Dhoti, chadar, and Rudraksh mala are worn by the artist. Khool and Cymbal are the two main instruments used in Bharigan.

Khuliya Bhaona

Khuliya Bhaoriya is more ancient than Ankiya Bhaona of Mahapurusha Srimanta Shankardeva (saint of Assam). It emerges from the Byas or Byasgowa Ojapali. Khuliya Bhaoriya or Bhaona is a popular and indigenous traditional theatre of Darang and Kamrup of Assam. Khuliya Bhaoriya is also performed in some parts of the Nalbari and Barpeta districts of Assam. The story of Khuliya Bhaona is mythological like the Vaishnavite dramas. The stories are mainly taken from the Ramayana and the Mahabharata. The leader of Khuliya Bhaona is called Oja or Sutradhar. They perform the characters of the Ramayana like, Rama, Lakshmana, Bharata, Dasharatha, Ravana, Sita, etc. There are 4-5 numbers of palis, 4-6 numbers of Khuliyas, and 2-3 numbers of actors in Khulia Bhaoriya. In addition to this, there are 20-25 Bhaoriya. The Khuliya Bhaona starts with beating the khol which is called "Kholaghat". Then Oja takes Chowar in their hand and gives a dancing pose.[10]

Dhura Nach

It is a type of Vaishnavite inspired theatre that emerged in Assam, following Srimanta Shankardeva's Ankiya Bhaona. This is referred to as Dhurabhaona or Dhura Nach. It is an Assamese folk theatrical art form that combines the four arts of music, dance, theatre, and playing an instrument.

Pala Gaan or Bhaona

A religious music genre called pala gaan combines dancing, theatre, music, and playing an instrument. It is strikingly similar to the Panchali gaan of the Assamese village of Majuli, Auniati Satra. After 1826 A.D., Pala Gaan evolved as a Jattra daal or group who moved and performed on the roads or streets.

Conclusion

Folk dance refers to the informal or recreational movement expression of a particular region's culture. As cultural practices become more standardized and many old artistic practices are abandoned nowadays, many performing art forms are in danger. Everyone must protect our cultural legacy so that we can continue to practice our art forms and carry it on to future generations. It is very important to preserve our cultural heritage and also know the historical background of these art forms. Due to modernization, there is such a phase of a rapid transition to globalization that the rich cultural heritage faces the threat of change. If it is not preserved well in time, it may soon be lost. These traditional folk music traditions are now slowly moving towards extinction or their originality will be affected due to the impact of rapid modernisation among people worldwide. Even the next generation doesn't know about their culture well. It is everyone's responsibility to make the children aware of their culture and traditions so that they can carry on and showcase their identity to the world. Folk artists are not interested in continuing the practices of these art forms as there is no financial gain through these art forms. So they are not also interested in teaching the art form to their children and students.

Works Cited

1. Swami, *A Historical Study of Indian Music*, Ramakrishna Vedanta Myth.
2. Sarma, Nabin, *Bharator Uttarpurbachalor Paribesya kola*, published by Bonolota, Panbazar, 2013
3. Sarma, Nabin Chandra, *Assamor Prabeshya Kola Ojapali*, Publisher Bani Prakashan,1996
4. Sarma, Nabin Chandra, *Assamiya Lok Sanskriti r Abhas*, Publisher Bani Prakashan, 2005
5. Sarma, Nabin Chandra, *Assamor Paribeshya Kola Ojapali*, Bani Prakashan, 1996
6. Ibid
7. Ibid
7. Sarma, Nabin Chandra, *Bharator Uttar Purbanchalor Loka sanskriti*, Publisher Bani Prakashan, 2017
8. Baruah, Birinchi Kumar, *Assomor Loka Sanskriti, Chandan Dey*, Bina Library College Hostal road, Panbazar, 2018
9. Neog, Hari Prasad, Gogoi Lila, *Assomiya Sanskriti*, Publisher Assam Sahitya Sabha, 2013
10. Baruah, Sudarshana, *Ojapali Music of Assam and its Classical Elements*, published by Assam Book Trust, Panbazaar, 2018

BL College Journal
https://doi.org/10.62106/blc2024v6i1e6
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -VI, Issue-I, June 2024
Pp. 177-188

Mythical Realities in Nepali Writings
Mahabharata Mythic in Krishna Dharabasi's Radha

Mani Bhadra Gautam, Ph. D

Mani Bhadra Gautam, Ph. D
Central Department of English
(Humanities and Social Sciences)
Tribhuvan University,
Kathmandu, Nepal
e-mail : gautammanibhadra@yahoo.com

Abstract

This paper analyses Krishna Dharabasi's Radha and zooms mythic realities of Krishna-Radha relationships. It is based on the Archeological study method of the Hindu scripture written on metallic plates and kept inside the iron box that was found in Braja. The plates can be unburied historical proofs of the buried memories. Written documents historicize Krishna-Radha relationships and Krishna's Rasa Lila on the one hand and Kunti-Madri's maternity on the other hand. Documents also historicize the love stories of Krishna on the one hand and war stories of Kauravas and Pandavas on the other hand, and so this paper is prepared in a comparative method. This paper makes a comparative study with an archaeological investigation in some mythical places of Eastern Nepal: Bhadrapur- Mechi and Keechak Badh Jhapa in connection to the mythic realities of Pandu's wives Kunti and Madri's experiences and myth makings. Claudio Guillen, Marshall Sahlins, and Susan Bassnett's ideas are applied for theoretical support. The objective of this paper is to excavate on mythical realities of Radha-Krishna love, war, and renunciation. The finding of this paper is that Dharabasi's Radha interlinks with conceptual knowledge of Ramayana and Mahabharata that can be studied from mythical and historical perspectives, too.

Keywords

Braja, Scripture, Excavate, Mythic, Archaeology, Existence

Introduction

Krishna Dharabasi's Radha, 2005, exposes Krishna's love, romance, and war stories on the one hand and Radha's waiting for Krishna's Rasa Lila (amusing activities) on the other hand. Radha is observing Krishna's cheating and romances with Gopinis. Radha seems as if she is an innocent girl who is mad at Krishna's love and romance. Her ignorance turns to doubt as she longs for love and questions on Krishna's activities. She looks like a simple girl when the narratives begin but she is strong enough to fight with the situation to settle herself with the passionate love of Krishna to whom she trusts as everything of her life. Krishna is relatively weaker, loose, and less responsible in the issue of love and caring not only for Radha but also for Kunti and Madri's maternity, too. His birth is mysterious and it is kept in secrecy to rescue him from the Kauravas' and Pandavas' enmity that is exposed in Krishna Dharabasi's Radha.

Kauravas wanted to kill the five sons of Pandu; Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula, and Sahadeva, and control Hastinapur. Pandu in mythical history is believed to be the father of five different gods and powerful brother of King Dhritarashtra. According to the mythical allusions, Pandu was cursed to be a father and that brought the Mahabharata war. According to the historical recordings, Pandavas were dangerous cousins of Kauravas. Regarding this issue, it is noted in Mahesh Paudyal's translated version of Radha, "Krishna grows in Braja as Nanda's son. Radha, in her diary, attacks this act, flaying it as an act of belittling a girl child and offering her to be killed merely to save Krishna, the male child" (Paudyal 5). Radha in this sense is a book about historical events that is full of myth and mysteries. Yashoda takes Nanda as a liar who keeps the issue of child exchange in secrecy and Radha takes Krishna as a cheater who lulls women everywhere and every moment especially while making thousands of wives stay in Braja and Mathura. Dharabasi's Radha in this sense interconnects the multiple narratives to historicize the archaeological things and experiences of the people.

Theoretical Underpinning of the Study

The novel discusses the hidden secrecies of Radha's madness. Radha is worried when Krishna goes to Mathura and that ultimately makes her sick. She is longing here and there like a mad girl, keeping Krishna's images in her mind. Ultimately, she is somewhere else in the secret place where Krishna and his people cannot see her. Krishna has lots of

problems regarding people, places, and things, and so he has to solve them wisely but he keeps searching for Radha as the priority. He uses all the resources to find her but the attempts become failures. Later on, Krishna is worried and he is almost like a madman when he cannot meet Radha. He suspects that there might be abduction and seduction of Radha and he starts a war to fight against suspected people and places to find her from anywhere. It historicizes up to the killing of Kansa, the construction of Radha Bhawan, and historicizes Dwarka as a place for the never-ending memory of love and war that is well presented in the narratives. Throughout the knowledge of Mahabharata war readers can bring out the multiple meanings of the narratives pursued in Radha.

Dharabasi's Radha advocates against injustice and their fight for rights. Narratives go on about justice establishment connected with the mystery and myth of the Mahabharata war. In this regard, in the introduction part of the translated version of Radha, Mahesh Paudyal writes:

The largest part of the novel is a diary entry by Radha, Krishna's lifelong sweetheart, and it presents Krishna's story from her perspective. In doing so, the novel dispenses with most of the eulogies and divination culturally accorded to Krishna. From the realm of God, Krishna is brought down to the realm of a human male, and by that very token, all his mortal weaknesses as a man are exposed.

The novel opens with the author visiting an excavation site after hearing rumors that some metallic plates with an ancient and almost obsolete script have just been excavated by the Department of Archaeology at Keechak Badh, a site of mythological importance in Jhapa, the easternmost district of Nepal. (Radha 3)

Scripts of the metallic plates help to immortalize the archaeological history. This study tries to excavate the rumors of historical property through Sadhu's knowledge about an explanation of the scripture written in the metallic plates found in the Keechak Badh site of Jhapa. For the first time, the Department of History, Mechi Multiple Campus, Bhadrapur tried to excavate but failed to complete the investigation project because of an intervention of the Archaeology Department. Dharabasi tries to collect first-hand experiences with the archaeological authentication group but he fails for the first time in lacking information. The next year he visited there with the members of Archaeology Departments to observe the gold, silver, and other property kept in the heavy iron

structured box to investigate the old events concerning the present results based on those stored documents that help to historicize the things.

Metallic plate's scriptures were not so clear for everyone to understand and the Archaeological group took help from a sage. Regarding the difficulty in understanding metallic plate's scriptures and mythic of those archaeological things, Mahesh Paudyal in the introduction part of the translated version writes:

Amid utter confusion and loss, an old sage offers to read it, and the rest of the novel is the reading of the same, which is Radha's account of her and Krishna's life in fine detail. Incidentally, the reader happens to be Aswatthama, the accursed and immortal sage, who was wronged and cursed by Krishna way back in the Dwapar era and left to wander around the world carrying festering wounds on his forehead. This sage, who's the son of Guru Dronacharya, had sided with the Kauravas in the battle of the Mahabharata, and defeating him and his father was key to the Pandavs' success. Dronacharya, the father, was the architect of the Kaurava's war strategy, and so eliminating him was imminent for the Pandavas. Realizing this fact, the Pandavas created the rumor, that Aswatthama was dead, following which his father, Guru Dronacharya, died of shock. Enraged, Aswatthama butchered the five sons of the Pandavas while they were asleep to take revenge for the intrigue the Pandavas had restored, to eliminate Dronacharya. (Radha 3-4)

According to the recorded history, Ashwatthama/Drauni is the son of Drona and Kripi, grandson of the sage Bharadwaja to whom Dronacharya loves more than his own life and the rumor of his death made by the Pandavas shocked him a lot and he died. Ashwatthama is furious a lot as the Pandavas are the cause of his father's death and so as revenge, Ashwatthama murders the Pandavas and kills himself to realize to the Pandavas about the grievance of his own child's death. Observing from the mythic perspective, this researcher takes Radha not only as a story of romance, war, and reunion, he takes it also as the text of revenge as said in Gita, "If there is cheating there is no dharma" (43). The mythic of dharma continues from the pre-historical period up to now as it is shown in the love between Radha and Krishna that turns here to be a part of the war between Pandavas and Kauravas that creates disharmony among the people.

Krishna's study in Mathura and Radha's lonely living at Braja help each other to create

a space for a sustainable environment based on memory and experiences collection as a diary which becomes a source to rewrite the mythic indicators of the Mahabharata myth about love and war mythic. Distinctions and differences in dance, divination, religion, arts, culture, love, war, and renunciation are the researchable subjects in Radha. Bhima, Arjuna, and Byas's stories of Mahabharat epics interconnect and restore the Radha and Krishna stories related to the myth and mysteries of Mahabharata knowledge. The stories of Devaki and Basudev's son who killed the Kansa are called Krishna's success in war history about the myth. The setting of the novel makes coverage of three locations as writes Paudyal:

Braja, where Krishna and Radha spend much of their childhood; Dwarika, where Krishna establishes the new capital of this Kingdom; and Himvatkhanda, the region south of the Himalayas-a long stretch of land strewn across hills and plains-where Radha visits as a pilgrim.

The story that is set in Braja prepares the readers for two important developments: love between Krishna and Radha, and myths circumscribing Krishna that propel him to become a warrior and political personage. The rural, cow-rearing, and sylvan landscape of Braja provides ample opportunities for boys and girls to meet and mix prodigally among themselves, swimming in Yamuna, moving after cattle in Gokul, and organizing group dance called Raas Leela, usually in the region demarcated as Raas Mandal-the dancing ring. (Radha 6)

Stories of Krishna and Radha's birthplace and their homages in Braja and Dwarka (popularly known as Dwarika) make readers aware of the geographical attachments and the myth-makings. Kinship and the family-acquired status of men-women lineage exhibit exemplary roles as a "binding force acquired status leading as a backbone of family and society" (Alchoff 67). In Radha, it diverges to remain unmarried in her life as a secret revenge and/or love to realize the introspection. However, Radha is always the source of inspiration for Krishna's success which provides a sense of honor in every moment and she surrenders her love especially for Krishna's success though she rejects the path of homage, marrying and bearing the children.

In cultural connections, Krishna's rasa Leela with Gopini maids is a kind of "battle creator in each other's love-bound lives" (Appadura np). Roaming in the forest to search

for the eternity of love is an affectionate but unstable activity of the Gopini and Radha who spend the beautiful part of life in the illusive passionate activity of Krishna even in the time of his fighting with Kansa and study in Mathura. Radha goes to Mathura to meet Krishna but he is living there marrying Rukmini and keeping a relationship with other seven women who question Radha's trust in Krishna and the continuation of love in life that mistrusts social experiences. After the grievances, she goes to different places with Vishakha and later on, she roams in unknown places in Braja. She disguises herself and she rejects the socially and socio-culturally derogated path of life where people could see her.

After a long journey, Krishna built Radha Bhavan with the hope of staying with her. It is a "passion for love, gratitude, re-union and its eternity" (Barker 12). Krishna realizes that he had hurt her and now he has a self-realization. Krishna's weaknesses of the past and realization of the present in bearing family responsibility are presented wonderfully in Dharabasi's Radha. It is based on historical records and myth-making. It historicizes Krishna-Radha's connection in love to the path in Romeo-Juliet's love of Shakespearian drama and/or Muna-Madan love noted in Devkota's poem. The novel develops its plotline in the traditional pattern. Narratives capture the root cause of historical love on the one hand and archaeological investigations on the other hand. Love and romance stories show Krishna's immaturity and the building of the Radha Bhawan exposes Krishna's heroic activities in maturity. It shows his willpower and heroic attempt. Mohan Bahadur Kayastha writes, "Re-discovering life began with discovering the hero within" (Chalis Phanko Ghumepachhi 49). Kayastha's judgment shows Krishna's strength in love, war, and restructuring of the social structure. Hidden secrecies are exposed through myth-makings which this researcher has studied in detail.

Krishna is relatively romantic, travels to different places with Gopinis, and relaxes with them. He is irresponsible and weaker to care for Radha as a loved one even being in Braja and while staying in Mathura. He was involved in kidnapping Rukmini and eight other girls there in Mathura instead of studying well as Kayastha writes, ". . . in student life one should study attentively and while at work he should work sincerely. And at retired life, one should visualize what life is and this needs awakening" (50). Krishna seems moody as he forgets himself in romance and seems responsible as he tries to save the Gopinis and his followers. He rescues them from all kinds of dangers as a

helpful savior of the helpless but instead of leaving them independently, he is selfish in love and sex and so he marries them. Krishna in this sense seems unstable, selfish, and irresponsible character. In overall observation, Radha by Krishna Dharabasi is acclaimed to be a wonderful novel related to the myths of Mahabharata. The traditional plot of Radha elucidates multiple meanings related to the myth and mysteries. Readers must be aware of the dramatic expressions of the narratives that are difficult to understand. Evidence is enclosed dramatically and the narratives disclose many hidden things about the complex combination of the truths and myth-makings. Mythical characters have established their dignities that compromise for reconciliation, reunion, and integration. The narrator keeps them within the love-bound premises of geographical boundaries in the eastern part of Nepal. It is hard to answer all the questions regarding the ethical issues of the characters that are noted by the critics. One should think critically about the different perspectives of the social practices questioning how they are presented in the novel.

Methodological Application

Krishna Dharabasi's Radha is studied in a comparative method in this paper. Historical documents of the archaeological things are compared with myth-making. Krishna's love and war policies are studied as a part of pre-historical practices on the one hand and Radha's struggle to succeed in love is studied as a social practice on the other hand. Radha decides not to marry her life in the lack of Krishna's homage caring. Krishna is far away in Mathura for his study but Radha doubts his doing and saying. Radha thinks that Krishna loves her by heart and she is only beloved of him but she gets ashamed when she knows that he has love and romance with several Gopinis that hurt her. Radha's expectations were beyond her reach and she thought it better not to marry as a looser of real love in life. She wants to kill the unfulfilled dreams and desires of love in revenge for unlimited passion. On the other hand, Kunti and Madri have hidden secrecies in their sons' birth that are studied in a comparative method in this paper to analyze Kunti and Madri's maternity. The war in love and life is like the wars of Kurukshetra, Mathura, Himalayan Heritages, and the inauguration of Dwarka as Krishna's city to end the long live enmity of Kauravas and Pandavas. Krishna and Balaram's war strategies are to kill Kansa and expose the long-lasting power in the Kuru Kingdom.

Dharabasi's Radha makes coverage of the same historical documents, local narratives, and myth-making. In the mythical reference, Marshall Sahlins acclaims, "thy myth is fundamental. Without attempting an extensive analysis or comparison between variants, I shall underline a few allusions pertinent to the present discussion" (Sahlins 11). Sahlins views that mythical things can be cross-matched with historical records. This researcher analyzes the things observed from multiple perspectives. This paper focuses on archaeological documentation of historical places, people, things, etc. and it is studied in a comparative method. The comparative study method studies the things, people, and places observing from multiple perspectives. In this regard, Susan Bassnett writes, "Comparative Literature seems to have derived from a methodological process applicable to the sciences, in which comparing and contrasting served as means of confirming a hypothesis" (Comparative Literature 17). Bassnett creates a comparative road map to study the historical and mythical things from scientific investigation. Unlike Bassnett, French scholars like Guillen try to apply the binary concepts between the two authors and their ideologies. In contrast "American school argued for wide cross-disciplinary comparison" (143). Scientific discoveries and investigation of archaeological things' re-structures to the concept of myth makings. Guillen writes, ". . . it is a branch of literary investigation involving systematic study of supranational assemblages" (16). Supranational assemblages investigate things from mythical perspectives and so Dharabasi's Radha is studied from multiple perspectives in a comparative method.

Result and Discussion

The story of Radha and Krishna in Radha is narrated from Radha's perspective which captures her struggling stories with the tension of love and war where she lives fighting with them. The novel shows every difficulty of Radha but it fails to explain the difficult journey of Krishna. It excavates the weaknesses of Krishna and elides the darkness of Radha. After Krishna's stay in Mathura, he fought and defeated Kansa but Radha was defeated in the world of love and life in lack of inspiration for living on the one hand and Krishna's enjoyment with Rukmini and Gopini on the other hand. Dharabasi stands against the patriarchy, misogyny, and religious dogma principled in Hindu mythological texts.

The stories are interlinked in connection to the Mahabharata-based mythic to answer hundreds of questions raised by them in a simple yet profound language through myth-making. Kayastha quotes Jagadish Samsher Rana:

Man, shining light in habitation
Has a thousand heads, and feet,
He covers the earth on all sides,
Rules supreme over inner space. (Chalis Phanko Ghumepachhi 53)

The concept of war, love, and relationship in Radha develops over the reality that we are facing in the present time in our own lives. Concepts of an enamored environment oppose the obsessed criticisms and biased stories that the narrator incorporates in the plot developments. Stubborn and lovelorn the female characters are hopefully exposed as defiant, and wise. They are praiseworthy than other events exposed in the novel. Religious beliefs and cultural practices of Hindu mythology are the center of attraction in Dharabasi's Radha.

Santa Rampal Das Maharaj takes Radha-Krishna love stories as a complex part of the Mahabharata myth-making. Das takes the stories differently than the usual practices of society. Krishna handles the situation himself but Radha seems always hopeful for Krishna's love, care, and help. Her trust and doubt both are questionable as she changes her decisions time and again. Her devotion to Krishna turns to the homage to caring for the displaced situation as said by Santa Rampal Das Maharaj, "We were completely displaced . . . turned well" (Gnyan Ganga 284, Trans. is mine). Radha exposes the endurance and sacrifice from the thought-provoking process behind how women were oppressed and they should work hard for themselves as written in Way of Living, "to resettle the life after death is like joining the fallen leaves to the same branch and so it is impossible" (Maharaj 4, Trans. is mine). Critics of Dharabasi's Radha view that Radha is a part of Hindu mythology that discusses in the part of Puran and it presents the narratives from Radha's point of view.

Radha-Krishna's love stories begin from their teenage days and they seem excited about love and life practices. Their love stories could be parts of myth-making to the others who are victims of unsuccessful love. The myths are connected to the dreams and desires of unfulfilled love in life. Women characters like Kunti, Madri, Radha,

Susila, Bishakha, and Rukmini seem to be victims of this social structure as shown in the Mahabharata myth. The histories of both the socio-cultural practices and myths are noted in Radha.

Mahabharata myth is connected to the narratives of Radha. The narrator interlinks the women's suffering and their ignorance. Their unplanned attempts and/or weaknesses in preparing the roadmaps of life invite war. Among the multiple stories; the birth, growth, and war strategies of Pandavas and Kauravas are narrated interestingly. The narrator pursues us not to fight and kill the people. According to Gita, we should live in a brotherhood relationship as Santa Rampal Das writes:

Kauravas and Pandavas are the sons of two brothers but they stood in Kurukshetra to murder each other for ruling the kingdom and winning the property whereas Arjun glanced towards Bhismapitaji, Guru Dronacharya, children of Kauravas, relatives, sister-in-law, father-in-law and he decided to eat begging rather than going to the war, fighting and killing them as he knows that the life is too short. Arjuna left the arrows of Dhanush and Baad. He went to the back of Rath and sat there. As Krishna said to look at the front and asked "Who are you to fight with?" Arjuna answered that he doesn't like to go to war at any cost. (Gita Yours Knowledge Amrit [Divine Spirits]10)

According to the knowledge of Gita, day-to-day activities and the planning of life should be managed in a brotherhood relationship. Family bonding and intimacy with close relatives is worthy enough and so it is better to loosen many things rather than fighting with them. Like the Knowledge of Gita, Dharabasi's Radha conveys to us the meanings of togetherness, the pain of being far away from a loved one, and the struggle of life.

The novel also points out that women themselves are not doing justice to their daughters and daughters-in-law as they stand against them and they try to capture/control them from the self-help thinking and taking the decisions about their voices and versions. They are strongly guided by social practices and turn them to the difficult modes of life to make the final decisions for their success/unsuccess. For example, Kunti's mother is so hard and she makes the strong decision not to let her go outside the home. She tries to control her daughter within the traditional boundaries of marrying and bearing children. Kunti is guided by traditional beliefs and she tells Draupadi to be the Pandavs' common

wife. Incorporating the archaeological history and love stories together, the narrator interlinks the war of the Mahabharata to show the social disharmony that is still in practice. Radha states that it is not a Dharma Yudhha but it is men's struggle for power. People are exercising their power and they are inviting the wars in this way or that way. Keeping these facts in mind, this researcher questions divinity that exhausts everyone compelling to follow the tradition. Traditional practices are parts of myth makings and they talk about different directions in the way out of life. Radha-Krishna love, war, and renunciation are the parts of social practices that re-cycle our day-to-day activities.

Conclusion

In conclusion, Dharabasi's novel Radha begins with the stories of an innocent but amusing Krishna who enjoys with music of Bashuri that he sings himself. The plot of the novel develops with archaeological investigations that they found written in metallic plates and kept in a large iron box that was found after excavation in Keechak Badh, Bajra. The role of Sadhu is highly praiseworthy in discussing history and its myth-making. Sadhu reads, researches, and explains the meanings of metallic scripts found in Braja. Radha discloses the myth and mystery of Radha-Krishna love, romances, and Rasa lila that Krishna does with Gopinis in Braja and Mathura roads by the side of dense forests on the one hand and Krishna-Kansa War in Mathura/Kurukshetra on the other hand. It interconnects the stories of Braja, Mathura, Kurukshetra and the Keechak Badh places from the birth of Krishna as the eighth child of Basudev-Devaki to whom Basudev exchanged with the daughter of Nanda Ray and Yashoda to save him from the attack of Kansa who killed their seven children. Radha's struggle in life is a source of inspiration to other women to settle their lives with courage even in the difficult modes of life, too, as does Radha.

Works Cited

Alchoff, Martin Linda. *Invisible Identities*. Oxford University Press, 2005.

Appadurai, Arjun. *Modernity at Large: Cultural Dimension of Globalization*. University of Minessota Press, 1996.

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths, and Helen Tiffin. *The Empire Writers Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literature*. Routledge, 1989.

Barker, Chris. *Cultural Studies: Theory and Practice*. Sage, 2000.

Bassnett, Susan. *Comparative Literature: A Critical Introduction*. Blackwell, 1993.

Bernheimer, Charles, edt. *Comparative Literature in the Age of Multiculturalism*. Johns Hopkins UP, 1995.

Culler, Jonathan. *Comparative Literature, at Last!* Bernheimer 117-121.

Dharabasi, Krishna. *Radha: Love, War, and Renunciation (a novel)*. Trans. Mahesh Paudyal, Pairavi Book House Pvt.Ltd., 2019 AD.

- - - . *Radha*. Sajha Prakashan, 2067 BS.

Ferrie, David W. "Why Compare?" *A Companion to Comparative Literature*. Edt. Behdad, Ali and Dominic Thomas. Blackwell Pub. ltd, 2011. 28-45.

Foucault, Michel. *The History of Sexuality vol,1*. The Random House, 1978.

- - - . *The Order of Things: An Archaeology of the Human Science*. Pantheon Books, 1970.

Guillen, Claudio. *The Challenge of Comparative Literature*. Trans. Cola Tranzen. Harvard UP, 1993.

Gupto, Arun. *Discourse on: Literature and Culture*. Educational Publishing House, 2009.

Jost, Francis. *Introduction to Comparative Literature*. Pegasus, 1974.

Kayastha, Mohan Bahadur. *Chalis Phanko Ghumepachhi*. Kayastha Sewa Sadan, 2072 BS.

Maharaj, Ramdevananda. *Way of Living*. Satlok Ashram, 2016 AD. www.jagatgururampalji.org

Maharaj, Santa Rampal Das. *Gita Yours Knowledge Amrit (Divine Spirits)*. Satlok Ashram, 2012 AD. www.jagatgururampalji.org

- - - . Gnyan Ganga. Satlok Ashram, 2012 AD. www.jagatgururampalji.org

- - - . *Danger of Aandha Shraddha Bhakti*. Satlok Ashram, 2014 AD. www.jagatgururampalji.org

Miller, Jean Baker. *Toward a New Psychology of Women*, Beacon, 1976.

Pratt, Mary Louise. *Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation*. Routledge, 1992.

Said, Edward. *Culture and Imperialism*. Vintage, 1994.

- - -. Orientalism: *Western Conception of the Orient*. Penguin, 1991.

Sahlins, Marshall. *Historical Metaphors and Mythical Realities: Structure in the Early History of the Sandwich Islands Kingdom*. Michigan Press, 1981.

Sen, Amartya. *Reason before Identity*. Penguin Books Ltd. 2005.

Solanki, Parul. *"Orientalism- Characteristics of Orientalism."* http://buzzle.com/.../orientalism- of-orientalism.htm/.

BL College Journal
https://doi.org/10.62106/blc2024v6i1e7
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -VI, Issue-I, June 2024
Pp. 189-202

An Exploratory Study on Status, Prospects and Challenges of Tourism Industry in Telangana State, India

Dr. Sukanta Sarkar

Dr. Sukanta Sarkar
Associate Professor
Department of Economics
Gambella University, Ethiopia
e-mail : sukantaeco@gmail.com

Abstract

The paper titled 'An Exploratory Study on Status, Prospects and Challenges of Tourism Industry in Telangana State, India' discussed status, prospects and challenges of tourism industry in Telangana. It has found that Telangana is renowned for its temples, forests, waterfalls, forts, monuments and historical places. Hyderabad is famous for Charminar and the fort of Golconda. There are multitude of bazaars, churches, temples and masjids. Telangana has many stunning and revered temples. They are famous for their architectural grandeur, spiritual and historical significance. They are symbolic of the tradition prevalent and secular culture. There is bright scope of religious tourism. Hyderabadi Biryani is the crown jewel of Telangana's culinary repertoire. Cuisine in Hyderabad are influence of Muslim Nizams and also imparts Arab and Persian influence. There are around 33 tribes in the state. Around 12 tribes have been identified as Primitive Tribal Groups. The state has positive prospect in rural tourism, agricultural tourism, heritage tourism, eco-tourism, cultural tourism, advantages tourism, sports tourism, and agro-tourism. Growth of medical tourism is also impressive. Despite the challenges posed by the pandemic, domestic tourism has shown a steady recovery. Tourism is a growing industry. It has contributed more in the economy of the state. Therefore, tourism department should implement proper strategies for mitigating challenges before the tourism industry of the state.

Keywords

Food, Hospitality, Hotel, Travellers, and Tourism

Introduction

Tourism is a growing industry in developed and developing countries. It has changed scenario of the world. It benefits government and people that live in local area. It also creates employment opportunities for locals and help the government to earn currency. Government uses this income for development and growth of the nation. It is very productive activity both for the government and tourist. The beauty of the natural sites and cultural heritage makes India a paradise of tourism. Atithi Devo Bhava' (Guest is God) is the cultural tradition of India. Indian handicrafts, particularly brass work, leather goods, jewellery, and carpets, are the major buying objects for foreign tourists.

India is a diverse country with multiple culture and religion. Southern India is the combination of the five states and three union territories. It is mostly located on the Deccan Plateau. It is bordered by two mountain ranges, namely Eastern Ghats, and Western Ghats. The five states in Southern India are Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Tamil Nadu and Karnataka. The three union territories are Lakshadweep, Pondicherry and Andaman and Nicobar Islands. Bangalore, Chennai, Coimbatore, Hyderabad, Kochi, Madurai, Mysore, Pondicherry, and Thiruvananthapuram are the most notable cities in the region. Hampi, Tirupati, Thanjavur, Backwaters of Kerala, Havelock Island and Kodaikanal, and Ooty are the popular tourist destinations.

Telangana was ruled by the Qutb Shahi dynasty and Bahmani Sultanate. Hyderabad State became a part of the Indian Union after Independence of India. Initially Telangana was part of Andhra Pradesh, but separated from Andhra Pradesh in 2014 and became 29th state of India. 2nd June is celebrating as Telangana Formation Day. It has diverse political, economic and social system. State is well connected by road, rail and airways. It has a rich tradition in painting, classical music and folk arts. It has diverse religious worship centres. The state has emerged location of IT software companies and service sector firms. It is a mineral-rich state. It has a range of tourist attractions including waterfalls, forts, monuments, historical places, forests and temples.

Objectives

The main objectives of this paper are: (1) to study the trends of domestic and foreign tourist arrivals in Telangana, (2) to examine prospects of tourism industry in Telangana, and (3) to evaluate challenges before the tourism industry in Telangana.

The Study Area

Telangana is situated on Deccan Plateau in southern region of India. It is located in the eastern part of Deccan Plateau. It was created in 2nd June 2014 after separated from United Andhra Pradesh. Its geographical area is 112,077 km^2 and density of population is 312/km^2. Telugu and Urdu are the official languages. According census 2011, total population of the state was 35,003,674 consisting rural and urban population are respectively 61.12 percent and 38.88 percent. It is divided into 33 districts. Hyderabad is the capital and the largest city. It is famous as 'City of Pearls.'

Methods and Materials

- **Design and Approach**: This study is descriptive in design and has utilized qualitative approach. Secondary data for the study has been collected from various govt. reports, Telangana tourism website, report of international agencies, research papers, published or unpublished thesis's, articles, etc.
- **Method of Analysis**: To reveal the tourism practices in general and the future prospects in particular, method of quantitative and qualitative analysis

comprising of descriptive analysis, regression, content and text analysis have been performed.

- **Hypothesis**

  H_{01}: There is no impact of corona pandemic on tourist arrivals in Telangana.

  H_{1a}: There is impact of corona pandemic on tourist arrivals in Telangana.

  H_{02}: There are no relation between arrivals of tourist and gross state domestic product of Telangana.

  H_{1b}: There are relation between arrivals of tourist and gross state domestic product of Telangana.

Review of Literature

Chandramouli (2016) evaluated the problem and challenges of tourism industry in Telangana. Such industry has multiplier effect on the economy. Tourist demands in the state depends on the demographic, socio-cultural and socio-structural developments. According Venkatesh and Raj (2016), government should formulate and design policies for travel industry. It will help for minimizing the challenges and constrains of tourism industry in Telangana. Anawade and Bendale (2017) discussed the important of hotel and accommodation industries for the growth of tourism industry. It rises employment opportunities. It raises opportunities for healthy competitiveness. There are more prospects for development of tourism industry in south Indian states due to the beautiful landscapes and long coastal lines. Vijay (2017) in his research paper analysed the various impacts of ecotourism on Koya tribal community people of Jayashankar district of Telangana state. Ecotourism is vital for economy of the region. Responsible ecotourism is the cultural integrity of local people.

According Manju (2018), southern states of India has opportunities for development of tourism industry. In this regards Kerala is more ahead than the other states in the region. Jansirani and Priya (2018) in their report examined the relation between tourism and economic development in south Indian states. The analysis concluded that tourism industry does not create any negative impact in the study area. Krishnudu et. al. (2019) in their paper found that tourism is important industry in Telangana. It has vital

role in employment and recreational activities of the people. Chowmahalla palace is a popular destination in the state. Tourist activities are increasing but cost of travelling is a concerning matter for the domestic travellers. Athma and Nalini (2019) in their paper completed the comparative analysis of the ecotourism initiatives and projects in Andhra Pradesh and Telangana. Andhra Pradesh is known for its lush green forest, social places of worship and pristine beaches. Telangana has many beautiful historic places and temples.

From the article of Kumar (2020) we found that restaurants, lodging and transport are vital for the growth of the tourism industry. Government should implement projects for improvement of tourist infrastructure. Akula (2000) in his paper discussed the potentiality of tourism industry in Hyderabad city. Hyderabad has better transport facilities and well connected with other parts. Accommodation influence the selection of tourist site. Role of tour operators/agencies/guides are also important. Accordingly, Padmini (2022), foreign direct investment is vital for expansion of the tourism industry in Telangana. Travel & Tourism industry is related to the contribution to its GDP and employment generation. Tax holidays and proper tourism policy is significant for growth of the foreign direct investment in such industry.

Results and Discussion

Telangana is renowned for its rich cultural legacy, ecological diversity, breath-taking scenery, and natural resources. It has temples, forests, waterfalls, forts, monuments and historical places**.** Rivers in the state are crucial for the economy. Bhima, Manjira, Musi, Krishna and Godavari are the major rivers. Godavari and Krishna rivers are originated from Western Ghats of Maharashtra. Hyderabad city is situated in the bank of Musi River. It has most stunning and ecologically significant water features. It has more than 6000 man-made and natural lakes. They are vital for the ecosystem and provides a habitat of many plants and animals. Travellers can involve in leisure activities like bird watching, fishing and boating. Some prominent lakes are Hussain Sagar Lake, Osman Sagar Lake, Himayat Sagar Lake, Shamirpet Lake, Durgam Cheruvu lake, Kotpally Reservoir lake, Singur Dam lake, Nizam Sagar Dam Lake and Pocharam Reservoir lake.

Hussain Sagar Lake was constructed in 1562. A statue of Lord Buddha is situated in its center. It is situated in the center of Hyderabad. Osman Sagar Lake was constructed on Musi River. It is a man-made reservoir. Himayat Sagar Lake is an artificial lake located around 20 kilometers from Hyderabad. Durgam Cheruvu is a natural lake situated in center of Hyderabad. Kotpally Reservoir lake is a man-made lake situated on the Kagna River. Singur Dam is built on the Manjeera River and located around 70 kilometers from Hyderabad. Visitors can enjoy the boat trip on the lake, breath-taking views of the surroundings, and. fresh breeze. Motels and hotels are found near the lake. They are the best destination for weekend tour. Kayaking, swimming, and boating are available in majority of the lakes.

Table 1: Religion and Languages in Telangana

Religion	Percentage (%)	Language	Percentage (%)
Hinduism	85.09	Telugu	75.51
Islam	12.69	Urdu	12.32
Christianity	1.27	Lambadi	5.55
Buddhism	0.09	Marathi	1.77
Sikhism	0.09	Hindi	1.52
Jainism	0.08	Others	3.33

Source: Census Report 2011.

The table-1 shows the religion and languages in Telangana. It has found that Hinduism is the main religion in the state followed by Islam and Christianity. Majority of the people on the state speak in Telugu language. It is the official language. Urdu is the second official language and popular among the Muslim people. Lambadi is a western Indo-Aryan language. It is the language of Banjara people across India.

Major mountains and hills of Telangana are Kandikal in Peddapally, Ananthagiri hills in Vikarabad, alaghat range in Mahaboobnagar, Sathmala range in Adilabadand Jayashankar and Rakhi hills in Jagitial districts. Goli Gutta is the Highest Peak Mountain. Kuntala Waterfall, Bogatha Waterfall, Ethipothala Falls, Pochera Waterfalls, Mallela Theertham Waterfalls, Bheemuni Paadam Waterfalls, Sahastrakund Waterfalls, and Gayathri Waterfalls are popular among the travellers. The popular caves in the state are Pandavula Guhalu, Kadali Vanam Cave and Gurralagutta Caves. Hyderabad, Warangal, Nizamabad, Khammam, Karimnagar and Ramagundam are the major cities.

Table 2: Arrivals of Domestic and Foreign Tourists in Telangana

Year	Tourist		% Share		Rank	
	Domestic	Foreign	DTV	FTV	DTV	FTV
2014	72399113	75171	5.61	0.33	6	20
2015	94516316	126078	6.60	0.54	6	18
2016	95160830	166570	5.90	0.67	7	18
2017	85266596	251846	5.16	0.94	6	16
2018	92878329	318154	5.01	1.10	6	15
2019	83035894	323326	3.58	1.03	8	15
2020	39997001	46694	6.55	0.65	5	16
2021	32000620	5917	4.72	0.56	6	16

Source: India Tourism Statistics, 2011-2022.

Table-2 discussed the tourist arrivals in Telangana. It has been found that number of tourist are increased, but was declined in 2020 due to the corona pandemic. Domestic tourist arrival was more than 8.30 crores in 2019, but it was dropped to only 3.99 crores in 2020, and was further declined to 3.20 crores in 2021. On the other hand, foreign tourist arrivals were 3.23 lakhs in 2019, and it was just 46.69 thousand in 2020, and was only 5917 in 2021. State witnessed an increase in domestic tourists during 2021-22 to 2022-23. Nearly 89.84 percent domestic tourist and 1056.01 percent foreign tourist was increased during the period. Lockdowns, and travelling restriction due to the corona pandemic is the main factors behind the sudden drop of the tourist arrivals. Therefore, *the null hypothesis-1 is rejected and alternative hypothesis is accepted*, i.e. there is impact of corona pandemic on the domestic and international tourist arrivals in Telangana.

Hyderabad is famous for Charminar and the fort of Golconda. There are multitude of bazaars, churches, temples and masjids. The popular other places in the city are Ramoji Film City, Wonderland Hyderabad, Birla Mandir, Salar Jung Museum, Calvary Temple, Taj Falaknuma Palace, Chilkur Balaji Temple, Chowmahalla Palace, Shri Jagannath Temple, Nehru Zoological Park, Peddamma Temple, Hare Krishna Golden Temple, Lumbini Park, Jalavihar Water Park, Sanghi Temple, and Qutb Shahi Tombs. Warangal is the second largest city. The popular tourist destinations in Warangal are Bhadrakali Temple, Ramappa Temple, Thousand Pillar Temple, Sri Vidya Saraswathi Shani Temple, Ramappa Lake, Kulpakji, Warangal Fort, Laknavaram Cheruvu, Pakhal Lake, Eturnagaram Wildlife Sanctuary and Govindarajula Gutta Hill.

Nizamabad is the 3rd largest city of Telangana. The city is popular for Handloom Products and Armoor Silk Sarees. Sarangpur Hanuman Temple, Ali Sagar Reservoir, Dichpalli Temple, Rudrur Lake, Sri Dattashram, Kanteshwar Temple, Pocharam Wildlife Sanctuary, Sri Neelakanteshwara Shrine and Quilla Temple are the popular tourist places of Nizamabad. Sri Venkateswara Swamy temple at Jamalapuram and Narsimha swamy temple in Khammam town so called Telangana Tirupati. Narsimha Swami Temple, Khammam Fort, Palair Lake, Kaman Bazaar, Jammalapuram Temple, Gandhi Chowk, Nelakondapalli and Kinnerasani Wildlife Sanctuary are the famous tourist destinations in Khammam. Karimnagar city known for Vedic learning from ancient times. Popular tourist places of the city are Kondagattu Anjaneya Swamy Temple, Kotilingala, Ramagiri Fort, Molangur Fort, Jagityal Fort, and Kaleshwaram. Ramagundam city is known for thermal energy.

Table 3: Tourist Destinations in Selected Districts of Telangana

District	Popular Tourist Places
Adilabad	Kuntala Water Falls, Pochera Water Falls, Jainath Temple, Gayatri Waterfalls, and Nagoba Jatara Keslapur.
Mancherial	Gudem Gutta Satyanaraya Swami Temple, and Gandhari Khilla
Nirmal	Sri Gnana Saraswathi Temple Basara, and Kadam Dam
Nagarkurnool	Kollapur Fort, Hazrath Niranjan Shah Wali Dargah, Mennonite Brethren Church, and Uma Maheshwaram.
Mahabubnagar	Pillala Marri Tree, Pedda Cheruvu, Koilkonda Fort, Megalit Burials, Sri Sangam of Krishna and Bheema Rivers.
Narayanpet	Sri Padamati Anjaneya Swamy Temple, Makthal, and Naraynapet
Vikarabad	Anantha Padmanabha Swamy Temple, Ananthagiri Hills, Vikarabad.
Ranga Reddy	Ramoji Film City, Wonderla, Jeeyar Integrated Vedic Academy.
Nalgonda	Pachala Someswar Temple, Meenakshi Agasteswara Swamy Temple.
Suryapet	Peddagattu jathara, Pillalamarri, Phanigiri, Yoga Narasimha Swamy Temple, Jan Pahad Dargah, and Arvapally Dargah.
Mahabubabad	Kuravi Veerabhadra Swamy Temple, Bheemuni Paadam Waterfalls.
Khammam	Lakaram lake, Palair Lake, Wyra Reservoir, Jamalapuram, Kallur. Sri Bhakta Ramadasu Smaraka Mandiram, Khammam Fort, Kusumanchi.
Mulugu	Bogatha Waterfall, Laknavaram Lake, Hemachala Lakshmi Narsimha Swamy, Medaram Jathara, Ramappa Temple.
Hanamkonda	Thousand Pillar Temple, Warangal Fort, Bhadrakali Temple, Khush Mahal, Kakatiya Rock Garden, Kakatiya Musical Garden, Padmakshi Temple.

Jangaon	Palakurthi Someshwara Temple, Bammera Pothana, Jeedikal Temple.
Sangareddy	Manjeera Sanctuary, Singoor Project, Manjeera Reservoir, Kondapur Museum
Pedapalli	Sabbitham Water falls, Ramagiri Fort, Buddist Stupa Dhulikatta, Ramagundam.
Kamareddy	Sri Siddirameswara Swamy temple, Sree Kalabhairava Swamy Temple, Sri Sai Baba Temple, Ayyappa Swamy Temple, Trilinga Rameshwara Temple.
Siddipet	Sri Vidya Saraswathi Shaneeshwara Temples, Lakudaram Lake, Shanigaram Reservoir, Nagadevatha Temple, Sri Saraswathi Kshetramu Main Temple.
Medak	Sri Chamundeshwari Devi Temple, Kuchadri Venkateshwara Swamy temple, Pocharam Reservoir Lake, Medak Fort, Edupayala Temple, Cathedral Church.
Karimnagar	Lower Manair Dam, Telangana's 2nd tallest flag pole, Deerpark-Karimnagar.

Source: https://www.telangana.gov.in/about/districts/

Table-3 depicted tourist destinations in selected districts of Telangana. There is bright scope of religious tourism in the state. They are symbolic of the tradition prevalent and secular culture. All Saints Church, CSI Garrison Wesley Church and St. Thomas (SPG) Tamil Cathedral are the popular places in Secunderabad. There are many churches in Hyderabad. Francis Xavier Church, Wesley Church, John's The Baptist Church, Mary's Church, Millennium Methodist Church, Alphonsus Catholic Church, All Saints Church, Thomas Mar Thoma Church, Centenary Methodist Church, Joseph's Cathedra and George's Church are the popular churches in the city. Makkah Masjid or Mecca Masjid is the largest mosque in Hyderabad. It is located near the Char Minar. Other popular Masjid in Hyderabad are Masjid-E-Akhtarunissa Begum, Jama Masjid. Mian Mishk Masjid, Khairtabad Mosque, Musheerabad Masjid, Kulsum Begum Masjid, Masjid Mir Mahmood Shah, Shahi Masjid, Hayat Bakshi Mosque, Toli Masjid, Spanish Mosque and Charminar.

Telangana has stunning and revered temples. They are famous for their architectural grandeur, spiritual and historical significance. Bhadrakali Temple, Thousand Pillars Temple, Lakshmi Narasimha Temple, Manyamkonda Sri Lakshmi Venkateshwara Swamy Temple, Ramappa Temple, Sita Ramachandra Swamy Temple, Peddamma Temple, Balkampet Yellamma Temple, Jagannath Temple and

Birla Mandir are the popular temples to visit in Telangana. Ramappa Temple is the first world heritage site in the state. It is also known as Kakatiya Rudreswara Temple. Nearly 25 percent land in the state is covered by forest. Popular wildlife sanctuaries in the state are Eturnagaram Wildlife Sanctuary, Manjira Wildlife Sanctuary, Pranahita Wildlife Sanctuary, Pocharam Wildlife Sanctuary, Kinnerasani Wildlife Sanctuary, Nagarjunsagar-Srisailam Tiger Reserve, Shivaram Wildlife Sanctuary, Kawal Wildlife Sanctuary and Pakhal Wildlife Sanctuary. Telangana is famous for handicraft items.

Table 4: Number of visitors to centrally protected ticketed ASI monuments in Hyderabad

Monuments	2020-21		2021-22		% Growth	
	Domestic	Foreign	Domestic	Foreign	Domestic	Foreign
Charminar	297548	182	440549	648	48.1	256.0
Golconda	527096	912	946972	1511	79.7	65.7
Warangal	64339	54	85946	106	33.6	96.3
TOTAL	888983	1148	1473467	2265	65.7	97.3

Source: India Tourism Statistics, 2022, p.150.

Table-4 Shows the number of visitors to centrally protected ticketed Archaeological Survey of India monuments in Hyderabad. It has found that the number of tourist are increased during 2020-2022. Golconda Fort attracts the highest number of tourist followed by Charminar and Warangal. There are showrooms, malls and markets in Hyderabad. Malls in Hyderabad include GVK One, Shoppers Stop, Inorbit mall, South India Shopping Mall, Hyderabad Central, and Babukhan mall are popular for shopping. White Pearls, Pochampally Sarees, Nirmal Toys and Paintings, Kondapalli Toys, Banjara Embroidery, Brass Art Ware, and Cherial Folk Paintings are the local handicraft items. Cherial Folk Paintings are drawn on cardboard, plywood or paper. Designer embossed pearl bangles, chandbalis with pearls, multi-colour pearl chains, pearl sets and Pearl stones are available in Hyderabad.

Telangana cuisine are non-vegetarian and vegetarian dishes. Pachi Pulusu, Sarva Pindi, Golichina Mamsam, Vankaya Pulusu, Shikampuri Kebab, and Shahi Tukda are the popular dishes. Hyderabadi Biryani is the crown jewel of Telangana's culinary repertoire. Cuisine in Hyderabad are influence of Muslim Nizams and also imparts Arab and Persian influence. Dosa, upma, vada and idli are popular dishes in breakfast.

Telengana is also well-known for the diverse tribal culture and languages. There are around 33 tribes in the state. Around 12 tribes have been identified as Primitive Tribal Groups. Koya, Mukha Dora, Lambada, Manne Dora, Gonda, Gadaba, Konda Dora, and Savara are major tribal communities. Perini Sivatandavam, Mathuri, Lambadi dance, Dappu dance, Dhimsa dance, and Gussadi dance are unique folk dances. Let's we study the regresstion between the arrivals of tourists and Gross state domestic product in millions INR between 2014-15 to 2021-22.

Table 5: Total tourist arrivals and Nominal GSDP of Telangana

Year	Tourist Arrivals (Domestic + Foreign)	Gross State Domestic Product*
2014-15	72474184	5,058,490
2015-16	94642394	5,779,020
2016-17	95327400	6,583,250
2017-18	85518442	7,500,500
2018-19	93196483	8,574,270
2019-20	83359220	9,500,900
2020-21	40043695	9,428,140
2021-22	32006537	11,289,070

Source: India Tourism Statistics, 2011-2022. Note: *GSDP in millions.

Table 5 (a): Summary Output

Regression Statistics	
Multiple R	0.644549836
R Square	0.415444491
Adjusted R Square	0.318018573
Standard Error	1745472.898
Observations	8

Source: Calculated by Author

Table 5 (b): ANOVA Analysis

	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*
Regression	1	1.29917E+13	1.29917E+13	4.26420915	0.084470337
Residual	6	1.82801E+13	3.04668E+12		
Total	7	3.12717E+13			

	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*
Intercept	12022757.33	2060011.771	5.836256616	0.001114687
Tourist Arrivals	-0.054425312	0.026356132	-2.064996163	0.084470337

Source: Calculated by Author

The table (5-a) shows that R square is found to be 0.415, showing, that the degree of relation between the independent variable X, i.e. arrivals of tourists, and the dependent variable Y, i.e. gross domestic product is average or normal. Table (5-b) shows that p value (0.08) is higher than critical value at 5% level of significance ($p > 0.05$), therefore we will accept the null hypothesis-2. So, it is concluded that there is no relation between tourist arrivals and gross domestic product in Telangana

Telangana has rich history and topography with a variety of tourist destinations. It has potentiality to become a tourist destination in India. The state has won the National Tourism Awards held in New Delhi in September 2022 in four categories presented by Government of India at World Tourism Day celebrations. The categories are Best Golf Course (Hyderabad Gold Club), Best Medical Tourism Facility (Apollo Hospitals), Best State (Comprehensive Development of Tourism), and Best Railway Station (Secunderabad Railway Station). State govt. also promoting tourism through building safe and hygienic hospitality infrastructure, supporting festivals and pilgrimages. Tribal Circuit, Mulugu, Heritage Circuit, and Eco-Tourism Circuit are the major tourism circuits in the state.

The state has positive prospect in rural tourism, agricultural tourism, heritage tourism, eco-tourism, cultural tourism, advantages tourism, sports tourism, and agro-tourism. Growth of medical tourism is impressive. But, there are also challenges before the tourism industry. Lack of media & print coverage, lack of basic hygienic amenities, poor administration & management, lack of passionate and trained guides, lapses in security and safety, lack of alternatives means of transport are the challenges before the industry. Despite the challenges posed by the pandemic, domestic tourism has shown a steady recovery. Tourism is a growing industry. It has contributed more in the economy of the state. For discussing the current overview of tourism industry of Telangana, we have done the SWOT analysis.

Table 6: SWOT Analysis of Tourism Industry in Telangana

Strength	**Weakness**
Hospitable people	Insufficient transport facilities
Rich history and heritage	Lack of fund for development
Scenic beauty of the nature	Complexity in tourism policies
Unique culture	Lack of adequate infrastructural support
Opportunities	**Threat**
World class knowledge centre	Environmental factors
High potential for eco-tourism	Stiff competition from other states
Improvement of medical facilities	Lack of safeguard
Scope on Research and Development	Lack of private sector participation

Conclusion

Telangana is a beautiful state in South India. Hinduism is the main religion in the state followed by Islam and Christianity. Majority of the people on the state speak in Telugu language. It has temples, forests, waterfalls, forts, monuments and historical places. Rivers in the state are crucial for the economy. Arrivals of tourist are increased continuously since 2014, but was declined in 2020 due to the corona pandemic. Lockdowns, and travelling restriction due to the corona pandemic is the main factors behind the sudden drop of the tourist arrivals Hyderabad is famous for Charminar and the fort of Golconda. There are a multitude of bazaars, churches, temples and masjids. There is bright scope of religious tourism in Telangana. They are symbolic of the tradition prevalent and secular culture. There are many churches in Hyderabad. Telangana has many stunning and revered temples. They are famous for their architectural grandeur, spiritual and historical significance.

There are also challenges before the tourism industry. Lack of media coverage, lack of basic hygienic amenities, poor management, lack of trained guides, lapses in security, lack of alternatives means of transport are the challenges before the industry. Telangana State Tourism Development Corporation is working for development of infrastructure, conveyance and other facilities for the tourists. State government is implemented comprehensive tourism policy for preservation and promotion of

architectural wonders, reservoirs and temples. Tourism ministry is working for preserving the natural beauty of reservoirs and promoting those as eco-friendly tourism hubs.

Works cited

Krishnudu, N., Reddy, G., Narsaiah, R., and Raju, N. (2019). A study on tourism in Telangana state (a case study of Hyderabad tourism including chowmahalla palace, a UNESCO, Asia pacific merit awardee). International Journal of Management, Technology and Engineering, 9 (6): 7.

Jansirani, S. and Priya, R. (2018). Tourism and Economic Development – A Case Study. In Tamil Nadu. International Journal of Engineering Research and Application. 8 (2): 1-2.

Anawade, P. and Bendale, S. (2017). Tourism and its Economic Impact on Hotel Industry: A Study for Khnadesh Region. International Journal of Engineering Technology, Management and Applied Sciences, 5 (5): 273-274.

Manju, R. (2018). Analysis of tourism development in south India with special reference to Kerala. International Journal of Economic and Business Review. 6 (2): 31.

Vijay, G. (2017). Impact of eco-tourism on Koya tribals in Jayashankar district of Telangana state – a study. International Journal of Research in Social Sciences. 7 (8): 381.

Chandramouli, S. (2016). Marketing of tourism services: problems and prospects of tourism industry in Telangana. 6 (8): 33.

Padmini, S. (2022). A Study on FDI in Telangana Tourism. International Journal of Scientific Development and Research. 7 (3): 76.

Athma, P. and Nalini, G. (2019). Ecotourism in Andhra Pradesh and Telangana: a comparative analysis. Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, 6 (6): 411.

Akula, R. (2000). Hyderabad as tourist destination – a study of satisfaction of tourists. Journal of critical reviews, 7 (17):943-944.

Kumar, S. P. (2020). A study on impact of tourism in Tamil Nadu. Palarch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 17(6): 10289.

BL College Journal Vol-VI, Issue-I, June 2024
Subscription : BDT 300/- [$ 5 Outside Bangladesh]

Published by
Government Brajalal College, Daulatpur, Khulna, Bangladesh